মার্চ উনিশ 'শ একাত্তর

মুজিব-জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা বিতর্ক

এম.আর.চৌধুরী

Scanned by CamScanner

March Unish-Sha Ekattar
Mujib-Zia Swadhinata Ghoshona Bitarka

By

M.R. CHOWDHURY

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন-প্রক্রিয়া'র পক্ষে
হেলাল উদ্দীন
১২/১, কবি জসীমউদ্‌দীন রোড,
উত্তর কমলাপুর,
ঢাকা-১২১৭।
মোবা ঃ ০১৭২-০৪২৬৭৪

প্রকাশকাল ঃ
মার্চ, ২০০৬ ইংরেজী।

বর্ণবিন্যাস ঃ
বিএম কম্পিউটারস্
৩৯, কে.সি.সি সুপার মার্কেট,
কে,ডি ঘোষ রোড,
খুলনা-৯১০০।

মুদ্রণে ঃ
আহম্মদিয়া প্রেস,
১৭, বেনী বাবু রোড,
খুলনা-৯১০০।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৭০ টাকা।

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ২০০০।

ISBN 984-32-3156-2

Scanned by CamScanner

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরের আমলগুলোতে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থাৎ বিত্তবান শ্রেণীসমূহের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন তথা আমলা-বুর্জোয়া-অভিজাত বা মুৎসুদ্দি-আমলা-সামরিক বুর্জোয়া বা স্বৈরাচারী সামরিক সরকার শুধু যে বিপুল জাতীয় ঋণ ও দুর্বহ করভারের লালন ক্ষেত্র হয়ে উঠল তাই নয়; পদ, অর্থ এবং মুরুব্বিয়ানার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণসহ শুধু যে তা শাসক শ্রেণীসমূহের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী উপদল ও ভাগ্যান্বেষীদের কামড়া-কামড়ির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল তাই নয়; ১৯৭১ খ্রীঃ ২৫ মার্চ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে হত্যা করে ইয়াহিয়া-হামিদ-ভুট্টো-কাইয়ুম গয়রহরা বিংশ শতাব্দীর এক জঘন্যতম দমনমূলক নির্দয় সর্বাত্মক সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর; এরই পাল্টা ব্যবস্থায় সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে শুরু ক'রে এক ভয়ংকরী যুদ্ধের মাধ্যমে দখলদার শত্রুদের পরাভূত করে যে জনগণ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করলো, সে বাংলাদেশেও জনগণ গণতন্ত্রের সাধ থেকে বঞ্চিতই থেকে গেল। এখানেও শুরু থেকেই চলতে থাকল পদ, অর্থ, মুরুব্বিয়ানা ও ভাগ্যান্বেষীদের কামড়া-কামড়ি সহ গণতন্ত্রহত্যা ও স্বৈরতন্ত্র—সর্বোচ্চ পর্যায়ে শুরু হয়েছে গণতন্ত্রের নামে উত্তরাধিকারসূত্রের তথা পরিবারতন্ত্রের অশুভ খেলা, প্রতিনিয়তই পদদলিত হচ্ছে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার তথা মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার। আধুনিক গণতন্ত্রের যেটুকু প্রগতিশীল ধারা স্বীকৃত হয়েছিল ১৯৭২ খ্রীঃ গৃহীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে, তার অধিকাংশ অনেক আগেই কেড়ে নেয়া হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জনগণের সেবক না বানিয়ে সর্বত্রই বানানো হয়েছে ক্ষমতাসীন দলগুলোর সর্বোচ্চ নেতা-নেত্রী সহ বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সেবক। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, বিদেশনীতি, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সহ সবকিছুই গ্রাস করে নিয়েছে মুজিব-জিয়া বিতর্ক। কারণ, এ বিতর্কই বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনদের শত্রুমনোভাবাপন্ন দুই শিবিরে বিভক্ত করে রেখেছে, যার সূচনা হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্ক শুরু করে। বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারীও (বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা) অতীত ইতিহাস তথা মুজিব-জিয়া বিতর্ক নিয়ে জাতীয় সংসদে সরকারী ও বিরোধী দল নিষ্প্রয়োজনে বাগ্‌যুদ্ধ করেছে ৯০ মিনিট, যার অর্থই হ'ল জনগণের ৯০ × ১৫০০০ = ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সর্বনাশ হয়েছে এ বিতর্ক করতে যেয়ে, যা জনগণের জন্য সামান্যতমও মঙ্গল বয়ে আনেনি। বিগত সুদীর্ঘকাল এ ধরনের নিষ্প্রয়োজনীয় বিতর্কের জন্যে জনগণের কত কোটি টাকা গচ্চা গেছে তা সহজেই অনুমেয়। এ বিতর্ককে অনন্তকাল চলতে দেয়া যায় না। কারণ, আমরা মনে করি যে অনাবশ্যক মুজিব-জিয়া বিতর্ক জনগণের জন্যে একটি সর্বনাশা বিতর্কে রূপ নিয়েছে—যা শ্রমিক-কৃষক সহ মেহনতি জনগণকে সর্বস্বান্ত করার জন্যে যথাযথভাবে কাজে লাগাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী চক্র এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের এ দেশীয় দালাল (অর্থাৎ, মুৎসুদ্দি) সহ লুটপাটকারী ও দুর্নীতি পরায়ণ ব্যবসায়ী-শিল্পপতি-রাজনীতিবিদ-আমলা-কর্মচারী-শিক্ষাগুরু-পেশাজীবী-জোতদার-মহাজন ও দুর্বৃত্ত ব্যক্তিরা—এ বিতর্ককে জিইয়ে রেখে সুকৌশলে কাজে লাগাচ্ছে ধর্ম ব্যবসায়ী ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা। ফলে, দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতি অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গেছে, শ্রমিক-কৃষক সহ মেহনতি জনগণের সকলকেই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসে বাধ্য করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ও বর্তমান বি এন পি জোট সরকারের আমলে অন্তত দুইবার রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, বিরোধী দলীয় নেতা, মন্ত্রী, ডেপুটি স্পীকার, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী সহ এম.পি-দের বেতন, বিভিন্ন ভাতা ব্যপকভাবে বৃদ্ধি করে নিলেও, এ সুদীর্ঘ সময়কালের মধ্যে দেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হয়নি; এ সকল শ্রমিকগণ বিগত ১৯৮৫ খ্রীঃ নির্ধারিত নিম্নতম ৫৬০.০০ (পাঁচ শত ষাট টাকা) মাসিক বেসিক (মূল) মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রকৃত অর্থে বর্তমান বাজার দরের প্রেক্ষিতে গার্মেন্টস্ শিল্প সহ ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প-কারখানায় শ্রমিকদের যে মজুরিতে এবং যে পদ্ধতিতে খাটানো হচ্ছে তাকে মজুরি-দাসত্ব না বলে শ্রম-দাসত্ব বলাটাই হবে যথার্থ। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ২০০৫ খ্রীঃ সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করলেও আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করেনি। ১৯৮৪ খ্রীঃ কৃষি শ্রমের মজুরির

Scanned by CamScanner

নিম্নতম হার প্রতি দিন ৩.২৭ কিলোগ্রাম চাউল অথবা স্থানীয় বাজারে এরূপ পরিমাণ চাউলের দামের সমান পরিমাণ অর্থ নির্ণয় করা হলেও, প্রায় ২২ বছরে এর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কৃষক জনগণ যে জমি আর মুক্তি চায় তা এরা চতুরতার সঙ্গে এড়িয়ে যাচ্ছেন। সবরকম সম্ভাব্য আকার ও রূপে লজ্জাকর ভূমিদাস প্রথার জেরগুলো (যেমন বর্গাচাষ) সকল সরকারই রক্ষা করে চলেছে। ১৯৮৪ খ্রীঃ জারিকৃত ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-তে বর্গাচাষ বিষয়ক বিধানাবলীতে জমির মালিকদের জন্য শুধুমাত্র জমিমালিকানার জন্য উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণের যে আইন করা হয়েছে, তাও এখন পর্যন্ত দেশের সর্বস্তরে কার্যকরী হয়নি, অনেক এলাকায়ই এখনো পর্যন্ত জমিমালিকানার জন্য উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক আদায় করা হচ্ছে। সরকার তথা প্রশাসন পালন করছে নীরব দর্শকের ভূমিকা। এসব নিয়ে পার্লামেন্টে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন বিতর্ক দেখা যায় না।

বিদেশী পুঁজিপতিদের জন্যে সর্বনিম্ন দরে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করে দেশীয় উৎপাদন ধ্বংস বা বাধাগ্রস্ত করতে এরা দ্বিধা করেন না। খুবই সীমিত আকারে উত্তোলনযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার মজুদ থাকা সত্ত্বেও, নিজ দেশের চাহিদানুযায়ী বিদ্যুৎ, সার উৎপাদন সহ অন্যান্য শিল্প উৎপাদন ও পরিবহণ শিল্পের জন্যে জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে বিদেশী বিনিয়োগের কাছে নতী স্বীকার করে বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা তুলে দিতে বা ভিন্ন দেশে তা রপ্তানী করতে এরা দ্বিধাবোধ করেন না। এসব নিয়ে এদের মধ্যে কোন বিতর্ক নেই। বলা হচ্ছে দেশটি জনগণের। অথচ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনায় না নিয়ে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ইত্যাদির চাপে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার মূল্য যথেচ্ছভাবে বৃদ্ধি করে জনগণের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। কয়েক কোটি বেকারের দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানায় চলমান লুটপাট ও দুর্নীতি বন্ধ ক'রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বন্দোবস্ত না ক'রে, বিশ্বায়নের নামে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদীদের স্বার্থে দেশীয় শিল্প-কারখানাগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে, বন্ধ করে দেয়া হয়েছে দেশের একমাত্র স্টীল মিল ও নিউজপ্রিন্ট মিল। ১৯৬৫ সনের কারখানা আইন, ১৯৬৫ সনের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৩৬ সনের মজুরি পরিশোধ আইন, ১৯৩৭ সনের মজুরি পরিশোধ বিধিমালা, ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ সহ শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী বিভিন্ন আইন পালিত হচ্ছে না। যার ফলে শ্রমিক হত্যা সহ শ্রমিক লাঞ্ছনার বহুবিধ ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। এসব নিয়েও কোন বিতর্ক দেখা যাচ্ছে না। বিতর্ক চলছে এমন একটি বিষয় নিয়ে যার সঙ্গে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন, জাতীয় অর্থনীতি বা আইন প্রণয়নের কোনো সম্পর্ক নেই।

মার্চ উনিশ 'শ একাত্তরের ঘটনাবলীকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ না করে যার যার দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্থাপন করে তা অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। এ প্রেক্ষিতে শেখ মুজিব বড় না মেজর জিয়া বড়, এভাবে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর মিলবে না, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যথার্থ উল্লেখই পারে এক্ষেত্রে সঠিক মূল্যায়নে সহায়তা করতে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে আমরা চাই মুজিব-জিয়া বিতর্কের অবসান হোক। দু'জনের যাঁর যা ভূমিকা তা যথাযথভাবে স্বীকৃত হোক। এরই লক্ষ্যে আমাদের এ প্রচেষ্টা। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন কার বা কোন্ দলের পক্ষে গেল, বা কার বা কোন্ দলের বিপক্ষে গেল তা নিয়ে ভাবিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

সুদীর্ঘ পয়ত্রিশ বছর পর এরকম একটি বক্তব্যের উত্থাপনায় ভুল-ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকা অস্বাভাবিক নয়, সে ক্ষেত্রে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা যথাযথভাবে উল্লেখ করে বইটির সমৃদ্ধিতে সহায়তা করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব, কৃতজ্ঞ থাকবে বাংলাদেশের জনগণ।

খুলনা
৭ই মার্চ, ২০০৬ ইং

এম.আর.চৌধুরী

Scanned by CamScanner

মার্চ উনিশ 'শ একাত্তর
মুজিব-জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা বিতর্ক

একাত্তরের মার্চ নিয়ে কিছু বলতে হলে প্রথমেই এর প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু কথা বলা একান্ত ভাবেই আবশ্যক। আমরা তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকেই এ বক্তব্যের শুরু করছি। কারণ, এ মামলার ঘটনা প্রবাহই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আন্দোলন-সংগ্রামে এক নুতন মাত্রা যুক্ত করেছিল, সে-সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতার আসনে আসীন হয়েছিলেন।

৭ জানুয়ারী, ১৯৬৮ দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার শিরোনাম ছিল ঃ

"পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র ঃ ভারতীয় কুটনীতিক বহিষ্কার ঃ অস্ত্র সংগ্রহের জন্য আগরতলার সামরিক অফিসারদের সংগে গোপন বৈঠক ঃ মোটা অংকের অর্থলাভ হীন চক্রান্ত সম্পর্কে দেশের উভয় অংশে জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার"

পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়,

"রাওয়ালপিন্ডি, ৬ই জানুয়ারী ঃ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছন্ন করার একটি ভারত সমর্থিত ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

... এদের সবাইকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ... এদের কেউ কেউ কমপক্ষে একজন ভারতীয় কূটনীতিক মিঃ ওঝার সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। এরা আগরতলাস্থ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মিশ্র এবং মেজর মেননের সাথে দেখা করেছিলেন। ভারতের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহই এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল।

... ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে দু'জন সি,এস,পি, অফিসার জনাব আহমদ ফজলুর রহমান এবং জনাব রুহুল কুদ্দুসকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য, সামরিক শাসনামলে ক্রিনিং কমিটি এদের দু'জনের প্রতি নোটিশ দিয়েছিলেন। পরে প্রেসিডেন্ট উভয়কেই ক্ষমা করেন এবং আর একবার সরকারী কাজ করার সুযোগ দেন।

... এপিপি পরিবেশিত সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়, একটি রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ২৮ ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রটি গত মাসে উদঘাটিত হয়। ধৃত ব্যক্তিগণ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

...ধৃত ব্যক্তিদের তালিকা ঃ

প্রেসনোটে ধৃত ব্যক্তিদের তালিকা দেওয়া হয়েছে এরা হলেন ঃ আভ্যন্তরীণ নৌচলাচল সংস্থার কর্মরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী, মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেন, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ডাক্তার সাঈদুর রহমান, সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনালের (সুইজারল্যান্ড) পাকিস্তান শাখার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব এম, আলী রাজা, জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, সি,এস,পি, (স্বাস্থ্যগত কারণে ১৯৬৬ সাল থেকে ছুটি ভোগ করছেন), জনাব রুহুল কুদ্দুস, সি,এস,পি, (অবসর গ্রহণের প্রস্তুতির ছুটি ভোগ করছিলেন এবং একটি ট্রেনিং কোর্সএর জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন), জনাব মুহিবুর রহমান (প্রাক্তন ন্যাভাল স্টুয়ার্ড), জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ (প্রাক্তন ন্যাভাল পেটি অফিসার), জনাব সুলতান উদ্দিন আহমদ (প্রাক্তন ন্যাভাল লিডিং সী-ম্যান), মীর্জা এম, রমিজ (পিআইএতে কর্মরত অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট), জনাব

Scanned by CamScanner

আমীর হোসেন (পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্পোরাল), এ.বি.এম.এ সামাদ (পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্পোরাল), জনাব খুরশীদ আলম (প্রাক্তন ন্যাভাল লীডিং সী-ম্যান), লীডিং সী-ম্যান পদের প্রাক্তন সার্জেন্ট ইত্যাদি পদের জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ আলী, জনাব এ.বি.এম. ইউসুফ, জনাব তাজুল ইসলাম, জনাব খুরশীদ মিয়া, জনাব দলিলুদ্দিন, জনাব মাসুদ আর চৌধুরী, জনাব আনোয়ার হোসেন, পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, ডাক্তার ক্যাপ্টেন খুরশিদুদ্দিন, এ.এম.সি, সুবেদার আব্দুর রাজ্জাক (পাকিস্তান সেনাবাহিনী), সার্জেন্ট এ.এম.এফ. হক (বিমান বাহিনী), সার্জেন্ট শামসুদ্দীন (পাকিস্তান বিমান বাহিনী) এবং হাবিলদার ইনসাফ আলী।"

১৮ জানুয়ারী, ১৯৬৮ দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রেসনোট ঃ শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা" শিরোনামে প্রকাশিত খবরের অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ

"... ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজেই অন্যান্যদের সাথে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে তিনি পূর্ব থেকেই জেলে ছিলেন।" শেখ মুজিব কীভাবে আগরতলা ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন?

উল্লেখ্য যে, ১৯৬৬ খ্রীঃ মে মাসের প্রথমের দিকে (সম্ভবতঃ আটই মে) শেখ মুজিবুর রহমান নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদানের পর নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সে রাতে ১টার সময় পুলিশ 'ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুল'-এর ৩২ ধারায় শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। আটকাবস্থায় বেশ কয়েকবার কারাকক্ষেই তাঁকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রায় ২১ মাস আটক রাখার পর ১৯৬৮ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসের ১৭ তারিখ দিনগত রাত ১ টার সময় (১৮ই জানুয়ারী) শেখ মুজিবকে তথাকথিত মুক্তি দেয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক থেকে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করে তাঁকে ঢাকার সেনানিবাসে নিয়ে যায়। এভাবেই তাঁকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামীর অভিযোগ উত্থাপন করে গ্রেফতার দেখানো হয়।

সেনাবাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের উপর গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। তাতে সার্জেন্ট জহুরুল হক নিহত এবং ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক আহত হন।

সরকার কর্তৃক তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের পর শেখ মুজিবুর রহমানকে গণসম্বর্ধনা দেয়ার উদ্দেশ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ আয়োজিত ঢাকা রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক জনাব তোফায়েল আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধী দানের প্রস্তাব করলে সমবেত জনতা বিপুল করতালিতে তা সমর্থন করে।

সেদিনের জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে শেখ মুজিব বলেন, "জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন পার্লামেন্ট গঠন করতে হবে। বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল করা হবে না তা সংশোধন করা হবে পার্লামেন্টই তা নির্ধারণ করবে।"

রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যকার চারদিন একটানাভাবে গোল টেবিল বৈঠক চলার পর ১৩ই মার্চ, ১৯৬৯ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বিলোপের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে গোল টেবিল বৈঠক কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হয় না। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৯ খ্রীঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রথম গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০ই মার্চ থেকে বৈঠক শুরু হয়।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেন যে, অমীমাংশিত প্রশ্নগুলি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা সমাধান করলেই সবচাইতে ভাল হবে।

Scanned by CamScanner

২৪শে মার্চ ১৯৬৯ প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগ করে লিখিতভাবে প্রধান সেনাপতি জেনারেল এ,এম, ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

৩০ নভেম্বর, ১৯৬৯ দৈনিক পূর্বদেশ "পূর্ব পাকিস্তানের নাম কি হবে?" শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে বলা হয় ঃ

পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের নাম স্বাভাবিক ভাবেই 'পূর্ব বাংলা' হবে , পুনরায় প্রদেশের নামকরণ 'পূর্ব বাংলা' না করে শুধুমাত্র 'বাংলা' নাম রাখার জন্য বিভিন্ন মহল সুপারিশ করছেন। বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর পাকিস্তানে বেশিরভাগ অংশ পড়েছে, এই যুক্তিতে সংখ্যাগুরুরাই কেবল মাত্র মূল নামে পরিচিত হওয়ার দাবী করতে পারে।

১৯৭০ খ্রীঃ ৩০শে মার্চ আইনগত কাঠামো আদেশ, ১৯৭০ (Legal Framework Order, 1970) জারী করেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। সর্বমোট ৭৫টি ধারা ও বহু উপধারা সম্বলিত উক্ত আইনগত কাঠামোতে শাসনতন্ত্র প্রশ্নে প্রধান দিক নির্দেশনাগুলো উল্লিখিত হয়েছে ২০নং ধারায়, অন্যান্যের মধ্যে তাতে বলা হ'লঃ

(ক) পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র (Federal Republic) যার নাম হবে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র (Islamic Republic of Pakistan)। ফেডারেশনের সাথে প্রদেশগুলো এমনভাবে সংযুক্ত থাকবে যাতে আঞ্চলিক অখন্ডতা এবং জাতীয় সংহতি রক্ষিত হয়।

(খ) (এই রাষ্ট্রে) পাকিস্তান সৃষ্টির বুনিয়াদ ইসলামী আদর্শ সংরক্ষিত থাকবে এবং রাষ্ট্র প্রধান হবেন একজন মুসলমান।

(গ) গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুসারে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ফেডারেল ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে; নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত করা হবে এবং বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা নিশ্চিত থাকবে।

(ঘ) আইনগত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা ফেডারেল সরকার এবং ব্যাপক স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে বন্টিত হবে যাতে সর্বাধিক আইনগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক অধিকার ভোগ করতে পারে, আবার অন্যদিকে ফেডারেল সরকার যাতে আইন, প্রশাসন ও আর্থিক ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়াবলী পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষায় যথেষ্ট শক্তিশালী হন তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। (... that the Provinces shall have maximum autonomy...)

(ঙ) পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের (areas) মানুষ জাতীয় সকল কর্মকান্ডে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদেশগুলো এবং প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহের মধ্যকার অর্থনৈতিক সহ সকল বৈষম্য দূর হবে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

উল্লিখিত আইনগত কাঠামো-তে অন্যান্যের মধ্যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলঃ (১) নির্বাচনের পরে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে না পারলে জাতীয় পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হবে (ধারা-২৪)। (২) জাতীয় পরিষদের প্রণীত শাসনতন্ত্র যদি প্রেসিডেন্টের (authentication) মঞ্জুরী লাভে ব্যর্থ হয় তাহলে জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে (ধারা-২৫)।

উক্ত ঘোষণাবলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ৫ই অক্টোবর, ১৯৭০ এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলোর নির্বাচন ২২ অক্টোবর, ১৯৭০-এর মধ্যে অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশ-এর প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন

Scanned by CamScanner

জানায়। কিন্তু সেদিন সামরিক প্রেসিডেন্টের সে ক্ষমতাকে বা এরূপ ঘোষণার বৈধতাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করেন নি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিবৃতিগুলো ছিল এরূপের ঃ

১লা এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তার সমালোচনা করে বলেন, প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক পাকিস্তানীরই এই ধারণা হবে যে, শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত কাঠামোর ব্যাপারে নির্বাচিত সদস্যদের কোন কথা বলারই অধিকার থাকবে না। (দৈনিক পাকিস্তান, ১লা এপ্রিল)।

১লা এপ্রিল ১৯৭০ ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দু'দিনব্যাপী জরুরী বৈঠক শেষে গৃহীত এক প্রস্তাবে জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খা বানচালের দরুণ যে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা এড়াবার জন্য প্রেসিডেন্টকে গণতন্ত্রের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য আইনগত কাঠামো নির্দেশ যথাযথভাবে সংশোধনের আহবান জানানো হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে তার বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। (দৈনিক পাকিস্তান, ২রা এপ্রিল)।

সাম্প্রদায়িকতা আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র ২৫ ও ২৭ দফার সংশোধন দাবী করে। ফেডারেল প্রজাতান্ত্রিক পাকিস্তানের নাম যে "পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র" হবে এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ কোনোরূপ প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করেনি। পাকিস্তান রাষ্ট্রে যে ইসলামী আদর্শ সংরক্ষিত থাকবে এবং রাষ্ট্র প্রধান হবেন একজন মুসলমান, তা নিয়েও আওয়ামী লীগ কোন কথা বলেনি।

প্রাদেশিক ন্যাপ (ওয়ালী) প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ২রা এপ্রিল চট্টগ্রামের এক জনসভায় নির্বাচনের আইনগত কাঠামোর ২৫ ও ২৭ ধারার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, তাদের দল এ দু'টি ধারার বিরোধী। (দৈনিক পাকিস্তান, ৩রা এপ্রিল)।

আইনগত কাঠামো আদেশের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ ৫ এপ্রিল, ১৯৭০ যে প্রচারপত্র বিলি করে তাতে বলা হয় ঃ ইয়াহিয়া ঘোষিত আইনগত কাঠামোতে একটি দিক লক্ষণীয় যে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের সংহতি ও অখন্ডতাকে জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আইনগত কাঠামোর ২৫ নং বিধিতে গণপরিষদের উপর সন্দেহ প্রকাশ ও ২৭ নং বিধিতে ইয়াহিয়ার একনায়কমূলক যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সকলের মূলনীতি বিরোধী।

আইনগত কাঠামো আদেশের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ১২ এপ্রিল, ১৯৭০ যে প্রচারপত্র বিলি করে তাতে আছে ঃ সার্বভৌম পার্লামেন্ট দিতে হবে; নির্বাচনী কাঠামো সংশোধন কর; শাসনতন্ত্রের মূলনীতি বাতিল কর; সামরিক আইন বাতিল কর।

প্রকৃত অর্থেই আওয়ামী লীগ আইনগত কাঠামো মেনে নেয়। আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র ২৫ ও ২৭ দফার সংশোধন দাবী করেছিল সেদিন।

উল্লিখিত আইনগত কাঠামো আদেশের ২৭ ধারা অনুসারে জাতীয় পরিষদ সদস্যপদ নিম্নলিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয় ঃ

তফসিল I

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ

এলাকা	সাধারণ সদস্য	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭
পাঞ্জাব	৮২	৩
সিন্ধু	২৭	১
বেলুচিস্তান	৪	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	১
কেন্দ্র শাসিত উপজাতীয় এলাকা	৭	-
মোট ঃ	৩০০	১৩

Scanned by CamScanner

একটি বিষয় এখানে লক্ষ্যণীয় তা হ'ল পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্যপদের ৫৪% প্রদান।

তফসিল II

প্রাদেশিক পরিষদগুলো

প্রদেশ	সাধারণ সদস্য	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০
পাঞ্জাব	১৮০	৬
সিন্ধু	৬০	২
বেলুচিস্তান	২০	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২
মোট ঃ	৬০০	২১

আইনগত কাঠামো আদেশ-এর ১২ ধারায় নির্বাচিত সদস্যগণের জন্য শপথ নামার বক্তব্যও লিপিবদ্ধ করা হয়, তাতে বলা হল ঃ

"12. Oath of Members of Assembly. – A Person elected as a Member of an Assembly shall before entering upon the office, take and subscribe, before a person presiding at a meeting of the Assembly an oath or affirmation in the following form, namely :

"I ..... do solemnly swear (or affirm) that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and that I will discharge the duties upon which I am about to enter honestly, to the best of my ability, faithfully in accordance with the provisions of the Legal Framework Order, 1970, the law and rules of the Assembly set out in that Order, and always in the interest of the solidarity, integrity, well-being and prosperity of Pakistan." "

"আইনগত কাঠামো আদেশ-১৯৭০"-এর সকল ধারার প্রতি বিশ্বস্ততা এবং সর্বদা পাকিস্তানের সংহতি, অখন্ডতা, মঙ্গল এবং উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে কর্তব্য সম্পাদনের কথা বলা হলো।

উক্ত আদেশবলে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ৫ই অক্টোবর, ১৯৭০ নির্ধারণ করা হয় এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলোর নির্বাচন ২২শে অক্টোবর, ১৯৭০ এর পূর্বেই অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়।

৭ জুন ১৯৭০ আওয়ামী লীগ রমনা রেস কোর্স ময়দানে একটি জনসভার মাধ্যমে তাদের নির্বাচনী কার্যকলাপ তথা প্রচারণা শুরু করে। এদিনও শেখ মুজিবুর রহমান আর একবার আইনগত কাঠামো আদেশের ২৫ ও ২৭ নং ধারার সংশোধন দাবী জানান প্রেসিডেন্টের কাছে। সেদিন তিনি বলেন যে, ছয় দফা বাস্তবায়িত হবে এবং পাকিস্তানও প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তিনি সেদিন ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে টিকে থাকার জন্য এবং কোন শক্তিই তাকে ভাঙতে পারবে না। তিনি বলেছেন যে, আসন্ন নির্বাচন হবে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট। সে সভায় পশ্চিম পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

৭ জুন ১৯৭০ শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদত্ত ভাষণের উপর ভিত্তি করে দ্য ডন্ (The Dawn) পত্রিকায় ৮ জুন প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে অল্প কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, declared today amidst cheers that

Scanned by CamScanner

Pakistan had come to stay and that there was no force which could destroy it. Told the meeting that the coming elections should be treated as a referendum on the autonomy issue—whether the people wanted autonomy on the basis of his party's six-point programme. Replying to the propaganda against the six-point programme, he said that in realisation would in no way harm Pakistan, "The six points will be realised and Pakistan shall also stay", he said amidst loud cheers. He once again urged the President to amend Articles 25 and 27 of the Legal Framework Order immediately making the Parliament supreme in constitution-making.

১৫ই আগস্ট, ১৯৭০ তারিখে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ.এম.ইয়াহিয়া খান পূর্বে নির্ধারিত ৫ই অক্টোবর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে তা ৭ই ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ১৭ই ডিসেম্বর নির্ধারণ করেন—কারণ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যার কথা উল্লেখ করা হয়। সে-সঙ্গে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ১৯ ডিসেম্বরের আগেই অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৭০ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার দোলাইখাল এলাকায় এক জনসভায় নির্বাচনের মাধ্যমে ছয় দফা দাবী আদায় না হলে আবার আন্দোলন শুরু হবে বলে বক্তব্য রাখেন। এ লক্ষ্যে তিনি ঢাকার বীরত্বপূর্ণ জনগণকে আর একবার সংগ্রামের ও রক্তদানের জন্য আহবান জানাবেন বলে জানান।

২৮ অক্টোবর ১৯৭০ শেখ মুজিবুর রহমান রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত নির্বাচনী ভাষণে আইনগত কাঠামো আদেশের উল্লেখযোগ্য কোন সমালোচনা করেন নি, শুধুমাত্র "নিয়ন্ত্রক ধারাগুলোর" প্রত্যাহার দাবী করেছেন। উল্লিখিত ভাষণে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান অন্যান্যের মধ্যে যা উল্লেখ করেন তা হল ঃ

তিনি ছয় দফার ভিত্তিতে পরিপূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্র ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অর্থনৈতিক কর্মসূচী বর্ণনায় ব্যাংক ও বীমা সহ জাতির অর্থনীতিক মঙ্গলের পক্ষে প্রধান খাত গুলোকে জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মালিকানায় নেয়ার কথা বলেন। তিনি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর গুরুত্বারোপ করার কথা এবং পাট ও বস্ত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের জাতীয়করণের কথা বলেন। তিনি অর্থকরি ফসলের উৎকর্ষ সাধনের কথা বলেন এবং উৎপাদকদের জন্য ন্যায্য ও স্থির মূল্য নিশ্চিতির কথা বলেন। তিনি ইংরেজী ভাষার স্থলে বাংলা ও উর্দুকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। ছয়-দফা ইসলাম ধর্ম বা অর্থনীতির জন্যে হুমকিস্বরূপ, বিরোধীদের এই অপ-প্রচারকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, ছয়-দফায় এমন কিছুই উপস্থাপন করা হয়নি যা আঞ্চলিক সম্প্রিতি এবং মানুষকে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, আমরা দৃঢ়তাসহকারে সাংবিধানিক মূলনীতিমালার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করছি যে, পাকিস্তানে এমন কোনো আইন পাস করা বা আরোপ করা হবে না যা ইসলামী আদেশ এবং কুরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী।

উল্লেখ্য যে, পরবর্তী পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ফেডারেল প্রজাতান্ত্রিক পাকিস্তানের যে খসড়া সংবিধান রচনা করেছিল সেখানেও উল্লিখিত সাংবিধানিক মূলনীতিমালাগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

সেদিন নির্বাচনী ভাষণে শেখ মুজিব বলেন, আমরা অবিলম্বে সিয়াটো (SEATO), সেন্টো (CENTO) এবং অন্যান্য সামরিক চুক্তি প্রত্যাহারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরো বলেন, ফারাক্কা বাঁধ সম্পন্ন হওয়ার দ্বারা বাংলার অর্থনীতির স্থায়ী ভাবে গুরুতর ক্ষতির যে আশংকা দেখা দিয়েছে তা আমরা অভিলম্বে সমাধান করব।

Scanned by CamScanner

।।৫ই নভেম্বর রেডিও ও টেলিভিশনে দেয়া এক নির্বাচনী ভাষণে মওলানা ভাসানী বলেন, আসন্ন নির্বাচন একটি সংবিধান রচনার সুযোগ তৈরী করেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানের সূচনাই সততার সঙ্গে হয়নি। এদেশের জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ কম পেয়েছে; এক্ষেত্রে সরকার সর্বদা বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছে। এদেশে জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের আসন বরাদ্দ রাখা দরকার। তিনি বলেন, যে কোন উপায়ে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের পক্ষে আমরা কাজ করে যাব। এবং পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা সর্বশক্তি দিয়ে মোকাবিলা করা হবে।

পূর্ব পাকিস্তানে ১২ই নভেম্বর সংঘটিত ভয়াবহ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কবলিতদের প্রতি উদাসীনতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্টের নিকট ১১ জন নেতা ২৩শে নভেম্বর একটি তারবার্তা প্রেরণ করেন। দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় ২৪ নভেম্বর, ১৯৭০ প্রকাশিত বার্তাটির অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ

"প্রেসিডেন্টের কাছে পূর্ব বাংলার এগারোজন নেতার তারবার্তা

সরকারের ক্ষমাহীন অবহেলা ও উদাসীনতা দেশবাসীর বিশ্বাসের উপর প্রচন্ড আঘাত হেনেছে

ঢাকা, ২৩শে নভেম্বর (পিপিআই) ঃ—এগারোজন রাজনৈতিক নেতা গত রবিবার ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ গত সপ্তাহে সংঘটিত মানব সভ্যতার বৃহত্তম ধ্বংসলীলার প্রতি সরকারের ক্ষমাহীন অবহেলা, উদাসীনতা এবং খবর চাপা দেয়ার প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, পিডিপি প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান, ন্যাপ (ওয়ালী) পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম লীগ (কাউন্সিল) সভাপতি খাজা খায়রুদ্দীন, প্রাদেশিক জামাত সভাপতি জনাব গোলাম আজম, মুসলীম লীগ (কাইয়ুম গ্রুপ) সাধারণ সম্পাদক খান সবুর, কৃষক-শ্রমিক পার্টি সভাপতি জনাব এ. এস. এম. সোলায়মান, নেজাম ইসলামের মওলানা সিদ্দিক আহমদ, জমিয়তে উলেমা পার্টির পীর মোহসেন উদ্দীন এবং পিপলস্ পার্টির গরীব নেওয়াজ সম্মিলিতভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে এক তারবার্তায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, সরকার কি করে এমন একটি ধ্বংসলীলাকে ধামাচাপা দিতে সচেষ্ট হচ্ছেন, যার জন্যে কোন মানুষ অথবা সরকার দায়ী নয়।

তারা আরো বলেন যে, এটা অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপার যে, আমাদের নিজস্ব সরকারের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাগ্রভাবে বি,বি,সি, মার্কিন সিনেট এমনকি ভারতীয় পার্লামেন্ট সময়ের ডাকে সাড়া দিয়েছে। একজনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপদ্রুত এলাকায় সফর করেননি। এমন কি প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত প্রাথমিক খবর পাওয়ার পর দায়সারা গোছের দায়িত্ব সম্পাদন করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে গেছেন।

"নিদারুণ অবহেলার জন্য বহু সংখ্যক জীবিত লোক মৃত্যুবরণ করেছে ও এখনো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। ব্যাপক মহামারীতে ইতিমধ্যেই বহু লোক মারা গেছে। যদি অবিলম্বে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গৃহীত না হয় তাহলে আরো লাখো মানুষের ভাগ্যও অনুরূপ হবে। বিদেশী সাহায্য সামগ্রীসমূহ দুঃখজনক অদক্ষতার সাথে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে। দু'দিন ধরে সে সব ঢাকায় স্তূপীকৃত হয়ে আছে। দুঃখের সাথে আরো এসেছে পূঞ্জীভূত অসম্মান, লজ্জা; অবহেলা। আপনার সদর দফতর এখানে স্থানান্তরিত করা অত্যাবশ্যক। সকল প্রকার সরকারী ও বেসরকারী সম্পদ কাজে লাগান। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে পরিস্থিতিকে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মতো বিবেচনা করুন।"

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় এলাকা পরিদর্শনের পর ২৬ নভেম্বর, ১৯৭০ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচন ঝড়ের কারণে স্থগিত হলে কঠোর কর্মসূচীর ঘোষণা দেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, "নির্বাচন নস্যাৎ হলে প্রয়োজনে

Scanned by CamScanner

আন্দোলন হবে।" তিনি বলেন যে, কয়েক সপ্তাহের জন্য আটটি নির্বাচনকেন্দ্রে (eight constituencies) নির্বাচন স্থগিত করা যেতে পারে। যে সকল নেতারা জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং নির্বাচন স্থগিত করার কথা বলেছেন শেখ মুজিবুর রহমান তাদের সমালোচনা করেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ১২ই নভেম্বর ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে ও ব্যাপক সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই দুর্যোগেও কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা ও সাহায্য অপ্রতুল ছিলো বলে সকল মহল থেকে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছিলো। এ অবস্থা আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে যথেষ্ট অনুকূল সহায়তা যুগিয়েছিল।

২৩ নভেম্বর পল্টন ময়দানে এক জনসভায় মওলানা ভাসানী বলেন ঃ

আমাদের কাছে নির্বাচনের চেয়ে মানুষ বড়। আমরা নির্বাচন করবো না। দুর্গত মানুষের সেবায় আমরা সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে যাব। এ অবস্থায় কেউ যদি নির্বাচন করতে চায় তাতে আমাদের আপত্তি (দৈনিক পূর্বদেশ ঃ ২৪ নভেম্বর, ১৯৭০)।

২৭ নভেম্বর ১৯৭০ ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। তবে তিনি সেদিন বলেছিলেন যে, সংবিধান যদি আইনগত কাঠামো আদেশের প্রান্ত অতিক্রম করে তাহলে সামরিক শাসন চলতে থাকবে। এক প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দলগুলো যদি আইনগত কাঠামো আদেশ মানতে অসম্মত হয় তাহলে তিনি মনে করবেন যে, তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। সেক্ষেত্রে সামরিক আইন চলছে এবং তা চলতে থাকবে। তবে তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান অবশ্যই সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন পাবে।

২৮শে নভেম্বর পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে নিজ নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং ২৯শে নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি ন্যাশনাল লীগ মনোনীত প্রার্থীদিগকেও জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে অনুরোধ জানান।

৩০ নভেম্বর, ১৯৭০ "জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর ডাক ঃ পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন" শিরোনামে মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী একটি প্রচারপত্র বিলি করেন। প্রচারপত্রে জলোচ্ছ্বাসের পর কেন্দ্রের ভূমিকার ব্যাপক সমালোচনা করা হয়। তিনি অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে বলেন, ..."আজ হইতে ১৩ বৎসর পূর্বেই ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, শোষণ আর বিশ্বাসঘাতকতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে "আচ্ছালামু আলায়কুম" বলিয়াছিলাম। হয়তো বঙ্গবাসী সেইদিন নাটকের সব কয়টি অংক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। ... আজ তাই আমাদের সম্মুখে কর্মসূচী পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করিয়াছি। অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, অনেক কোরবান দিয়াছি। আজ আমাদের হাতে যাহাই অবশিষ্ট আছে সব কিছুই উৎসর্গ করিয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এই সংগ্রাম ভাষণ বিবৃতি নয়—প্রত্যক্ষ মোকাবেলা। এই মোকাবেলা আপোষ নিষ্পত্তিকল্পে চাপ সৃষ্টি করার সংগ্রাম নয়—পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি শোষিত নির্যাতিত বাঙালীর মুক্তি সংগ্রাম। দল মত নির্বীশেষে আজ সবাই আসুন, আমরা এক ও অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করি।

... বাঙালী জাতির মুক্তি-সংগ্রামকে রুখিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই। সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।" বক্তব্যটি যে সকল ধ্বনি দিয়ে শেষ হয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ পূর্ব পাকিস্তান—জিন্দাবাদ! ইঙ্গ-মার্কিন দস্যুরা—বাঙলা ছাড়!

১লা ডিসেম্বর, ১৯৭০ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নির্বাচন দফতর কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী আবেদন প্রচারপত্রের মাধ্যমে (জনগণের মধ্যে) বিলি শুরু হয়। প্রচারপত্রের

Scanned by CamScanner

শুরুতে আছে "আমার প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা, আসসালামু আলায়কুম"। প্রচারপত্রে অন্যান্যের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন ঃ

"এই নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নির্বাচিত হবার পর পরই পরিষদ সদস্যরা বা রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার গদিতে বসে পড়তে পারবে না। তাঁদেরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করতে হবে।

"আমাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরও যদি কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিগণ দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে পাকিস্তান বিশেষ করে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ চিরতরে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। ... একমাত্র এই কারণেই আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

"কারাগার থেকে বেরিয়ে আমরা জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক ভোটের দাবী তুলেছিলাম; আজ সেটা আদায় হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ যোগ্যতা ও সুযোগের অধিকারী।

"আমার নিজের জন্যে নয়, বাঙলার মানুষের দুঃখের অবসানের জন্যে ১৯৬৬ সালে আমি ৬ দফা প্রস্তাব উথাপন করেছিলাম। এই দাবী হচ্ছে আমাদের স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দাবী; অঞ্চলে অঞ্চলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানের দাবী। এই দাবী তুলতে গিয়ে আমি নির্যাতিত হয়েছি।

...কোন নেতা নয়, কোন দলপতি নয়, আপনারা—বাঙলার বিপ্লবী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সর্বহারা মানুষ রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙ্গে মনু মিয়া, আসাদ, মতিয়ুর, রুস্তম, জহুর, জোহা, আনোয়ারার মতো বাঙলাদেশের দামাল ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। ...জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মত আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেও আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সাথে বেঈমানী করবো না।

"আমি জানি, ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়নের পরই তাদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিয়ে বাঙলাদেশের প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আনুন।

"শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।

জয় বাংলা।। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।।"

সঙ্গত কারণেই এখানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ব্যাখ্যা সহ ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে (৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২ বাংলা) পেশ করা "আমাদের বাঁচার দাবী ৬-দফা কর্মসূচী"-র শুধুমাত্র দফাগুলো উল্লেখ করছি। শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে ৬-দফা উথাপন করেছেন তা হল ঃ

"আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,
আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবীরূপে ৬-দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

"১ নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির

Scanned by CamScanner

সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন প্রাপ্ত-বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

"২নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

"৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে ঃ

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাঙ্ক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

"৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

"৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি ঃ

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে,

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে।

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

"৬নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি।

"আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লাহর দরগায় শুধু এই দোওয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

আপনাদের স্নেহ-ধন্য খাদেম

শেখ মুজিবুর রহমান।"

Scanned by CamScanner

ছয় দফা প্রসঙ্গে বিশদে না যেয়েও একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হচ্ছে, তা হ'ল কেন্দ্র শাসিত উপজাতীয় এলাকার কথা না হয় বাদই দিলাম, মূলত যে পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে মাত্র একটিকে অন্যান্য চারটি প্রদেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ভাবে দেখা হয়েছে, একটি মাত্র প্রদেশের পক্ষে ও জন্যে অনেক কিছুই বলা হয়েছে, অথচ বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগুলোর জনগণকে এক কাতারে ঠেলে দেয়া হয়েছে। যেমন, মুদ্রা যদি আলাদাই হয়, সেক্ষেত্রে মাত্র দুই রকম মুদ্রা হবে কেন, প্রত্যেক প্রদেশের জন্যই আলাদা মুদ্রার দাবী হওয়া উচিত ছিল। এর উত্তরে হয়ত বলবেন যে, সে সময়কালে দুটো প্রদেশ ছিল। আমাদের বক্তব্য হলো, ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন গণপরিষদ সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই বিশেষতঃ ৮০ সদস্য-সম্বলিত গণপরিষদের মধ্যে পূর্ব বাংলার ৪০ জন (যার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানও ছিলেন) সদস্যের ভোটের ভিত্তিতে চারটি ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তাকে তথা প্রদেশকে রাতারাতি এক প্রদেশের অন্তর্গত করে দিয়ে সংবিধান রচনা করেছিলেন। এমনকি তৎকালে পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচ ও পাঠান জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে কোনোরূপ মতামত—প্রদেশভিত্তিক গণভোটও নেয়া হয়নি। সেদিন কোন নেতাই লাহোর প্রস্তাবের কথা উচ্চারণ করেননি। দ্বিতীয়ত, আইনগত কাঠামো আদেশ, ১৯৭০ এর নির্বাচনী তফসিল অনুসারে যখন পাঁচটি প্রদেশকেই আলাদাভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তখনও দুই প্রদেশ ভিত্তিক দাবী পাঁচ প্রদেশভিত্তিক কাঠামোতে বলবৎ রাখলেন কী করে?

বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় শেখ মুজিবুর রহমান অন্যান্যের মধ্যে জনগণকে ১০ টাকা মণ দরে গম এবং ২০ টাকা মণ দরে চাউল খাওয়াবেন বলে প্রচার চালান। সে-সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের ২৩ বছর শোষণ করেছে, আমরা ৩০ বছর তাদের শোষণ করব এরূপ বক্তব্যও রাখেন শেখ মুজিব।

৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০ পল্টন ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী 'সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মরণপণ সংগ্রামের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা' দেন। উক্ত জনসভায় মওলানা ভাসানী বলেন, "সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের এই দাবী আইনসঙ্গত—এই সংগ্রামও আইনসঙ্গত। এটি নিছক হুমকির বা চাপ সৃষ্টির আন্দোলন নয়; স্বাধীন-সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের এই সংগ্রামের প্রতি এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার শান্তিকামী ও মুক্তিকামী জনগণের পূর্ণ নৈতিক সমর্থন থাকবে।" এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "আমাদের সংগ্রাম জীবন-মরণের সংগ্রাম। পূর্ব পাকিস্তানের ১৪ লক্ষ মানুষ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ দিয়েছে। আমাদের সংগ্রামের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হলে আরও ১৫/২০ লাখ লোক জীবন দিয়ে হয় অভীষ্ট সিদ্ধ করবো, না হয় মৃত্যু বরণ করবো।" মওলানা বলেন, " 'জয় বাংলা' স্লোগান বন্ধ করার জন্য কোন সৈন্য দেওয়া হয় নাই। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান বললে যদি সৈন্য নিয়োগ করা হয়, তাহলে বিরাট ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।" পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে শরিক হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহবান জানিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন, "মুজিব, তুমি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামে যোগ দাও। যদি আমেরিকা ও ইয়াহিয়ার স্বার্থে কাজ কর তাহলে আওয়ামী লীগের কবর '৭০ সালে অনিবার্য।" মওলানা ভাসানী আরও বলেন, "যারা নির্বাচনে শতকরা একশোটি আসনে জয়ী হয়ে প্রমাণ করবে জনতা তাদের পেছনে রয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নেই। দক্ষিণ ভিয়েতনামে দেশপ্রেমিক গেরিলারা যখন লড়াই করেছে তখনও সংগ্রামের মুখে নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু তার দ্বারা একথা প্রমাণ হয়নি যে নির্বাচনে বিজয়ীরা জনগণের বন্ধু। বরং তারা সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারের তল্পীবাহক।"

উক্ত জনসভায় আরও যারা ভাষণ দেন তাঁরা হলেন ন্যাশনাল লীগের সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান, পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সভাপতি পীর মোহসেনউদ্দীন,

Scanned by CamScanner

কৃষক-শ্রমিক পার্টি প্রধান জনাব এ,এস,এম, সোলায়মান ও পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মশিয়ুর রহমান।

আইনগত কাঠামো আদেশ-এর আওতায় নির্ধারিত দিনে গণপরিষদের ৯টি আসন বাদে সব কয়টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, বাকী আসনগুলোর নির্বাচন ১৯৭১-এর জানুয়ারী ১৭ তারিখে সম্পন্ন হবে। এরই মধ্যে ফলাফল অনুসারে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। তবে, পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে (পাঞ্জাব, সিন্দু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও সেখানকার ১৩৮ আসনের একটি আসনেও বিজয় অর্জন করতে পারেনি। যার অর্থ হ'ল আওয়ামী লীগের কর্মসূচী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও তা পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের কাছে কোনরূপ গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

২০ ডিসেম্বর, ১৯৭০ পাকিস্তান পিপ্‌লস্ পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলি ভুট্টো লাহোরে এক বিবৃতিতে বলেন যে, পিপ্‌লস্ পার্টিকে বাদ দিয়ে কোন সংবিধান যেমন রচিত হবে না, তেমনি পিপ্‌লস্ পার্টিকে বাদ দিয়ে কোন কেন্দ্রীয় সরকারও গঠিত হতে পারবে না। প্রত্যক্ষ ৩০০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে ৮৩ আসন প্রাপ্ত পার্টির নেতা জনাব ভুট্টো বলেন, " পিপ্‌লস্ পার্টি জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসবে না।"

৩রা জানুয়ারী (রোববার), ১৯৭১ বিকালে রেস কোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ দলীয় নির্বাচিত ১৫১ জন জাতীয় পরিষদ এবং ২৬৮ জন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য শপথ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। শপথ নামায় বলা হয়ঃ

"আমরা শপথ করিতেছি—

"আমরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় নব নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণ করিতেছি পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার নামে; আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি সেই সব বীর শহীদের ও সংগ্রামী মানুষের নামে, যাহারা আত্মহুতি দিয়া ও চরম নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করিয়া আজ আমাদের প্রাথমিক বিজয়ের সূচনা করিয়াছেন।

"আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি এই দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতী মানুষের—তথা সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের নামে ঃ

* জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এই দেশের আপামর জনসাধারণ আওয়ামী লীগের কর্মসূচী ও নেতৃত্বের প্রতি যে বিপুল সমর্থন ও অকুণ্ঠ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন, উহার মর্যাদা রক্ষাকল্পে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করিব;
* ছয়-দফা ও এগারো-দফা কর্মসূচীর উপর প্রদত্ত সুস্পষ্ট গণরায়ের প্রতি আমরা একনিষ্ঠরূপে বিশ্বস্ত থাকিব এবং শাসনতন্ত্রে ও বাস্তব প্রয়োগে ছয়-দফা কর্মসূচী ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও এগারো-দফা কর্মসূচীর প্রতিফলন ঘটাইতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব;
* আওয়ামী লীগের নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর প্রতি অবিচল আনুগত্য জ্ঞাপনপূর্বক আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে বিরাজমান চরম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত এক সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়িবার এবং অন্যায়, অবিচার বিদূরিত করিয়া সত্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইব;
* জনগণ অনুমোদিত আমাদের কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসী যে কোন মহল ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিব এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে যে-কোনরূপ ত্যাগ স্বীকার করতঃ আপোষহীন সংগ্রামের জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকিব। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান।"

Scanned by CamScanner

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে বলেন যে, শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের গণ-প্রতিনিধিদের সহযোগিতা গ্রহণে আগ্রহী, কিন্তু নীতির প্রশ্নের কোন আপোস করা হইবে না। তিনি বলেন, শাসনতন্ত্র ছয়-দফার ভিত্তিতেই হইবে—কেউ ঠেকাইতে পারিবে না।

তিনি বলেন, আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। শুধু বাংলারই নই, আমরা সারা পাকিস্তানেরই মেজরিটি। আমরা যে শাসনতন্ত্র রচনা করিব, সেটাই জনগণ গ্রহণ করিবে এবং উহা বানচালের অধিকার কাহারো নাই।

শেখ মুজিব সে সভায় সরকার প্রণীত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাক্সবন্দী করে রাখার জন্য সরকারের নিকট আহবান জানান। সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসবাদের দালালদের খতম করার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে বাঁশের এবং সুন্দরী কাঠের লাঠি বানাবার পরামর্শ দিয়ে শেখ মুজিব বলেন, প্রত্যেকের হাতে আমি হয় বাঁশের নয় সুন্দরীকাঠের লাঠি দেখিতে চাই। কিন্তু খরবদার আমার হুকুম ছাড়া সেগুলো ব্যবহার করবেন না।

৪ জানুয়ারী, ১৯৭১ দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছিল, "সম্ভবতঃ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই ধরনের গণশপথ গ্রহণ এই প্রথম।"

তবে, সেদিনের শপথনামার বক্তব্যগুলো যে পাকিস্তানের জংলী শাসকশ্রেণী সহ পুঁজিপতিদের ক্ষিপ্ত করেছিল তা বুঝতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কারণ, আইনগত কাঠামো আদেশ-এর ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে 'মেজরিটি'র জোরে "ছয়-দফা কর্মসূচী ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন" প্রণয়ন বহুজাতিক পাকিস্তান রাষ্ট্রে সহজ বিষয় ছিল না। তাছাড়াও, "পশ্চিম পাকিস্তানের গণপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা গ্রহণে আগ্রহী, কিন্তু নীতির প্রশ্নে কোন আপোস করা হইবে না" বা "শাসনতন্ত্র ছয়-দফার ভিত্তিতেই হইবে—কেহ ঠেকাইতে পারিবে না" এ রূপের বক্তব্য একটি বহু জাতিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে কি না, সেটাই প্রশ্ন! সংগত কারণেই আমরা মনে করি যে, ৩রা জানুয়ারীর এ সকল ঘটনাবলী জংলী শাসক শ্রেণী সহ পুঁজিপতিরা মেনে নিতে না পেরেই ষড়যন্ত্রের পথে এগিয়েছিল। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আলোচনা-সমঝোতার পথে সমাধান নিষ্পত্তির লক্ষ্য নির্ধারণ করে আন্তর্জাতিকভাবে নিজেদের একটি অবস্থান তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যাতে করে দেখান যায় যে, তারা চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কারণ, নির্বাচনের পূর্বেই, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০ ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিষ্কার ভাষায়ই বলেছিলেন, সংবিধান যদি আইনগত কাঠামো আদেশের প্রান্ত অতিক্রম করে তাহলে সামরিক শাসন চলতে থাকবে। নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দলগুলো যদি আইনগত কাঠামো আদেশ মানতে অসম্মত হয় তাহলে তিনি মনে করবেন যে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। সেক্ষেত্রে সামরিক আইন চলছে এবং তা চলতে থাকবে।

সংগত কারণেই এখানে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে প্রেসিডেন্ট আইউব খান ২৪শে মার্চ, ১৯৬৯ যে চিঠি দিয়েছিলেন, তার অংশবিশেষ উল্লেখ করছি। তাতে ছিল ঃ

জাতীয় পরিষদ সদস্যদেরকে এই মর্মে হুমকী প্রদানে বাধ্য করা হচ্ছে যাতে তাঁরা হয় অধিবেশন বয়কট করেন অথবা এমন সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করেন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিলুপ্ত হয়ে যায়, সশস্ত্র বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, দেশের অর্থনীতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং পাকিস্তান ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শুধু বিদেশী আগ্রাসনই নয় বরং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা হ'তে দেশকে রক্ষা করার আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব আপনার। জাতি আশা করে, দেশের নিরাপত্তা ও অখন্ডতা বজায় রাখা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনি এ দায়িত্ব পালন করবেন।

Scanned by CamScanner

শেখ মুজিবুর রহমান তথা আওয়ামী লীগের দাবী "শাসনতন্ত্র ছয়-দফার ভিত্তিতেই হইবে—কেউ ঠেকাইতে পারিবে না" বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কিছু বলতেই হচ্ছে। একটু সচেতনতার সঙ্গে ছয়-দফাকে বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমেয় হবে যে তা পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে বন্ধন ঘনিষ্ট করে তোলার বা জাতিগুলোর মিলনের দিকে যা এগিয়ে নিয়ে যায় তেমন ব্যবস্থা সুদৃঢ় ছিল না। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৮০ জন গণপরিষদ সদস্য সংখ্যাগরিষ্টতার জোরেই পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচ ও পাঠান অধ্যুসিত এলাকা (দেশীয় রাজ্যগুলো সহ) একত্রিত করে, চারটি প্রদেশকে ভেঙ্গে দিয়ে, একটি প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবী জাতিসত্তার অধীন করে দেয়। সে সময়কালে আওয়ামী লীগ সদস্যগণ ঐ সকল দুর্বল জাতিসত্তার কোন মূল্য দেননি। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬-দফা কর্মসূচীও পশ্চিমাঞ্চলের পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানকে এক-ইউনিট হিসেবে রেখেই প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আইনগত কাঠামো আদেশ, ১৯৭০ -এর নির্বাচনী তফসিল অনুসারে যখন পশ্চিমাঞ্চলের এক-ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে চারটি প্রদেশ, অর্থাৎ পাকিস্তানে পাঁচটি প্রদেশ হিসেবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষিত হ'ল, তখন ঐ ৬-দফার দাবীগুলো হুবহু কার্যকর করার ঘোষণা কী বাস্তব সম্মত? যেমন, মুদ্রা যদি আলাদাই করতে হয়, সেক্ষেত্রে মাত্র দুই রকম মুদ্রা হবে কেন, প্রত্যেক প্রদেশের জন্যই আলাদা আলাদা মুদ্রার দাবী হওয়া উচিত ছিল! মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের প্রস্তাব শুধুমাত্র একটি প্রদেশের জন্যে হবে কেন? প্রয়োজনে জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ সহ সকল স্তরের সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবী করা যেত। আসলে আওয়ামী লীগ যে রূপের স্বায়ত্তশাসনের দাবী নিয়ে এগিয়েছে তাকে সাংস্কৃতিক জাতীয় স্বায়ত্তশাসন-এর তত্ত্বের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে, যা পেটি বুর্জোয়া, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকেই তা পরম করে। এ দেশের মার্কসবাদী বলে দাবীদারদের অধিকাংশই তখন জাতীয়তাবাদ বা উগ্র জাতীয়তাবাদের আবর্তেই হাবুডুবু খেয়েছিল— অনেকের ক্ষেত্রে এখনও কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে না। তাদের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করতেই হচ্ছে যে, জাতীয়তাবাদ তা সে সবচেয়ে 'ন্যায্য', সবচেয়ে 'বিশুদ্ধ', সবচেয়ে মার্জিত ও সুসভ্য হলেও, তার সঙ্গে মার্কসবাদের কোনো আপোস নেই। সব রকমের জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে মার্কসবাদ উপস্থিত করে আন্তর্জাতিকতা, উচ্চতর একটা ঐক্যের মধ্যে সর্বজাতির মিলন।

ভ,ই, লেনিন জাতীয় সমস্যায় সমালোচনামূলক মন্তব্য প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, "বলাই বাহুল্য, মার্কসবাদীরা ফেডারেশন ও বিকেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে, তার সোজা কারণ এই যে, পুঁজিবাদের বিকাশের জন্যে যথাসম্ভব বৃহত্তম ও অতি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রেরই প্রয়োজন। অন্যান্য অবস্থা যদি সমান সমান থাকে তাহলে শ্রেণী-সচেতন প্রলেতারিয়েত (শ্রমিক শ্রেণী) সর্বদাই বৃহত্তর রাষ্ট্র চাইবে। সর্বদাই সে মধ্যযুগীয় বিচ্ছিন্নবাদের বিরুদ্ধে লড়বে এবং স্বাগত করবে বৃহৎ অঞ্চলসমূহের যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠতম অর্থনৈতিক সম্মিলনকে যেখানে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম অবারিত হতে পারবে ব্যাপকভাবে।"

লেনিন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, "জাতীয় সমস্যায় (যেমন অন্যান্য প্রশ্নেও) প্রলেতারিয়েতের নীতি হল বুর্জোয়াকে একটি বিশেষ দিকে সমর্থন করা কিন্তু বুর্জোয়া নীতির সঙ্গে তা কখনোই মিলে যায় না। বুর্জোয়াকে শ্রমিক শ্রেণী সমর্থন করে কেবল জাতিগত শান্তির স্বার্থে (যেটা বুর্জোয়ারা কখনো পুরোপুরি দিতে পারে না এবং যা কার্যকরী হতে পারে কেবল পরিপূর্ণ গণতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থায়), সমাধিকারের স্বার্থে, শ্রেণী-সংগ্রামের সর্বোত্তম পরিস্থিতির স্বার্থে। সেই জন্যই ঠিক বুর্জোয়ার ব্যবহার-যোগ্যতার বিরুদ্ধেই (in opposition to the practicality) প্রলেতারিয়েত জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে পেশ করে নীতিগত পলিসি, সর্বদাই বুর্জোয়াকে সমর্থন করে কেবল সর্তাধীনে। জাতীয় ব্যাপারে সব বুর্জোয়াই চায় হয় নিজ জাতির জন্য বিশেষ অধিকার, নয় তো বিশেষ সুবিধা: একেই সে বলে "ব্যবহারিকতা" (called being

Scanned by CamScanner

"practical")। প্রলেতারিয়েত (শ্রমিক শ্রেণী) সবকিছু বিশেষাধিকার, সবকিছু বিশেষ সুবিধার বিরুদ্ধে। তার কাছে "ব্যবহারিকতা" দাবী করার অর্থ বুর্জোয়ার আঁচল ধরে চলা, সুবিধাবাদে পতিত হওয়া।"

তিনি লিখেছেন, "নিপীড়িত জাতির বুর্জোয়া যে পরিমাণে নিপীড়ক জাতির বুর্জোয়ার সঙ্গে লড়াই চালায়, সেই পরিমাণেই আমরা সর্বদাই, সর্বক্ষেত্রেই ও সর্বাধিক দৃঢ়ভাবে তার পক্ষে, কেননা আমরা হলাম নিপীড়নের সবচেয়ে নির্ভিক ও সঙ্গতিপরায়ণ শত্রু। যে পরিমাণে নিপীড়িত জাতির বুর্জোয়া নিজেদের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতী, সেই পরিমাণে আমরা তার বিরোধী। উৎপীড়ক জাতির বিশেষাধিকার ও জবরদস্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কিন্তু উৎপীড়িত জাতির পক্ষ থেকে বিশেষাধিকার অর্জনের আকাঙ্খার প্রতি এতটুকু প্রশ্রয় নয়।"

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭১ সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর যে ফলাফল প্রকাশিত হ'ল তা নিম্নরূপ ঃ

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ঃ

পার্টির নাম	কত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে	প্রদেশভিত্তিক আসন প্রাপ্তি						পরোক্ষ মহিলা আসন প্রাপ্তি	মোট প্রাপ্ত আসন
		পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	বেলুচিস্তান	উপজাতীয় এলাকা		
আওয়ামী লীগ	১৬২*	১৬০	-	-	-	-	-	৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি	১২২	-	৬৪	১৮	১	-	-	৫	৮৮
নিখিল পাকিস্তান মুসলীম লীগ (কাইয়ুম)	১৩২	-	১	১	৭	-	-	-	৯
মুসলীম লীগ (কাউন্সিল)	১১৯	-	৭	-	-	-	-	-	৭
জমিয়তুল উলেমা-ই-ইসলাম (হাজারভি)	৯৩	-	-	-	৬	১	-	-	৭
মারকাজি জমিয়তুল উলেমা-ই-ইসলাম	অজানা	-	৪	৩	-	-	-	-	৭
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালি খান)	৬১	-	-	-	৩	৩	-	১	৭
জামায়েত ইসলামী	২০০	-	১	২	১	-	-	-	৪
মুসলীম লীগ (কনভেনশন)	১২৪	-	২	-	-	-	-	-	২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১০৮	১	-	-	-	-	-	-	১
স্বতন্ত্র	৩০০	১	৩	৩	-	-	৭	-	১৪
	মোট-	১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

Scanned by CamScanner

* এ সংখ্যাটি শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের। পশ্চিমাঞ্চলে আওয়ামী লীগের কতজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তার তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে সেখানে একটি আসনও লাভ করতে ব্যর্থ হ'ল। পূর্ব পাকিস্তানের যে দুটি আসন আওয়ামী লীগের বাইরে গেল তার একটি পেলেন পিডিএম-এর জনাব মুকুল আমিন এবং অপরটি স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায়।

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ ঃ

পার্টির নাম	সাধারণ আসন প্রাপ্তি	পরোক্ষ মহিলা আসন প্রাপ্তি	মোট প্রাপ্ত আসন
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২	-	২
পাকিস্তান পিপ্‌লস্ পার্টি	-	-	-
মুসলীম লীগ (কাউন্সিল)	-	-	-
মুসলীম লীগ (কনভেনশন)	-	-	-
নিখিল পাকিস্তান মুসলীম লীগ (কাইয়ুম)	-	-	-
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালি খান)	১	-	১
জামায়াতে ইসলামী	১	-	১
নিজাম-ই-ইসলামী	১	-	১
জামায়তুল উলেমায়ে ইসলাম (থানভি)	-	-	-
জামায়াত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম (গুরানী)	-	-	-
স্বতন্ত্র	৭	-	৭
মোট -	৩০০	১০	৩১০

উল্লেখ্য যে, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ১২ই নভেম্বর ঝড়ের পর থেকেই এ নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেছে এবং তাদের কোন সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেননি।

জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল ৩০০টি। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৬০টি। এছাড়া নির্ধারিত ১৩টি মহিলা আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করে ৭টি আসন। ফলে ৩১৩টি জাতীয় পরিষদ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভে সমর্থ হয়। পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৮৩টি আসন লাভ করে। সে-সঙ্গে নির্ধারিত ১৩টি মহিলা আসনের মধ্যে অর্জন করে ৫টি। ফলে পিপলস্ পার্টি মোট ৮৮টি আসনের অধিকারী হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে স্বতন্ত্রপ্রার্থী বাদে মোট ১৭টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের তিনটি গ্রুপ ও পিপলস্ পার্টি সহ মোট বারটি দল কোন আসন লাভে ব্যর্থ হয়। এর মধ্যে পাঁচটি প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম দলের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। অন্য দু'টি প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম দল জামায়াতে ইসলামী ও নিজামে ইসলামী ১টি করে এবং ওয়ালী খানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ১টি আসন পায়। এছাড়া স্বতন্ত্র সদস্যরা ৭টি এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ২টি আসনে জয়লাভ করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টির মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদ (সরাসরি) নির্বাচনে মোট আসন ছিল ৩০০টি। ৩০০টি আসনের বাইরে ১০টি নির্ধারিত মহিলা আসন ছিল যা আওয়ামী লীগ লাভ করে। ফলে ৩১০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৮ টিতে।

Scanned by CamScanner

জানুয়ারীর ১১ তারিখে ইয়াহিয়া খান ঢাকা এলেন। তাঁর সাথে অন্যান্য ডাক সাইটে জেনারেলরা ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামী লীগের আসল উদ্দেশ্য যাচাই করা। ১২ ও ১৩ই জানুয়ারী ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক হলো। ইয়াহিয়ার পক্ষে জেনারেল পীরজাদা এবং গভর্ণর আহসান ছিলেন। অপর পক্ষে শেখ মুজিবের পাশে ছিলেন খন্দকার মোশতাক, তাজুদ্দিন আহমদ সহ পাঁচজন নেতা। পরে জানা গেছে, শাসনতন্ত্র তৈরীর ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়েই শেখ মুজিব কাজ করবেন এবং জাতীয় পরিষদে পেশ করার আগে সামরিক কর্তৃপক্ষকে তা দেখানো হবে বলে শেখ মুজিব কথা দিয়েছেন। এটাও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে সকল দলের ঐক্য পরিলক্ষিত হলেই জাতীয় পরিষদ অধিবেশন ডাকা হবে।

১৪ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমান বন্দরে সাংবাদিকরা নানা প্রশ্ন করেন। প্রতি কথায় তিনি অচিরেই ক্ষমতা ত্যাগ করবেন বলে আভাস দিয়েছেন। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে শেখ মুজিবকে জিজ্ঞেস করুন, "তিনিইতো পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী। যখন তিনি আসবেন এবং ক্ষমতা নেবেন তখন আমি সেখানে থাকবো না। শিগগিরই তাঁর সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে।" তাঁর এ বক্তব্য থেকে শেখ মুজিব ও তাঁর পার্টির নেতাদের বুঝা উচিত ছিল। প্রেসিডেন্ট বলছেন যে, শেখ মুজিব যখন ক্ষমতা নেবেন তখন তিনি সেখানে থাকবেন না। আসলে প্রেসিডেন্ট তাঁর কথা রেখেছিলেন। শেখ মুজিব যখন ক্ষমতা নিয়েছিলেন সেখানে তিনি সত্যিই উপস্থিত ছিলেন না।

ঢাকা থেকে চলে যাবার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জেনারেল হামিদ ও জেনারেল পীরজাদাকে নিয়ে লারকানাতে শিকার করতে গেলেন। এই সুযোগে ভুট্টোর সাথে রাজনৈতিক আলোচনাও করলেন। এই আলোচনার বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

জাতীয় পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ৩০ জানুয়ারী আকাশ-পথে উড়ন্ত একটি ভারতীয় ফকার বিমান ছিনতাই করে লাহোর বিমানবন্দরে নিয়ে কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের নামে কিছু দাবি-দাওয়া দিয়ে ২রা ফেব্রুয়ারী বিমানটিকে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এটা ছিল নিছক একটি ষড়যন্ত্র, এর মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব দেখিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার কৌশল নেয়া হয়। এ ষড়যন্ত্রের বিপরীতে বিশদ আলাপ-আলোচনার পর ২রা ফেব্রুয়ারী রাতে খুলনার মুজিবর রহমান চৌধুরী, পিআইএ-র লিংক ইনস্ট্রাক্টর আব্দুর রশিদ, পিকিক-এর (PICIC) মোনিয়াম হোসেন প্রমুখরা যাদের কেউই সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন, সিদ্ধান্ত নেন যে, বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট নাম ধারণ ক'রে মুজিবর রহমান চৌধুরী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের একটি বিমান ছিনতাই করে ভারতে নিয়ে যেয়ে বিধ্বস্ত করবে। কিন্তু জনাব আব্দুর রশিদ একটি ভুল করে ফেলেন। তিনি পরের দিন শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমতি চাইতে গেলে শেখ মুজিব এ পদক্ষেপ না নেয়ার নির্দেশ দেন। ফলে পরিকল্পনাটি পরিত্যাক্ত হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব এ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে নস্যাতের ষড়যন্ত্র চলছে। এ ধরনের তৎপরতার ফল মারাত্মক হবে বলে তিনি উল্লেখ করে বিমান ছিনতাই ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনের দাবী জানান। শেখ মুজিব আরো বলেন, এটা অবশ্যই গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, জাতীর চরম সংকটময় মুহূর্তে এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি শুধুমাত্র অন্ত র্ঘাতকদের স্বার্থ হাসিল করবে।

ভারতীয় বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পরই ভারত তার আকাশসীমার উপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পিআইএ বিমানের ঢাকায় আসতে আগে যেখানে দু'ঘন্টা সময় লাগতো এখন শ্রীলংকার সিলোন হয়ে ঘুরে আসতে ছয় ঘন্টা সময় লাগে। যদিও পাকিস্তান সরকার ভারতীয় ঐ বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনাকে ভারত সরকারের ভারতের আকাশসীমার উপর দিয়ে বিমান যাতায়াত নিষিদ্ধ করার একটি ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করে।

Scanned by CamScanner

অথচ, ৩১শে জানুয়ারী ঢাকা থেকে ফিরে যাওয়ার সময় লাহোর বিমান বন্দরে অবতরণ করে জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিনতাইকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। সেদিন হয়ত তিনি তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন! হয়ত তিনি বললেন যে, আর দেরী নয়, উড়িয়ে দাও!

১৯৭১ খৃঃ জানুয়ারী মাসের ২৭ তারিখে পিপলস্ পার্টির নেতারা ঢাকায় আসেন। শেখ মুজিবুর রহমান এবং জুলফিকার আলি ভুট্টো ২৮ থেকে ৩০ জানুয়ারী, ঢাকায় তিন দিন আলোচনা করেন। ৩০ তারিখে এক বিবৃতিতে অন্যান্যের মধ্যে জুলফিকার আলি ভুট্টো বলেন যে, আওয়ামী লীগের ছয়-দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফা অর্থাৎ ১৭ দফার মধ্যে ১২টি দফা তিনি সমর্থন করেন, তবে বাকি পাঁচ দফার মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং ছয়-দফার ভিত্তিতে সংবিধান তিনি সমর্থন করেন না।

পরবর্তীতে জনাব ভুট্টো তাঁর "দি গ্রেট ট্রাজেডী" বইয়ে এ সম্পর্কে লিখেছেন, "১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসের ২৭ তারিখে পিপ্‌লস্ পার্টির নেতারা ঢাকায় গেলেন। আমাদের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করলাম শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফার ব্যাপারে অনমনীয়। আমাদের সোজাসুজি বললেন, তিনি ছয় দফার প্রশ্নে জনগণের কাছ থেকে ম্যান্ডেট লাভ করেছেন। সুতরাং এর থেকে এক ইঞ্চিও তাঁর পক্ষে সরে আসা সম্ভব নয়। আমাদের অবস্থা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে বললাম, আমরা ছয় দফার প্রশ্নে কোন ম্যান্ডেট লাভ করিনি। আমরা কিছু শাসনতান্ত্রিক বিষয়াবলী উপস্থাপন করলাম। কিন্তু অখন্ডভাবে যতক্ষণ ছয়দফাকে গ্রহণ না করা হচ্ছে ততক্ষণ আওয়ামী লীগ নেতারা পরবর্তী কোন আলোচনায় যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমরা মুজিবুর রহমানকে জানালাম যে, দেশের পশ্চিমাংশের জনগণ ছয় দফা বিরোধী। বললাম, ছয় দফার নিশ্চিত ফল হচ্ছে পাকিস্তানের শেষ হয়ে যাওয়া। এবং আমাদের মতামত হচ্ছে, জনগণের ধারণাও আমাদের থেকে দূরে নয়। আওয়ামী লীগ নেতা আমাদের অসুবিধাগুলো পুরোপুরি উপলব্ধি করলেন কিন্তু এগুলো গ্রহণে রাজী হলেন না। তিনি তাঁর রণকৌশল নির্ধারণ করে ফেলেছিলেন। এবং আমাদের অনুরোধ তাঁর পরিকল্পনার জন্যে উপযুক্ত বিবেচিত হলো না। রণকৌশল হলো সময় নষ্ট না করে জাতীয় পরিষদকে ডাকা এবং ছয় দফাকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়ে দেশকে ছয় দফাভিত্তিক একটি শাসনতন্ত্রের দিকে ঠেলে দেয়া। দেশের পশ্চিমাংশে তথা পূর্বাঞ্চলেও এর ফলাফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির আগেই তিনি এটা করতে চেয়েছিলেন।"

মূলতঃ আওয়ামী লীগের ছয় দফার কোনোরূপ নড়চড় না করতে চাইলে এটাই ছিল আওয়ামী লীগের জন্যে ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। কারণ, এরূপ আলাপ-আলোচনার পর এবং বিশেষ করে ৩০ তারিখে ভুট্টোর দেয়া বিবৃতির পরেও এক পাকিস্তান রাষ্ট্রে থাকার বা শেখ মুজিবের পক্ষে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সাধ থাকার কথা নয়।

৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় সংসদ অধিবেশন ডাকতে অনাবশ্যক বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি ছয়-দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনার কথার পুনরাবৃত্তি করেন এবং বলেন যে, আওয়ামী লীগ এ প্রতিজ্ঞা থেকে পিছপা হবে না। প্রয়োজনে তাঁরা জেলে যেতেও প্রস্তুত। তিনি আরও বলেন যে, ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণকে নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করবে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেশের সংবিধান রচনার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের অধিবেশন ঢাকায় অবস্থিত প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে ৩ মার্চ, ১৯৭১ বুধবার সকাল ৯-০০ ঘটিকায় আহবান করেন।

জুলফিকার আলি ভুট্টো ১৫ই ফেব্রুয়ারী পেশোয়ারে এক বিবৃতিতে বলেন যে, আওয়ামী লীগ যদি ছয় দফার কোন সমন্বয় করতে না চায় তাহলে পিপলস্ পার্টি জাতীয় সংসদে যোগাদান করবে না। তার বক্তব্য হ'ল, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারা ইচ্ছা করলে যেতে পারেন, তবে

Scanned by CamScanner

পাকিস্তান পিপলস পার্টি সদস্যগণ একমাত্র তখনই যাবেন যখন (ছয় দফা) সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে, (আওয়ামী লীগের) কর্তৃত্বতলে নির্দেশিত সংবিধানে স্বাক্ষর করতে যাবে না।

জুলফিকার আলি ভুট্টোর ১৫ই ফেব্রুয়ারীর বক্তব্যের জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান যা বলেন তা দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ১৬ই ফেব্রুয়ারী যেভাবে প্রকাশিত হয় তা হল ঃ

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিসমূহের যৌথ অধিবেশনে এক নীতিনির্ধারণী ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ফ্যাসিষ্ট পন্থা পরিহার করে গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে সংখ্যাগুরু শাসন মেনে নিয়ে দেশের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানান। জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থা বানচাল করার উদ্দেশ্যে তৎপর গণতান্ত্রিক রায় নস্যাৎকারীদের প্রতি আগুন লইয়া খেলা হইতে বিরত থাকার জন্য তিনি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, আমার ও ছয়-দফার মোকাবিলার জন্য সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করার চক্রান্ত চলছে। জনগণের দেয়া অধিকারের বলে ৬-দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচিত হবে। সাতকোটি বাঙ্গালীর বুকের উপর মেশিনগান বসিয়েও কেহ ঠেকাতে পারবে না।

১৫ ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট-এ অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দের যুক্ত সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে দলীয় লক্ষ্য অর্জনে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেয়া হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে যথাক্রমে জাতীয় পরিষদ পার্লামেন্টারী পার্টির লীডার ও ডেপুটি লীডার নির্বাচিত করা হয়।

জুলফিকার আলি ভুট্টো ১৭ ফেব্রুয়ারী করাচীতে অবস্থিত পিপলস্ পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে বললেন যে, বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ঢাকায় ৩রা মার্চ থেকে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশনে পিপলস্ পার্টি যোগ দেবে না। দ্য ডন্ পত্রিকার ১৮ ফেব্রুয়ারীর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, জনাব ভুট্টো বলেছেন যে, তাঁর পার্টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটি সিদ্ধান্তে সম্মত হওয়ার এবং পরস্পর বোঝাপড়ার সর্বোত্তম চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু, এখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে আপস-মীমাংসার আর কোন সুযোগ নেই।

২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্ট ভবনে সকল প্রদেশের গভর্ণর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের এক বিশেষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই বিশেষ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আবদুল হামিদ খান এবং প্রেসিডেন্টের প্রধান ষ্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জি, এম, পীরজাদা উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিনই এপিপি/পিপিআই-এর খবরে প্রকাশ দেশের বর্তমান পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আজ সোমবার সকাল থেকে মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করে দিয়েছেন বলে গতকাল সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট থেকে প্রচারিত এক ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়।

পিপ্‌লস্ পার্টির মুখপাত্র এবং জাতীয় পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য জনাব আবদুল হাফিজ পীরজাদা সে রাতে বলেন, তাঁর দলের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করা হয়েছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগের নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই বোধোদয় হওয়া উচিত ছিল। আইনগত কাঠামো অধ্যাদেশ মেনে নিয়ে নির্বাচন করার প্রেক্ষিতে বহুজাতিক রাষ্ট্রের প্রশ্নে নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন, অন্যথায় আঞ্চলিকভাবে সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসে গিয়েছিলো। কিন্তু এর কোনটিই পরিলক্ষিত হয়নি। আওয়ামী লীগ তখনও একমাত্র নির্ভরশীল ছিলেন জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মোহের উপর।

Scanned by CamScanner

২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ মণি সিংহ-এর নেতৃত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি' রাজনৈতিক প্রস্তাব আকারে ৬ দফা সম্বলিত একটি প্রস্তাবনা প্রকাশ করে। অন্যান্যের মধ্যে সে প্রস্তাবে বলা হয় ঃ

"পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অবিলম্বে বসিবে ইহাই সকল জনগণ আশা করিয়াছেন। ... বিলম্বে হইলেও ৩রা মার্চ পরিষদের যে অধিবেশন আহবান করা হইয়াছে তাহা অনুষ্ঠিত হউক ইহাও জনগণের আশা। এই অধিবেশনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যূনতম ভাবে ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত হউক ইহাও আজ পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দাবী। ... ভুট্টো নানা প্রকার গণতন্ত্র বিরোধী ও অযৌক্তিক কথা তুলিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতেছে। ক্ষমতাসীন শাসকচক্রের ভূমিকাও এক্ষেত্রে অনিশ্চিত থাকিয়া যাইতেছে। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিবে কি বসিবে না, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে কি হইবে না, প্রণীত হইলে উহা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ করিবে কি করিবে না এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে কি হইবে না—এই সমস্ত বিষয়ে একটা গভীর অনিশ্চয়তা বিরাজ করিতেছে। অন্যদিকে কিছু উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী তথাকথিত স্বাধীন পূর্ব বাংলার নামে অবাঙ্গালী বিরোধী জিগির তুলিয়া এবং মওলানা ভাসানী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়াজ তুলিয়া জনগণের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বিরোধী মনোভাব গড়িয়া তুলিয়া অবস্থাকে আরও জটিল ও ঘোরালো করিয়া তুলিতেছে। ... এক্ষেত্রে আমরা দাবী করি যে, পাকিস্তানের জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি সম্বলিত গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হউক। এই পরিষদ যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে প্রেসিডেন্টকে তাহাই অনুমোদন করিতে হইবে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে। ...বর্তমানে নির্বাচনের রায়কে কার্যকরী করিতে না দেওয়া হইলে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন এই অঞ্চলে একটা পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে যাইতে পারে। পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা জনগণের এই সংগ্রামকে অবাঙ্গালী জনগণ বিরোধী খাতে প্রবাহিত করিতে প্রয়াসী হইতে পারে। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলায় আমাদের কর্তব্য হইবে, বাঙ্গালীদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে জনগণের এই সংগ্রামে আমাদের শরীক থাকা এবং ঐ নীতির ভিত্তিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এই সংগ্রামকে সঠিক গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করতে প্রচেষ্টা করা। ...এই সংগ্রামে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা ও সমর্থন চাই এবং তাহাদের জাতীয় অধিকার ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম আমরা সমর্থন করি। এই সংগ্রামের সফলতার জন্য উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের অবাঙ্গালী জনগণ বিরোধী জিগির এবং মওলানা ভাসানীর পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণবিরোধী জিগিরের মুখোশও আমাদের খুলিয়া দিতে হইবে।

পরিশেষে আমাদের অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, এই সংগ্রাম স্বাধীন জাতীয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্মুখে রাখিয়া আমাদের প্রচেষ্টা হইবে এই সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির তথা দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা।"

অথচ তথাকথিত সেই পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা অনিল মুর্খার্জি তাঁর 'স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি' বইয়ে লিখেছেন, "এই কারণেই পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টরা প্রথম হইতেই পূর্ব বাংলার বাঙালীদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে নিসঙ্কোচ স্বীকৃতি দিয়েছে, গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং স্বাধীন বাঙলাদেশ আন্দোলনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে" (পৃ ঃ ৯৩)।

পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের ছোট ছোট দলগুলো জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও মুসলীম লীগ (কাইয়ুম) জেডে,এ, ভুট্টোর সিদ্ধান্তের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে, তাদের জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ৯ জন। ফলে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির ৮৮ জনের

Scanned by CamScanner

সঙ্গে ৯ জন যোগ হয়ে অধিবেশনে যোগ না দেয়ার পক্ষে দাঁড়ালেন ৯৭ জন নির্বাচিত সদস্য। কিছু শক্তি সঞ্চিত করে এবার জুলফিকার আলি ভুট্টোর পিপ্‌লস্ পার্টি এক প্রস্তাবে সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত একটি সুপারিশ পেশ করে যা শেখ মুজিব ৬ দফার প্রশ্নে অটল থাকার ঘোষণা দেয়ায় বাতিল হয়ে যায়।

২৬শে ফেব্রুয়ারী জনাব ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে করাচীর প্রেসিডেন্ট ভবনে এক বৈঠক করেন। আলোচনার বিষয়বস্তু জনগণের অজানা থেকে গেল। তবে, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভুট্টো লাহোরের জনসভায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা বা একশ কুড়ি দিনের মধ্যে সংবিধান রচনার সময়সীমা প্রত্যাহারের দাবী জানান। তিনি ঘোষণা দিলেন যে, পিপ্‌লস্ পার্টির কোন সদস্য জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিলে তাকে নিশ্চিহ্ন করা হবে।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর আহসান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে রাজনৈতিক সংলাপ শুরু হলেও তা ব্যর্থ হয়।

অন্যদিকে ২৭ ফেব্রুয়ারী থেকে পিআইএ (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স) বিমানে ২৭ বালুচ রেজিমেন্ট এবং ১৩ ফ্রন্টিয়ার্স ফোর্সের সৈন্যরা ঢাকায় আসতে শুরু করল।

সে সঙ্গে বিভিন্ন সংস্থার বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে এ মর্মে খবর পরিবেশিত হতে থাকল যে, ৩রা মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পিছিয়ে যেতে পারে।

সিদ্দিক সালিক-এর উইটনেস টু সারেন্ডার বাংলায় "নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল" বই থেকে জানা যায় যে, ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার জেনারেল পীরজাদা পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর এডমিরাল আহসানকে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরিষদের বাইরে খসড়া শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলসমূহ যাতে ঐকমত্যে পৌছতে পারে, সে ব্যাপারে সময়দানের উদ্দেশ্যে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের ঘোষণা যাতে কোন ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার বিস্ফোরণ না ঘটায়, সেজন্যে বিষয়টি শেখ মুজিবকে জানিয়ে আগে থেকেই তাঁকে তৈরী রাখা দরকার। গভর্ণর আহসান শেখ মুজিবকে গভর্ণর হাউজে এনে বিষয়টি তাঁকে অবগত করান। শেখ মুজিব প্রতি উত্তরে যা বলেন তা হল ঃ "এনিয়ে আমি কোন ঘটনা সৃষ্টি করবো না যদি আমাকে নতুন কোন তারিখ দেয়া হয়। যদি নতুন তারিখটি সামনের মাসে (মার্চ) হয়, আমি পরিস্থিতি সামলাতে পারবো। এপ্রিলে হলে আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। কিন্তু স্থগিতকরণটি যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্য হয়, তাহলে পরিস্থিতি সামলানো আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।" উক্ত দলিলে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, গভর্ণর হাউস থেকে বের হয়ে আসার সময় শেখ মুজিব মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে বলেছেন, "আমার অবস্থা—দু'পাশে আগুন, মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে। হয় সেনাবাহিনী আমাকে মেরে ফেলবে, না হয় আমার দলের ভেতরকার চরমপন্থীরা আমাকে হত্যা করবে। কেন আপনারা আমাকে গ্রেফতার করছেন না? টেলিফোন করলেই আমি চলে আসব।"

গভর্ণর আহসান ২৮ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়া রাওয়ালপিন্ডিকে টেলিফোনে জানান এবং অনুরোধ করেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণার সাথে সাথে যেন বৈঠকের নতুন তারিখও ঘোষণা করা হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতায় বলেন যে, ৬-দফা কারো উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না। তিনি বলেন, ৬-দফা কর্মসূচী কেবল বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্যেই নয়, বরং আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকেও বাংলাদেশের সমপরিমাণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয়ার পক্ষপাতী। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই জাতীয় পরিষদে সমাধান খুঁজে বের করা যেতে পারে। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে অগ্রিম আশ্বাস কেউই দিতে পারে না। তবে কেউ কোন ভাল পরামর্শ দিলে অন্যরা তা শুনবেন না কেন? তিনি

Scanned by CamScanner

ঘোষণা করেন, পাকিস্তান যেমন টিকে থাকবে, তেমনি টিকে থাকবে বাংলাদেশ, সিন্ধু, এন ডব্লিউ এফ পি (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) এবং বেলুচিস্তান। আর যা থাকবে না তা হচ্ছে মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ। তিনি বলেন যে, জনগণের মঙ্গলের জন্য ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলোকে জাতীয়করণ করা হবে। শেখ মুজিব বলেন যে, জয় বাংলা কোনরূপ রাজনৈতিক শ্লোগান নয়, এ শ্লোগান হচ্ছে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্বাধীনতার শ্লোগান। এ বক্তৃতায় শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন যে, তাঁরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শানুযায়ী অর্থনীতি ছাড়া ৫৫,০০০ বর্গমাইল এলাকায় ৭ কোটি মানুষ বাঁচতে পারে না।

উল্লেখ্য যে এখানেও শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান ও তার জনগণের কথাই বলেছেন। তিনি গোটা পাকিস্তানের ৩,৬৫,০০০ বর্গমাইল এলাকার ১৩ কোটি লোকের কথা বলেন নি। তাদের এ সমাজতন্ত্র কোন্ ধরনের তা আমাদের বোধগম্য নয়! পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে একটি প্রদেশে সমাজতন্ত্র!

আইনগত কাঠামো আদেশ জারি হওয়ার ১১ মাস পরে শেখ মুজিবুর রহমান এ সভায় কিছু ইতিবাচক দিক নির্দেশনা দিলেও তা অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রশ্ন বিদ্ধ হয়েছিল ইতিমধ্যে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ইয়াহিয়া-ভুট্টো এন্ড কোম্পানি তাঁদের মতো করে পরিকল্পনাও রচনা করে ফেলেছে। তাঁদের তখন প্রয়োজন ছিল সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্যে কিছু সময়। নির্বাচন পরবর্তী সময়কালে শেখ মুজিবুর রহমান দেখলেন ও বুঝলেন যে ভুট্টো যা চায় তাই হয়, কিন্তু করণীয় নির্ধারণে হলেন ব্যর্থ। তিনি সেদিন বললেন না বা বলতে পারলেন না যে বর্তমান পর্বে বা সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে একজন সৈন্যও আমদানি করা চলবে না।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন দলের ৩৫ জন নির্বাচিত সদস্য ঢাকায় এলেন। তাঁরা বুঝতেই পারেননি যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে না।

১লা মার্চ, ১৯৭১ দুপুর ১টা ৫ মিনিটের সময় প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা সংক্রান্ত একটি বিবৃতি দেশের রেডিওতে প্রচারিত হ'ল। বিবৃতিতে অন্যান্যের মধ্যে বলা হ'ল, "বিগত কয়েক সপ্তাহে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা মিলিত হয়েছেন কিন্তু দুঃখজনক যে কোনোরূপ ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছেন, আমাদের কোন কোন নেতা অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ার অবস্থা অতীব দুঃখজনক। সংক্ষেপে অবস্থা হ'ল পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যেমন পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি, অধিকন্তু আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদান না করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। উপরন্তু, ভারত কর্তৃক সৃষ্ট সাধারণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সার্বিক অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে। অতএব, আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান পরবর্তী কোন তারিখের জন্যে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতকরণের ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মেনে নেয়নি। মুহূর্তের মধ্যেই জনগণ বিস্ফোরণের রূপ পরিগ্রহ করে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় একই অবস্থা বিরাজ করে। "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫" বইয়ে জনাব অলি আহাদ লিখেছেন, "জাতীয় পরিষদ মুলতবী ঘোষণায় হতচকিত ঢাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। ঢাকা স্টেডিয়ামের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ দর্শক কর্তৃক পরিত্যাজ হয়; ঢাকা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন ও ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের প্রতিবাদ মিছিল রাস্তায় নামে; ছাত্র সম্প্রদায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে রাজপথে নামিয়া আসে; বিভিন্ন শিল্প এলাকা হইতে শ্রমিকরা দলে দলে মিছিল সহকারে রাজধানী ঢাকা মুখে যাত্রা করে; সকল সিনেমা হল বন্ধ হইয়া যায়। এই সব বিক্ষোভ মিছিলের স্রোত হোটেল পূর্বাণীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। হোটেল পূর্বাণীতে তখন আওয়ামী লীগ

Scanned by CamScanner

জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী পার্টির সভা চলিতেছিল। মিছিলকারীরা সহস্র কণ্ঠে আওয়াজ উঠায়, পাকিস্তানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর। বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা কর।" (পৃঃ ৩৬৬)।

১লা মার্চ ১৯৭১ হোটেল পূর্বাণীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রেক্ষিতে ৩রা মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহবান জানায়। সে-সঙ্গে রেস কোর্স ময়দানে ৭ই মার্চ (রবিবার) জনসভার তারিখ ঘোষণা করা হয়। সে সভা থেকে ঐ দিনই ঢাকায়ও একটি ধর্মঘট আহবান করা হয়।

পার্লামেন্টারী পার্টির সভার শেষে শেখ মুজিবুর রহমান বিক্ষুব্ধ জনগণের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে ঘোষণা করলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ গণতান্ত্রিক মূলনীতি লংঘন করেছেন। আমরা পরিষদ অধিবেশন মুলতবী ঘোষণাকে বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেব না। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলবো। তবে আমাদের প্রতিরোধ হবে গণতান্ত্রিক অহিংসা-অসহযোগ। এই মুহূর্তে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা এক সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্রেরই ফলশ্রুতি এবং আমরা এর কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ না করে পারি না। পূর্ব পাকিস্তানের সকল এম,এন,এ এখন ঢাকায় এবং ভুট্টো ও কাইয়ুম খানের দল ছাড়া আর বাকী সকল পশ্চিম পাকিস্তানী এম,এন,এ অধিবেশনে যোগদান করে শাসনতন্ত্র রচনায় সহায়তা করতে প্রস্তুত। এমতাবস্থায় একটি সংখ্যালঘু দলের একগুয়েমি দাবীর ফলে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষিত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এটা সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক। এর প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকায় এবং আগামী বুধবার (৩রা মার্চ) সারাদেশে সাধারণ হরতাল পালিত হবে এবং আগামী রোববার (৭ই মার্চ) রেসকোর্সে এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় শেখ মুজিবুর রহমান (এই প্রথম) জানান যে তিনি ঘটনাদির সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে মওলানা ভাসানী, জনাব নুরুল আমিন, জনাব আতাউর রহমান খান, প্রফেসর মুজফফর আহমেদ এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সত্বর আলাপ করবেন। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করার আগে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি। তবে, উল্লিখিত নেতাদের সঙ্গে শেখ মুজিব আদৌ কোন আলাপ করেছিলেন কিনা তা জানা যায় নি।

নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল বই থেকে জানা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক শেষ করে বিক্ষুব্ধ জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার পর সোজা চলে এলেন গভর্ণর হাউসে। তিনি গভর্ণর আহসানকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের নতুন তারিখ নির্ধারণের অনুরোধ করেলেন এবং বললেন, "আমি আপনাদের আশাবাদ দিচ্ছি এবং বলছি, এখনও সময় আছে। এখনই যদি আমাকে একটা নতুন তারিখ দেন, তাহলে আগামীকালই জনগণের ক্রোধ প্রশমিত করতে পারবো। এর পরে হলে অনেক দেরী হয়ে যাবে।"

এদিনই সন্ধ্যায় গভর্ণর আহসান শেখ মুজিবের অনুরোধ এবং পরামর্শ পিন্ডিকে অবহিত করলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার জেনারেল পীরজাদা এসব কথায় গুরুত্ব দিতে চাইলেন না। পরে গভর্ণর আহসান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে প্রেসিডেন্টকে রাজি করাবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ফল কিছুই হল না। উপরন্তু ঐ রাতেই গভর্ণর আহসানকে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হল এবং জেনারেল ইয়াকুবকে ঐ দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে নির্দেশ দেয়া হল। গভর্ণর আহসানকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করার পর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের নতুন কিছু ভাবা উচিত ছিল।

১লা মার্চ—এ দিনই গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। সেদিনই পতাকা বানানো হয় এবং পরের দিন ঐ পতাকাই উড়ানো হয়।

Scanned by CamScanner

২মার্চ, ১৯৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভি,পি আ,স,ম আব্দুর রব লাল-হলুদ-সবুজ পতাকা উত্তোলন করেন। সেদিন সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সারা দেশের মানুষ নেমে পড়েছিল রাস্তায়। স্লোগানে-মিছিলে চারদিকে স্বাধীনতার এক আওয়াজ ধ্বনিত হয়েছিলো। এদিন ঢাকার ফার্মগেইট এলাকায় সরকারের বাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র জনগণের উপর গুলি চালানো হয় এবং তাতে অন্তত দুজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। সেদিন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং সরকারকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার আহবান জানান। এই বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমান অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে বলেন, একদিনের জন্যেও আর সামরিক আইন অব্যাহত রাখার কোন যুক্তি নেই। এদিন তিনি আগামী ৭ই মার্চ পর্যন্ত যে কর্মসূচী ঘোষণা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ

(ক) সমগ্র প্রদেশব্যাপী ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত সকাল ছয় ঘটিকা থেকে দুপুর দুই ঘটিকা পর্যন্ত সর্বাত্বক হরতাল পালিত হবে। শুধুমাত্র এ্যামবুলেন্স, সংবাদপত্র গাড়ি, হাসপাতাল, ঔষধের দোকান, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ হরতাল বহির্ভূত থাকবে। শেখ মুজিবুর রহমান শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে হরতাল পালনের আহবান জানান। তিনি বলেন, জনসাধারণকে বিশেষ করে উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, ভাষা ও জন্মস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশে বসবাসকারী সবাই আমাদের কাছে বাঙালী। তাদের জান, মাল ও সম্মান আমাদের কাছে পবিত্র আমানত।

(খ) ৩রা মার্চ জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালিত হবে। এদিন পল্টন ময়দানে ছাত্র লীগের সভা শেষে বৈকাল ৪ ঘটিকায় একটি শোভাযাত্রা বের হবে যার নেতৃত্ব দেবেন স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান।

(গ) ৭ই মার্চ ২ ঘটিকায় রেস কোর্স ময়দানে জনতার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেবেন, সে সেময় তিনি অধিকতর নির্দেশাবলীর ঘোষণা দেবেন।

২রা মার্চ আরও কিছু ঘটনা ঘটল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে বেসরকারী প্রশাসন সৈন্য মোতায়েন দাবী করে। গণ-রোষের স্বীকার গভর্ণর হাউস পাহারার জন্যে হেলিকপ্টার যোগে সৈন্য এনে সেখানে মোতায়েন করা হল। উত্তেজনা এখানে তুঙে উঠল। গুলিবর্ষণের ঘটনাও ঘটল। জনতার মধ্য থেকে ৬ জন মারা গেলেন। আর তিনজন গভর্ণর হাউসের কাছে।

তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদেরকে একমাত্র বৈধ ক্ষমতার উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বেআইনী সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে সরকারী কর্মচারীসহ সকলের প্রতি আহবান জানানো হ'ল।

সেদিন 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন' শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে প্রচারপত্র বিলি করে। তাদের প্রস্তাবাবলীতে অন্যান্যের মধ্যে "পূর্ব বাংলায় জাতীয় মুক্তি বাহিনী গঠন এবং শহর ও গ্রামে জাতীয় শত্রু খতমের ও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহবান" সহ "পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিক-কৃষক এবং প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব-বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে "জাতীয় মুক্তি পরিষদ" বা "জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট" গঠন-এর আহবান জানানো হয়। প্রচারপত্রে যে সকল স্লোগান ছিল তার মধ্যে ছিল "পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতা—জিন্দাবাদ", "পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র—জিন্দাবাদ", "পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও তার দালালদের খতম করুন"।

Scanned by CamScanner

এ দিন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে বন্দুকের দোকান লুট হওয়া শুরু হয়। তবে, আওয়ামী লীগ নেতারা সে সকল অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হলেন। কেউ কেউ তাঁদের বললেও উল্লেখযোগ্য কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি। অস্ত্র বিক্রয়ের ঘটনাও ঘটেছে। অস্ত্রের মধ্য থেকে একটা ভাল অংশ আওয়ামী লীগ বিরোধী অংশের হস্তগত হয়। অপরদিকে বিভিন্ন শহরে পাকিস্তানী সৈন্য মোতায়েন করা শুরু হয়।

৩রা মার্চ, ১৯৭১—আগের দিনের ঘোষণা অনুসারে এ দিন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের শহর ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক আকারে কালো পতাকা এবং তার পাশাপাশি লাল-হলুদ-সবুজ পতাকা উড়ানো হয়। সমগ্র প্রদেশ জুড়ে জনগণ বিস্ফোরণমুখ, তারা তাকিয়ে থাকেন একটি হুকুমের অপেক্ষায়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ পল্টন ময়দানে শোক সভার আয়োজন করে। পল্টন ময়দানে সেদিন ছাত্র-জনতার স্রোত নেমেছিল। সভায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানায় এবং সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী যা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে থাকে, "এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ শক্তির লেলিয়ে দেওয়া সশস্ত্র সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালীদের উপর গুলিবর্ষণের ফলে নিহত বাঙালী ভাইদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ শক্তির সেনাবাহিনীর এই জঘণ্য হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য আহবান জানাইতেছে"; "এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষনহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে।"

সেদিনের সে সভায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের' ঘোষণা ও কর্মসূচী তথা স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করে শোনান স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ-এর ছাত্রনেতা শাজাহান সিরাজ। তাতে বলা হয়, "গত তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন এ'কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালীকে গোলামে পরিণত করার জন্যে বিদেশী পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালীর মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণবায়কে বানচাল করে শেষবারের মতো বিদেশী পশ্চিমা শোষকেরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

৫৪ হাজার ৫শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্যে আবাসভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ' রাষ্ট্রের নাম 'বাঙলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক, শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

(৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।"

Scanned by CamScanner

পল্টন ময়দানে ও তার আশ-পাশে শোকসভায় উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করার এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানান। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকারের ট্যাক্স প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহবান জানান। ত্রিশ মিনিটের ভাষণে তিনি জনগণকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। শেখ মুজিব প্রতিদিন সকাল ছয়টা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত সকল সরকারী অফিস, সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্ট (অর্থাৎ, সকল প্রকারের আদালত), আধা-সরকারী সংস্থা ও কর্পোরেশন, পি,আই,এ, রেলওয়ে ও অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যমে, পরিবহণ, সকল শিল্প কল-কারখানা, শিল্পপণ্যোৎপাদী ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানাদী এবং বাজারসমূহ সহ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি হরতাল পালনের আহবান জানান। এক পর্যায়ে তিনি পল্টন ময়দানে আজকের ভাষণ হয়ত তাঁর "শেষ ভাষণ" উল্লেখ করে জনগণকে তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহবান জানান।

এ সভার পরে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে মিছিল হওয়ার কথা ছিল, শেখ মুজিব তা স্থগিত ক'রে তার জায়গায় গণতন্ত্রের সংগ্রামে যারা নিহত হয়েছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে প্রার্থনা করেন।

ঐ সভায় শেখ মুজিব আরো বলেন, ৭ই মার্চের মধ্যে সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন না হলে রেসকোর্স ময়দানে আমি আমার পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করব। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ক'রে ব্যারাকে ফিরিয়ে না নিয়ে যাওয়া এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সরকারের ক্ষমতা ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন চলবে।

৩রা মার্চ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের গুলিতে এদিন রাজশাহীতে একজন নিহত এবং চারজন আহত হন। একই দিন খুলনায় একটি মিছিলে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে, তাতে আজিজুল হক, খালেদসহ কয়েকজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হন। এ দিন চট্টগ্রামে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালির মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এতে ৩ ও ৪ তারিখে দু'দিনে নিহত হন ১২০ জন। বিচ্ছিন্নভাবে খুলনায়ও তেমন ঘটনার সূত্রপাত হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন শহরের বন্দুকের দোকান লুটের ঘটনা বৃদ্ধি পায়।

সিদ্দিক সালিক-এর নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল বই থেকে জানা যায় যে, ৩রা মার্চ সকালেই গভর্ণর জেনারেল ইয়াকুব রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্টকে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে ধাবিত হবার কথা জানালেন। একই ভাবে পরিস্থিতির সার্বক্ষণিক অবস্থা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে জানানো হচ্ছিল। যখন প্রেসিডেন্ট নিশ্চিত হলেন যে, ফিরে আসার কোন পথ নেই, তখন তিনি তাঁর উদ্দেশ্য জানালেন। জেনারেল ইয়াহিয়া ১০ই মার্চ ঢাকায় রাজনীতিবিদদের সাথে মিলিত হতে চাইলেন। প্রেসিডেন্টের এই ইচ্ছার কথা ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষ মুজিবকে জানালেন এবং শেখ মুজিব বৈঠকে সম্মত হলেন। শেখ মুজিবের সম্মতি রাওয়ালপিন্ডি পাবার পরই প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে ১০ই মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের সকল পার্লামেন্টারী গ্রুপের নির্বাচিত নেতাদের সম্মেলনে আহবান করা হলো। সঙ্গে সঙ্গেই পিপ্‌লস্ পার্টির তরফ থেকে সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হল। কিন্তু শেখ মুজিব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এখনও যখন বিভিন্ন সড়কে শহীদের রক্ত শুকিয়ে যায়নি এবং যখন কিছু কিছু লাশ কবর না দেয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং শত শত ব্যক্তি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছে, সে সময় নিষ্ঠুর পরিহাসের মত এ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর

Scanned by CamScanner

এমন কিছু ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হবার জন্যে এই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যাদের দুরভিসন্ধিই নিরপরাধ ও নিরস্ত্র কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী।

শেখ মুজিবের এই ভাবে সম্মেলন প্রত্যাখ্যান করা ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষকে বিস্মিত করল। কারণ, শেখ মুজিবের সম্মতি নিয়েই সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। শেখ মুজিবকে তাঁরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি পরিষ্কারই বললেন, "রাজনীতিবিদদের সঙ্গে এককভিত্তিক আলোচনার প্রশ্নে আমি ইয়াহিয়ার প্রস্তাবিত বৈঠকে অংশ নিতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু আমি চাইনি কিংবা বসতেও চাইনা ভুট্টোর মত লোকের সঙ্গে যে বাঙালীর রক্তপাতের জন্য দায়ী।"

এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে যেয়ে রাও ফরমান আলী "ভুট্টো শেখ মুজিব বাংলাদেশ" বইয়ে উল্লেখ করেছেন, জেনারেল ইয়াকুব পুনরায় তারবার্তা পাঠিয়ে বললেন, আপনি (প্রেসিডেন্ট) ঢাকা আসুন এবং একটা রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করুন। পিন্ডি থেকে গোপনে পয়গাম এলো প্রেসিডেন্ট ১০ তারিখে নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য আসছেন। এ ব্যাপারে শেখ মুজিবের সাথে অগ্রিম খরব দেবার জন্য বলা হলো। শেখ মুজিব এতে সম্মত হলেন। পরে তিনি আবার বললেন, তিনি কোন রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে বসতে রাজী নন।

উল্লেখ্য যে, নির্বাচনের পরে ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানকে একবার পশ্চিম পাকিস্তানে যাবার অনুরোধ জানালে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বিলম্বে হলেও শেখ মুজিব ১৯ ফেব্রুয়ারী যেতে রাজী হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ১৮ই ফেব্রুয়ারী জনাব ভুট্টো এক বক্তৃতায় বলে বসলেন, ঢাকা পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য বধ্যভূমি হবে। শেখ মুজিব মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে (যিনি ছিলেন মধ্যস্থতাকারী) টেলিফোন করে চরম অস্থিরতা প্রকাশ করে বলেন, ঢাকা যদি তাদের জন্য বধ্যভূমি হবে, তবে পশ্চিম পাকিস্তান আমার জন্য 'জবাইখানা' হবে। আমি আর রাওয়ালপিন্ডি যাব কি করে? শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়া বাতিল করেন।

এ ঘটনাগুলো ক্ষুব্ধ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে নিশ্চিতরূপেই অধিকতর ক্ষুব্ধ করেছিল। অথচ আমরা দেখেছি যে পরবর্তীতে ২২ মার্চ, ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ভবনে শেখ মুজিব ও ভুট্টোর সঙ্গে ইয়াহিয়ার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শুধু তাই নয়, ১৯৭৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ভুট্টোকে যে অভ্যর্থনা দিয়েছেন তা অনেকের কাছেই ঈর্ষ্যার বিষয় ছিল। অনেকেই সে সময়ে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য, তা হ'ল, আওয়ামী লীগের অনেক প্রতিনিধি পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এটা ঠিক যে তাঁরা কোন আসন লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু, আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পরে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতেও পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল সফল করেন নি। এটা একজন দেশ-নেতা হিসেবে নিশ্চয়ই প্রশ্নবোধক হয়ে থাকবে! পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন আর পশ্চিম পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে যাবেন না এটা নিশ্চয়ই রাষ্ট্রনায়কসুলভ আচরণ নয়।

এদিন (৩রা মার্চ) রাজশাহী শহরে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা থেকে ১১ ঘন্টার জন্যে কারফিউ (সান্ধ্য-আইন) জারী করা হয়।

৪ঠা মার্চ ঢাকার রেডিও পাকিস্তানের যায়গায় 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' নামে অনুষ্ঠান প্রচার করা শুরু হয়। এদিন আওয়ামী লীগ একটি শান্তি কমিটি গঠন করে। ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে

Scanned by CamScanner

অবাঙ্গালিদের জনসভা হয়, তারা সেখান থেকে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। শেখ মুজিব এদিন আহতদের হাসপাতালে দেখতে যান।

এদিন শেখ মুজিব এক বিবৃতি মারফত যে সব সরকারী ও বেসরকারী অফিসের কর্মচারীদের এখনও বেতন দেয়া হয়নি, সে সকল অফিস ৫ ও ৬ তারিখ বিকেল ২-৩০ মিঃ থেকে ৪-৩০মিঃ পর্যন্ত বেতন প্রদানের জন্য খোলা রাখার নির্দেশ দিলেন। একইভাবে ব্যাংক সমূহকে এই দুই দিন উল্লিখিত সময়ে বেতনের চেকের অর্থ শুধু মাত্র "বাংলাদেশ"-এর অভ্যন্তরে লেন-দেনের নির্দেশ দিলেন। তাঁর আহবানে সর্বাত্মকভাবে সাড়া দেয়ার জন্যে জনগণকে অভিনন্দন জানালেন। রেশনের দোকান ও খাদ্য সরবরাহ সংস্থাকেও অনুরূপ সুযোগ দেয়া হয়। জনজীবনের জন্য জরুরী বিভাগ এবং সংবাদপত্র বিভাগকে হরতালের বাইরে রাখার ঘোষণা দিলেন শেখ মুজিব।

এদিন পূর্ব পাকিস্তানের অনেক জেলা শহরে ব্যাপক সৈন্য মোতায়েন হয়।

৫ই মার্চ টঙ্গী শিল্প এলাকায় পাকিস্তানী সৈন্যদের গুলিতে নিহত হন চারজন এবং গুলিতে আহত ১৫ জন ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। রাজশাহীতে গুলিতে নিহত হন একজন এবং আহত হন চারজন। রাজশাহী শহরে সকাল দশ ঘটিকা থেকে পরের দিন সকাল সাত ঘটিকা পর্যন্ত আবার কারফিউ জারি করা হয়। চট্টগ্রামে নিহত হন ১৩৮ জন। রংপুর, সিলেট, খুলনা ও খালিশপুরে বিভিন্ন মেয়াদে কারফিউ জারী করা হয়। এ প্রসঙ্গে লিখতে যেয়ে ৬ মার্চ তারিখে প্রকাশিত সাপ্তাহিক স্বরাজ লিখেছে, "রংপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোহর আর ঢাকায় ক'দিন ধরে এক বিভীষিকাময় অবস্থা বিরাজ করছে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার সাত কোটি আদম-সন্তান আক্রোশে ফেটে পড়েছে। শহর, বন্দর আর গ্রামে গ্রামে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ ও জনসভা। সমস্ত বাংলার পুঞ্জীভূত আক্রোশের প্রচন্ড বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।"

এখানে উল্লেখ করতেই হচ্ছে যে, সে সময়কালে কারফিউ জারী করলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষই তা মানছেন না। কারফিউ ভাঙ্গাকেই একটা প্রতিবাদ হিসেবে জনগণ গ্রহণ করেছে।

// ৫ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ভারতীয় রেডিওর প্রচারিত একটি খবরের প্রতিবাদ করেন। ভারতীয় রেডিওতে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের মানুষের উপর নির্যাতন বন্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমান আবেদন জানিয়েছেন। ভারতীয় রেডিও আরও বলেছিল, শেখ মুজিব ভুট্টোর সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান ঐ রূপের খবরকে কল্পনাপ্রসূত ও অনিষ্টকর বলে অভিমত করলেন। //

এক বিবৃতিতে প্রবীণ রাজনীতিবিদ জনাব আবুল মনসুর আহমদ পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাকান্ড ও অবিচারের প্রতিবাদে সম্মানসূচক পাকিস্তানী তঘমাধারী সকলকে তঘমা (খেতাব) বর্জন করার আহবান জানান। এদিকে ২রা মার্চ সৈন্য মোতায়েনের পর সৈন্যদের গুলীবর্ষণে ৫ই মার্চ পর্যন্ত দেড় শতাধিক মৃত্যুর খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাতে আহতের সংখ্যা শত, শত বলা হয়। সেনা কর্তৃপক্ষ কারফিউ দিয়ে গুলি চালিয়ে বিক্ষোভ ও জনতার রোষ ও ক্ষোভ মোকাবেলার চেষ্টা করে পরিস্থিতির অবনতিই ঘটিয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী করলেন সৈন্যদের সব স্থান থেকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে। সেনাদের পক্ষ থেকে আইন শৃঙ্খলাকে কে নিয়ন্ত্রণ করবে, এরূপের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব সে দায়িত্ব তাঁর উপর ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবের এই প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করল এবং রাওয়ালপিন্ডির

Scanned by CamScanner

নির্দেশ নিয়ে, বিগত ২৪ ঘন্টায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফেরৎ নেয়ার ঘোষণা দেয়।

এ প্রসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত বইয়ে রাও ফরমান আলী লিখেছেন, সেনাবাহিনী মাত্র ২ দিন শহরে টহল দিয়েছিল। এরপর আওয়ামী লীগের পীড়া-পীড়িতে তাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হলো। শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমি দেখব। আমার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও পুলিশ-আনসার শান্তি-শৃঙ্খলার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

এদিন সারা প্রদেশ জুড়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগ ঢাকায় বাঁশের লাঠি নিয়ে এক বিশাল মিছিল করে। ৩রা মার্চ গুলির প্রতিবাদে এদিন খুলনায় একটি মিছিল বের করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী মিছিলে গুলি চালালে দুইজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হন।

জেনারেল ইয়াকুব প্রেসিডেন্টের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে একমত হতে না পেরে ৫ই মার্চ পদত্যাগ করেন। জানা যায় যে, জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং জেনারেল খাদেম রাজাও সেদিন পদত্যাগের কথা বলেছিলেন। তিনজনই একসঙ্গে পদত্যাগ করার কথা বললে বিদ্রোহের অভিযোগ আসতে পারে বলে জেনারেল ইয়াকুব তাঁদের পদত্যাগ করা থেকে বিরত রাখেন। এদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠক করেন। সুদীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা ব্যাপী এ বৈঠকেই হয়ত সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল সুপরিকল্পিত দমনের কলাকৌশল। এই বৈঠকের পরই সরকারী ঘোষণা এল যে, ৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। এখানে রাও ফরমান আলীর কিছু বক্তব্য উল্লেখ্য। জেনারেল রাওকে ঢাকা থেকে রাওয়ালপিন্ডি যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন, "তখন রাতের এগারটায় করাচীতে শেষ ফ্লাইট যেতো। হাতে তেমন সময় ছিল না। আমি এয়ার পোর্টে খবর পাঠালাম আমার জন্য যেন অপেক্ষা করা হয়। হঠাৎ খেয়াল এলো, যাবার আগে একবার শেখ সাহেবের সাথে দেখা করে গেলে বোধ হয় ভাল হবে। ফোনে যোগাযোগ করা হলে শেখ সাহেব বললেন, এক্ষুনি চলে আসুন। শহরে গুলি চলছিল। হৈ চৈ চলছিল, এরি মধ্যে আমি ছোট গাড়ী নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম, শেখ সাহেবের বাড়ীতে ঢুকেই আমি বললাম, পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্য শেষবারের মত এখনো কোন তদবির করা যায় কি? তিনি জবাবে বললেন, বাঁচতে পারে। তবে এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার জন্য আমার মানসিক অবস্থা থাকতে হবে। দেখুন, আমার লোকেরা পথে ঘাটে বেঘোরে মারা যাচ্ছে। আমি দু'দিন থেকে বিছানায় পিঠ দিতে পারি নাই। আপনার সাথে কথা বলতেও আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমি বললাল, শেখ সাহেব, সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া খুব ভাল হবে কী? তিনি বললেন, আপনারা যদি আমার কথা মেনে নেন তাহলে আমি নিজে পাকিস্তানী সৈন্যদের গলায় হার পারিয়ে দেব।

আমার কথাবার্তা চলছিল এমন সময় তাজুদ্দিন সাহেব ঢুকলেন। শোনা যায়, তার পূর্ব পুরুষ হিন্দু ছিলো। তাছাড়া ভারতের প্রতি তার ভক্তি ছিল অপরিসীম। তিনি ঢুকেই কোন ভূমিকা না করেই বলতে শুরু করলেন, এখন আর এক ছাদের নিচে আমাদের অবস্থান সম্ভব নয়, যেখানে ভুট্টো রয়েছে। সে আমাদের এক নম্বর খুনী, দু'নম্বর খুনী ইয়াহিয়া খান। এখন একটাই মাত্র পথ খোলা রয়েছে, এসেম্বলি দুটো করতে হবে। আমি দু'জন বাঙ্গালী নেতার মতামত শুনে করাচী রওয়ানা হলাম।

Scanned by CamScanner

"পরদিন এগারোটায় প্রেসিডেন্ট হাউসে ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা হলো। লাউঞ্জে বসে জেনারেল হামিদ, মিঃ ভুট্টো এবং প্রেসিডেন্ট বসে মদ্যপান করছিলেন। সামনের টেবিলের উপর ইয়াহিয়া ও হামিদ দু'জনই পা তুলে বসেছিলেন। সহসা আমার মনে হলো, রোম জ্বলছে আর সম্রাট নীরো বাঁশী বাজাচ্ছেন।

"এরপর আমি ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপান করলাম, বললাম, পরিস্থিতি এখন ছয় দফাকেও ছাড়িয়ে গেছে। যেখানে ভুট্টো আছে সেই এসেম্বলিতে তারা বসতেও নারাজ। দুই আইন, দুই হাউস—এবং কনফেডারেশনের কথা পর্যন্ত উঠেছে।

"ইয়াহিয়া খান আমাকে বলেছিলেন, অচিরেই একটা রাজনৈতিক মীমাংসা তিনি করবেন। ৬ই মার্চ আমি পিন্ডি থেকে করাচী আসার পথে রেডিওতে ইয়াহিয়া খানের ভাষণ শুনলাম।"

৬ মার্চ ঢাকায় কেন্দ্রীর কারাগারে সেল ভেঙ্গে ৩২৫ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশের গুলিতে ৭ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। এদিন লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসেবে নিয়োগের খরব সরকারিভাবে জানানো হয়। সে-সঙ্গে কেবিনেট ডিভিশনের অন্য একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল যে, পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের গভর্ণর পদ থেকে ভাইস-এডমিরাল এস,এম, আহ্সানকে ১লা মার্চ পূর্বাহ্ন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

এদিন যশোরে একটি বিশাল সমাবেশ হয়, এতে পাকিস্তানী সৈন্যরা ভয়ে শহর ত্যাগ করে ক্যান্টনমেন্টে চলে যায়।

৬ মার্চ দুপুর একটা পাঁচ মিনিটের সময় প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান রেডিওতে জাতির উদ্দেশ্যে পূর্ব নির্ধারিত ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে অন্যান্যের মধ্যে বললেন ঃ আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, নির্বাচন সম্পন্ন করার পর ক্ষমতা হস্তান্তরের যে কয়টি পদক্ষেপ আমি নিয়েছি তা আমাদের কিছু নেতা এভাবে কিংবা অন্যভাবে বানচাল করে দিয়েছেন। ১৭ই জানুয়ারী নির্বাচন শেষ হবার পর আমি সংখ্যাগুরু দুই দলের নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি এবং নেতারাও ঢাকায় পরস্পর মিলিত হয়েছেন। আমি তাঁদের আলাপ-আলোচনা করে একটি সমাধানে আসার জন্য একাধিকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমি দুঃখের সঙ্গেই বলছি যে আওয়ামী লীগের সভাপতি আমার আমন্ত্রণকে সাড়া দেয়ার যোগ্য মনে করেননি এবং এভাবে আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝি দূর করার সুযোগ আমরা নষ্ট করেছি। যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যক সদস্য ৩রা মার্চের অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করার ফলে পরিবেশ শাসনতন্ত্র তৈরীর মত কাজের অনুকূল না থাকায় আমি সিদ্ধান্তে পৌছি যে, এই অবস্থায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে অর্থহীন, এমনকি জাতীয় পরিষদ এর ফলে বাতিলও হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমি অধিবেশন বাতিল করে অবস্থার অবনতি রোধ করতে চেয়েছি। আমি এর দ্বারা চেয়েছি একদিকে জাতীয় পরিষদ রক্ষা করতে, অন্যদিকে অর্থপূর্ণ আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আমার পদক্ষেপকে এই দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃত্ব এর বিরুদ্ধে এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন যার ফলে অনিষ্টকারী শক্তিরা রাস্তায় নামা এবং জীবন ও সম্পদ ধ্বংস করার সুযোগ পেল।

প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে ১০ই মার্চ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতাদের ঢাকায় আহূত সভা বানচাল করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে (অর্থাৎ, আওয়ামী লীগ) অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, আপনারা জানেন যে সে সভায় জনাব নুরুল আমিনও অংশ গ্রহণে আপত্তি জানান। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কোন প্রতিনিধিত্ব ঐ আহূত সভায় থাকত না।

Scanned by CamScanner

প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্পর্কে যাদের সন্দেহ রয়েছে, সে সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আমি বলতে চাই যে, আইনগত কাঠামো আদেশের বিভিন্ন ধারার চাইতে কোন উত্তম নিশ্চয়তার প্রয়োজন নেই। এই সঙ্গে হুমকিও দিলেন যে, পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টকারীদের কঠোর হস্তে নির্মূল করা হবে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণের পরপরই জুলফিকার আলী ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বললেন, ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তাঁর দল যোগ দেবে। ৬-দফার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার জন্য তাঁর দল এখনও প্রস্তুত রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার পূর্বে তাঁর দল শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে ব্যাপক মতৈক্যের চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে জনমত গঠন করে ৬-দফার কাছাকাছি আসতে আমরা চেষ্টা করবো এবং সমস্ত প্রদেশের জন্য গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে পরিষদ যাতে সাফল্যমন্ডিত হয় আমাদেরকে তার প্রতিও নজর রাখতে হবে।

৬ মার্চ খুলনায় গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটল। ১০৪ জন হতাহত হওয়ার খবর সংবাদপত্রে প্রেরিত হল। ঢাকাতেও পুলিশের গুলিতে ৩৭ জন হতাহত হল। পরিস্থিতি তখন সর্বত্র চরম উত্তেজনাপূর্ণ। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৬ই মার্চ টেলিফোনে শেখ মুজিবের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন এবং তাঁকে রাজি করানোর চেষ্টা করে বলেন, এমন পদক্ষেপ যেন তিনি (শেখ মুজিব) না নেন—যেখান থেকে ফিরে আসার উপায় আর না থাকে। এরপর প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে টেলিপ্রিন্টারে একটা বার্তা প্রেরণ করেন। ব্রিগেডিয়ার জিলানী বার্তাটি শেখ মুজিবকে পৌঁছে দেন। সিদ্দিক সালিক-এর পূর্বোক্ত বইয়ে বলা হয়েছে যে, সে বার্তাটিতে যা বলা হয়েছে তা হ'ল, "অনুগ্রহ করে কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি শিগগিরই ঢাকায় আসছি এবং আপনার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আপনার আকাঙ্খা এবং জনগণের প্রতি দেয়া আপনার প্রতিশ্রুতির পুরোপুরি মর্যাদা দেবো। আমার কাছে একটি পরিকল্পনা আছে—যা আপনাকে আপনার ছয় দফা থেকেও বেশী খুশী করবে। আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না।"

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণের পরপরই ভুট্টোর ২৫শে মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের ঘোষণা এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এমন পরিকল্পনা যা শেখ মুজিবকে ছয় দফা থেকেও বেশী খুশী করবে—এ বিষয়গুলোকে আওয়ামী লীগের ভেবে দেখা উচিত ছিল। বিষয়গুলো যদি এত সহৃদয়তাপূর্ণ হবে, তা হলে অধিবেশনের তারিখ ২৫শে মার্চ নির্ধারণ করা হবে কেন? এটাতো এক সপ্তাহের মধ্যেই হতে পারতো! ষড়যন্ত্রকারীদের হিসেব অনুযায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে ২৫শে মার্চ পর্যন্তই সময় প্রয়োজন ছিল।

৭ মার্চ কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির ডাক বলে "আঘাত হানো সশস্ত্র বিপ্লব শুরু কর জনতার স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েম কর" শিরোনামে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। প্রচারপত্রে অন্যান্যের মধ্যে বলা হয় ঃ পূর্ব বাংলার মানুষ যতবার তাহাদের মুক্তির জন্য সংগ্রামের ময়দানে নামিয়াছে, ততবারই শাসক গোষ্ঠী তাহাদের বর্বর পশু শক্তির মাধ্যমে তাহা দাবাইয়া দিয়াছে। সেনাবাহিনী হইল শাসকগোষ্ঠীর সকল ক্ষমতার উৎস। তাই আজ তাহারা সকল মুখোশ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাদের দেওয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশনও মুলতবী করিয়া দিয়াছে। তাই

Scanned by CamScanner

আজ এক মুহূর্তও দেরি করার সময় নাই। পূর্ব বাংলার মাটি আজ রক্ত চায়। তাই পূর্ব বাংলার কৃষক গ্রামে গেরিলা যুদ্ধ শুরু কর। মুক্ত এলাকা গঠন কর। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে যাহারা বাধা প্রদান করিবে কিংবা যাহারা তাহাকে মাঝপথে থামাইয়া দিতে চাহিবে তাহাদের আমরা কিছুতেই ক্ষমা করিব না, বরদাশত করিব না। জনতার সশস্ত্র বিপ্লব জিন্দাবাদ। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম কর।।

লক্ষণীয় যে, আহবান জানানো হচ্ছে জনতার সশস্ত্র বিপ্লবের, স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের—যার অর্থই হ'ল বহুজাতিক পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা। আবার তা বাস্তবায়নের জন্যে যেখানে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সম্মুখ সমরসাজ, যেখানে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানী সৈন্যসহ পুলিশ আনসার এবং জনগণকে সংগঠিত করে আক্রান্ত হওয়ার আগেই আক্রমণ করা, সেখানে আহবান জানানো হচ্ছে কৃষকদের গ্রামে গেরিলা যুদ্ধ করার, মুক্ত এলাকা গঠন করার।

এদিন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের জন্য ১৭ দফা সম্বলিত প্রচারপত্র বিলি করে। তাতে অন্যান্যের মধ্যে বলা হয় ঃ পাকিস্তানে ৫টি ভাষাভাষী জাতি—বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সীন্ধী, পাঠান ও বেলুচ বাস করে। পাকিস্তান দুইটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল লইয়া গঠিত। এই বাস্তব সত্য মানিয়া নিয়া শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকটি জাতির সমান অধিকার ও প্রত্যেকটি জাতির বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নীতিগতভাবে স্বীকৃত হইতে হইবে। শাসনতন্ত্রে এই নীতি স্বীকার করিয়া নিয়া বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র (রাজনৈতিক) ও মুদ্রা—এই তিনটি বিষয় ন্যস্ত হইবে। বাদবাকী সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্বক ক্ষমতাসহ) পাঁচটি জাতির নির্বাচিত সরকারের হাতে ন্যস্ত হইবে। পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে।

৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দান ও তার আশ-পাশে সেদিন জনসমুদ্র স্লোগানে মুখর, মুক্তিকামী মানুষগুলোর মুখে স্লোগান ওঠে 'বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা।' সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া আর কোন বক্তা ছিলেন না। সেদিন মানুষ শুনতে এসেছিল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন রাষ্ট্র কায়েমের ঘোষণা। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সামরিক প্রেসিডেন্টের কার্যকলাপে মারাত্মকভাবে আশাহত হয়েছিল। প্রথমত, ৫ই অক্টোবর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের কথা থাকলেও তা হ'ল না, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল ৭ই ডিসেম্বর। দ্বিতীয়ত, ১৭ই জানুয়ারী সকল নির্বাচন সম্পন্ন হলেও, জাতীয় পরিষদ অধিবেশন ডাকা হল সুদীর্ঘ সময়ক্ষেপন করে ৩রা মার্চ। তৃতীয়ত, ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদ অদিবেশন বসার মাত্র ২দিন আগে তা অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত করা হল। চতুর্থত, জনগণের প্রতিবাদ দমনের জন্যে সেনাবাহীনি গুলী চালিয়ে মানুষ হত্যা করল। মানুষ অনুধাবন করল যে, সামরিক সরকার তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না।

ইতিপূর্বে মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ নেতা শেখ মুজিবকে স্বাধীনতা ঘোষণার আহবান জানিয়ে ছিলেন। বেংগল রেজিমেন্ট ও ইপিআর সহ সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে বিভিন্নভাবে শেখ মুজিবকে ঐদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করার অনুরোধ জানানো হয়। তাঁরা তাঁদের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে ফেলেছিলেন বলে জানা যায়। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে কর্তব্যে নিয়োজিত ছিল

Scanned by CamScanner

যশোরে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, জয়দেবপুরে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সৈয়দপুরে ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, কুমিল্লায় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, চট্টগ্রামে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ঢাকায় ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে রিক্রুট্ সহ ছিলেন প্রায় ২০০০/২৫০০ বাঙালী সৈনিক। সে-সঙ্গে সেনাবাহিনীর অন্যান্য Corps (কোর) ও সংস্থায় পর্যাপ্ত সংখ্যক বাঙালী সৈন্য কর্মরত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, সে সময় শুধুমাত্র পিলখানায় প্রায় ২৫০০ বাঙালী ই,পি,আর সৈনিক ছিলেন। গোলন্দাজ বাহিনী বাংগালীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে জানা যায়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদেরও একটি নেট-ওয়ার্ক ছিল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বত্র। সে সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। আরো ছিল আনসার বাহিনী। তখন সর্বোচ্চ ২১ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানের বিমান-নৌঘাঁটি, বিভিন্নসেনা ক্যান্টনমেন্টে ও ইপিআর-এ কর্মরত ছিল। উপরন্তু দায়িত্ব পালনরত মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর লেঃ জেনারেল ইয়াকুব, মেঃ জেনারেল খাদেম রাজা, মেঃ জেনারেল রাও ফরমান আলী সহ পশ্চিম পাকিস্তানী অনেক সামরিক কর্মকর্তাই প্রেসিডেন্টের কর্মপদ্ধতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে সরকারীভাবে ঘোষণা দিলেও তখনও তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেন নি, তিনি সে সময় ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে গন্তব্যে যাওয়ার রাস্তায় ছিলেন। জানা যায় যে, বাঙ্গালী সেনাকর্মকর্তারা বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে এও জানান যে, তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করার সংগে সংগে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করবে। ঐ দিন বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট ও ইপিআর ক্যাম্পের বাংগালী সৈনিকগণ শেখ মুজিবের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। ছাত্র লীগ ও স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদেরও সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণারই দাবী ছিল শেখ মুজিবের কাছে।

শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, এর উত্তরে এক শ্রেণীর 'রাজনীতিবিদ' ও বুদ্ধি-ব্যবসায়ীরা বলে থাকেন যে, স্বাধীনতা ঘোষণা করলে শত্রুপক্ষ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বিশেষতঃ ঢাকা ধ্বংস করে দিত, ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দান থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সেখানে বোমা বর্ষণ করে সকল মানুষ শেষ করে ফেলতো—এ সবই হচ্ছে তাদের খোঁড়া যুক্তি, ঐ মুহূর্তে শত্রুপক্ষের শক্তি এবং তাদের বিরোধী শক্তি সম্পর্কে তাদের ধারণার অভাব। ঐ পর্যায়ে পদাতিক বাহিনী, ই,পি,আর বাহিনীর শক্তির ভর ছিল বাঙালীদের পক্ষে, সে-সঙ্গে ছিল ৩০ হাজার পুলিশ বাহিনী ও আনসার বাহিনী সহ অস্ত্রশস্ত্রও। তাছাড়া, ছিলেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর ছুটিভোগরত ব্যাপক সৈনিক ও অফিসার। আরও ছিলেন প্রতিরক্ষা ও পুলিশ বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণ। উপরন্তু ৭ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি সক্ষম লড়াকু জনতা।

এখানে সঙ্গত কারণেই বিমান বাহিনী প্রসঙ্গে এয়ার কমোডোর এম,কে বাশার (যিনি তখন কমোডার-এর নিম্নপদের অফিসার হিসেবে ঢাকায় কর্মরত ছিলেন)-এর বক্তব্য থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি, তিনি বলেছেন, "২৫শে মার্চ রাতে আমি বনানীতে আমার বাসায় ছিলাম। রাত বার টার পরে ভীষণ গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভোর রাত থেকে জনসাধারণ বনানীর ঐ পথ দিয়ে গ্রামের দিকে পালাচ্ছে।

২৭শে মার্চ আমি অফিসে আসি। সেই সময়কার বেস্ কমান্ডার ছিলেন এয়ার কমোডোর জাফর মাসুদ, যিনি মিঠ্ঠি মাসুদ হিসেবে বিমান বাহিনীতে পরিচিত ছিলেন। আমরা বাঙালী অফিসাররা তাঁর সাথে দেখা করলাম এবং দেশের এই পরিস্থিতিতে আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তাঁর

Scanned by CamScanner

সাথে আলাপ করলাম। তিনি বললেন, "নো ওয়ান উইল টাচ মাই মেন অর অফিসারস বিফোর দে কিল মি"। আমরা তাঁকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন সবাইকে ডেকে সান্ত্বনা দেন। এর মধ্যে ২৭শে মার্চ সেনাবাহিনী বিমান বাহিনীর কাছে বিমান সাহায্য চেয়ে পাঠায়। তিনি সে সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন।

৩০শে মার্চ তিনি বেসের সবাইকে ডেকে ভাষণ দেন। তিনি বললেন, "তোমরা সবাই জান যে সেনাবাহিনী তৎপরতা চালাচ্ছে। আমি বিমান সাহায্য দিতে অস্বীকার করেছি। কিন্তু আমি কতদিন এটা ঠেকিয়ে রাখতে পারব বলতে পারছি না। সমস্ত বাঙালী পাইলটকে এসব মিশনে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি এবং যে সমস্ত বাঙালী টেকনিশিয়ান এ সমস্ত বিমানে কাজ করতে চায় না তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে যেতে পারে।"

... এয়ার কমোডোরের নির্দেশ ছিল যদি কোথাও লোক জমায়েত দেখা যায় প্রথমে যেন ওয়ার্নিং শট করা হয় যাতে করে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অপরদিকে সেনাবাহিনীর নির্দেশ ছিল ম্যাসাকার করার জন্য। এজন্য এয়ার কমোডোর জাফর মাসুদকে বদলী করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং পরে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।"

তৎকালীন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খন্দকার (আবদুল করিম খোন্দকার, ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ বাংলাদেশ ফোর্সেস) বলেছেন, "২৮শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটা বোয়িং ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেটাতে বেসামরিক পোশাকে সেনাবাহিনীর লোকজন ছিল। ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে প্রত্যেকদিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনীর লোকজন আসতে থাকে এবং প্রত্যহ এর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

ঢাকা বিমানবন্দরে যেদিন থেকে বাঙ্গালী কর্মচারীরা কাজে যোগ দিতে বিরত থাকে সেদিন থেকে পাক-সেনাবাহিনী বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রাখে এবং বিমানবন্দরে পজিশন নিয়ে থাকে।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দেয়ার কথা শুনে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা এক উদ্বেগজনক অবস্থায় ছিল—তিনি কি বলবেন, কি করবেন! মিটিংয়ের পরে কোন গন্ডগোল সৃষ্টি না হওয়ায় তারা একটু আশ্বস্ত হয়। সেদিন সমস্ত সেনাবাহিনীর লোকজনকে জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য সজাগ বা সতর্ক রাখা হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর তারা তাদের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে লাগল এবং বিমানবন্দর ও সেনানিবাসের চারদিকে এনট্রেঞ্চড্ পজিশন নিতে শুরু করে। এবং বাঙ্গালী ও পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস সৃষ্টি হতে শুরু হল।

বিমান বাহিনীতেও শেষের দিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কমান্ডোদের আনা হচ্ছিল। এয়ারফিল্ডের বিভিন্ন জায়গায় বাঙ্গালীদের সরিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়োগ করা হয়।"

উল্লিখিত 'রাজনীতিবিদ' ও বুদ্ধি-ব্যবসায়ীদের নিকট একটি প্রশ্ন, দখলদার বাহিনী ২৫শে ও ২৬শে মার্চ এবং তৎপরবর্তীকালে যে হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংস ও নৃশংসতা চালিয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমান ধরা না দিলে তার চাইতে আর কতটুকু বেশী চালাত সেটাই প্রশ্ন?

৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতার শুরুতে বললেন, "ভাইয়েরা আমার! আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে

Scanned by CamScanner

চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়।" কিন্তু এর পরের বক্তব্য সেদিন জনগণকে নিরাশ করেছিল। শেখ মুজিব সেদিন বক্তব্যে "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে", "মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি তখন আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশায়াল্লাহ" বললেন। তিনি "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" বললেন, সে-সঙ্গে "জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান" বলে বক্তব্য শেষ করলেন। শেখ মুজিব "আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়" বললেন—কিন্তু বাংলার মানুষ যে সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা চায় তা বললেন না। তিনি বললেন, "আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙ্গালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শেখ মুজিব বললেন, "২৫ তারিখ এসেম্বলি ডেকেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ..... বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে, এসেম্বলি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল ল' withdraw (প্রত্যাহার) করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে আমরা বসতে পারি না।" শেখ মুজিবের বক্তব্য থেকে পরিস্কার হয়ে গেল যে, মার্শাল ল' তুলে নিলে, জনপ্রতিনিধিদের হাতে অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিলে এবং হত্যাকান্ডের (বিচার বিভাগীয়) তদন্ত করলে তাঁরা পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে যেয়ে বসতে রাজী আছেন।

এ প্রসঙ্গে এখানে কর্নেল শাফায়াত জামিল, (অব.)-এর "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর" বই থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি, তিনি লিখেছেন, "মার্চের ৭ তারিখে ক্যান্টনমেন্টে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে আমার বাবা ও শ্বশুর কুমিল্লায় এসে আমার স্ত্রী ও দু'ছেলেকে ঢাকা নিয়ে গেলেন। সেদিনই রেসকোর্সে ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন বঙ্গবন্ধু। ৮ মার্চ রেডিওতে সেই ভাষণ শুনলাম আমরা। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে একদিক থেকে অনেকটা নিস্তেজই হয়ে পড়লাম। এতোদিন সলাপরামর্শ করে বিদ্রোহ করার জন্য মানসিক দিক থেকে একরকম প্রস্তুত ছিলাম আমরা। বঙ্গবন্ধু ওই ভাষণ না দিলে হয়তো সেদিনই কিছু একটা করে বসতাম। কিন্তু তিনি সুনির্দিষ্টভাবে সে রকম কোনো নির্দেশ দিলেন না। মনে মনে তাঁর কাছ থেকে একটা আদেশ চাইছিলাম আমরা। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা বললেও তা একটি বিলম্বিত সংগ্রামের আহবান বলে মনে হলো আমাদের কাছে। আমি ভাবছিলাম, প্রথমে আক্রমণ করতে পারলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা এড়াতে পারতাম। এখন এরাই হয়তো সে সুযোগটা নেবে।"

এদিন অর্থাৎ, ৭ই মার্চ থেকে সাধারণ যাত্রিদের পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানে যাতায়াত পিআইএ (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স) বন্ধ করে দেয়। ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে লাগাতার ভাবে চলছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনা আমদানী।

এদিন জেনারেল সাহেবজাদা এয়াকুবের কাছ থেকে লেঃ জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ও গভর্ণরের দায়িত্ব বুঝে নিলেন।

Scanned by CamScanner

৭ই মার্চ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে অনতিবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী অহিংস ও অসহযোগের ১০-দফা ভিত্তিক একটি কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তাতে বলা হয় ঃ

(১) ট্যাক্স না দেয়ার আন্দোলন চলবে।

(২) সেক্রেটারিয়েট, সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশের সর্বত্রব্যাপী অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করবে। এ ব্যাপারে কি কি শিথিল করা হবে, তা সময়ে সময়ে জানান হবে।

(৩) রেলওয়ে ও বন্দরসমূহ কাজ চালিয়ে যাবে। তবে জনগণের উপর অত্যাচারের উদ্দেশ্যে রেলওয়ে বা বন্দরসমূহকে সৈন্য সমাবেশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাইলে রেল ও বন্দর কর্মীরা তাতে সহযোগিতা করবে না।

(৪) বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রকে আমাদের বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করতে দিতে হবে এবং জনতার আন্দোলনের সংবাদ চেপে যেতে পারবে না, অন্যথায় এ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাঙ্গালীরা সহযোগিতা করবে না।

(৫) কেবলমাত্র স্থানীয় এবং আন্তঃজেলা ট্রাংক-টেলিফোন যোগাযোগ চলবে।

(৬) সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

(৭) ব্যাংকগুলো স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোনো উপায়ে দেশের পশ্চিম অঞ্চলে টাকা পাঠাতে পারবে না।

(৮) প্রতিদিন সমস্ত ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে।

(৯) অন্যান্য ক্ষেত্রে হরতাল প্রত্যাহার করা হ'ল। তবে, অবস্থার প্রেক্ষিতে যে কোনো মুহূর্তে পূর্ণ অথবা আংশিক হরতাল ঘোষণা করা যেতে পারে।

(১০) স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রত্যেক ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা এবং জেলায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে।

এই কর্মসূচী ঘোষণা করে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, রেলওয়ে, রিকশা ও সড়ক পরিবহণ ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে কাজ চলবে। বেতন সংক্রান্ত টাকা, চেক ইত্যাদির জন্যে ব্যাংক সমূহ দু'ঘন্টা খোলা থাকবে। তবে, এক পয়সাও পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো যাবে না। কল-কারখানার মালিকরা অবশ্যই শ্রমিকদের নিয়মিত বেতন দেবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে আমাদের নিউজ না দিতে পারলে বাঙালীরা সেখানে কাজ করবে না।

ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষ ৭ই মার্চ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর একটা বিবরণ দিলেন, যার অনেকটাই বিভ্রান্তিকর। তাতে ১লা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত ১৭২ জন নিহত ও ৩৫৮ জন আহত হবার খবর দিয়ে বলা হয়, এর ভেতর নিজেদের মধ্যে দাঙ্গাকালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী, ফিরোজবাগ কলোনী ও ওয়ারলেস কলোনীতে মারা গেছে ৭৮ জন এবং আহত হয়েছে ২০৫ জন। সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয় ৫ জন এবং আহত হয় ১ জন। অন্যদিকে ইপিআর-এর বুলেটবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে দু'জন। খুলনায় ৩রা ও ৪ঠা মার্চের স্থানীয় ও অস্থানীয় দাঙ্গা দমনকালে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে ৪১ জন। স্থানীয় গোলযোগ প্রশমনে পুলিশের বুলেটবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে ৩ জন এবং জখম হয়েছে ১১ জন। একটি ট্রেন লাইনচ্যুত করাকালে ৪ঠা মার্চ খুলনাতে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে চারজন এবং আহত হয়েছে ১জন। ৬ই মার্চ ৩৪১ জন

Scanned by CamScanner

আসামী ও বিচারাধীন অভিযুক্ত ব্যক্তি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙ্গে পালাবার চেষ্টা কালে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় ৭ জন এবং আহত হয় ৩০ জন। একদল হিংসাত্মক জনতা ৩রা ও ৪ঠা মার্চ যশোর, খুলনা ও রাজশাহীর টেলিফোন কেন্দ্রে আক্রমণের সময় পাহারারত সেনাবাহিনীর জওয়ানদের গুলিতে ৮ জন নিহত এবং ১৯ জন আহত হয়েছে। ৫ই মার্চ সেনাবাহিনীর জওয়ানরা যশোর থেকে খুলনা যাওয়ার পথে জনতা কর্তৃক তারা আক্রান্ত হয়ে গুলি ছুঁড়লে ৩ জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা তাদের দায়িত্ব পালনকালে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। মারা গেছে একজন অফিসার ও আহত হয়েছে একজন। ২রা-৩রা মার্চ রাতে নাবাবপুর-তাঁতীবাজার এলাকায় ইপিআর-এর গুলিতে মারা গেছে ৬ জন এবং আহত হয় ৫৩ জন। আত্মরক্ষার জন্যে একজন ইপিআর সদস্যের গুলিতে নিহত হয়েছে ৪ জন এবং আহত হয়েছে ৩ জন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, সারা প্রদেশে সেনাবাহিনীর গুলিতে মৃতের সংখ্যা হচ্ছে ২৩ জন এবং আহতের সংখ্যা ২৬ জন। ২রা-৩রা মার্চ যখন সদরঘাটে (ঢাকা) সেনাবাহিনীর উপর জনতা আক্রমণ করে, তখন গুলিতে নিহত ৬ জন এবং ৩রা মার্চ স্থানীয় টেলিভিশন কেন্দ্রে জনতা চড়াও হলে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ১ জন এই সংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে জানানো হয়।

৭ই মার্চের ভাষণের পর সারা পূর্ব পাকিস্তানে চলতে থাকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ও নির্দেশ। সারা প্রদেশের মুক্তি প্রত্যাশি মানুষের ঘৃণা আর প্রতিবাদের মুখে পাকিস্তানী সৈন্যরা সেনা ছাউনি ও ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। ৩রা মার্চ থেকেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরোধবিহীন অভ্যুত্থানি অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু নেতৃত্বের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে সে অভ্যুত্থানি অবস্থা জনগণ কাজে লাগাতে পারে নি। অন্য দিকে পাকিস্তানী সামরিক শাসকগোষ্ঠীকে সুবর্ণ সুযোগ দেয়া হল পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য আমদানির।

এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দিন আহমদ রচিত "স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী" বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি, "ইতিমধ্যে প্রতিদিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৩/৪ ফ্লাইটে সৈন্য এসে অবতরণ করছে ঢাকা বিমান বন্দরে। এ ব্যাপারে শেখ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি ব্যাপারটির উপর মোটেও গুরুত্ব আরোপ করেননি।" তিনি লিখেছেন, "ঐদিন (৭ই মার্চ) বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের বাংগালী সৈনিকগণ শেখ মুজিবের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সেদিনও শেখ মুজিব চাননি—পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক।

তিনি ছাত্র নেতাদের পীড়াপীড়িতে রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে বললেন, এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এ সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।

কিন্তু তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের বাংগালী সৈনিকগণ ঐদিন বাংলাদেশের নতুন পতাকা উড্ডীন করার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাশ হতে হলো তাদের।

শেখ মুজিব সেদিনও আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা চেয়েছিলেন। নইলে তিনি অবস্থার প্রেক্ষিতে রেডিও মারফত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারতেন। রেডিও স্টেশন সহ পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনযন্ত্র তখন শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণে।

গণপরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ফলে আওয়ামী লীগের অনেক সুবিধা ছিল। স্বাধীনতা ঘোষণা করার সংগে সংগে সন্দেহাতীতভাবে স্বীকৃতিও পেয়ে যেতো বহু রাষ্ট্রের। ভারত সরকারের সক্রিয় সাহায্য ছাড়াই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হতো।"

Scanned by CamScanner

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কতটাই অসহায় ছিল তা বুঝা যাবে কর্নেল শাফায়াত জামিল-এর পূর্বোক্ত বইয়ে উল্লিখিত এ অংশ থেকে, "১ মার্চ আমাকে এবং পাঞ্জাবি অফিসার মেজর সাদেক নওয়াজকে সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করার অজুহাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিজ নিজ Battle Location -এ গিয়ে অবস্থান নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা বলছিল, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ অনিবার্য। কাজেই এই প্রস্তুতি। এটা ছিল পাকিস্তানিদের সুপরিকল্পিত তৎপরতার অংশমাত্র। বেশিসংখ্যক বাঙালি সৈন্যদের এক জায়গায় একসঙ্গে রাখার ব্যাপারটাকে তারা নিরাপদ মনে করে নি। তাই বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলোকে বিভিন্ন ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করে যুদ্ধ এবং অন্যান্য অজুহাতে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছিল। চতুর্থ বেঙ্গলের দুটো কোম্পানিকে (আমার আর সাদেক নওয়াজের) ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং একটিকে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ভারতীয় নকশালদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার কথা বলে শমসেরনগর পাঠিয়ে দেয়া হয়।"

তিনি আরও লিখেছেন, ৭ই মার্চের দু'একদিন পর "লে. কর্নেল রেজার (সালাউদ্দিন মুহাম্মদ রেজা) সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হলো। তিনি জানালেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটার পর একটা আর্মি ইউনিট ঢাকায় আসছে। এসব দেখে খারাপ কিছু একটা ঘটার আশঙ্কা করে কিছু অফিসার কর্নেল (অবঃ) ওসমানীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু ওসমানী নাকি তাদের কথার তেমন একটা আমল দেন নি। যুদ্ধ করার কথা তখনো ভাবছিলেন না তিনি। এই পরিস্থিতিতে ঢাকায় বাঙালি অফিসাররা প্রচন্ড অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন।"

৭ই মার্চ থেকে আরও ব্যাপকভাবে শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের, সে-সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের—বিষয়টি সবাই জানতেন। শেখ মুজিবুর রহমান সহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দও। শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানী শুরু হওয়ার পর একবারই মাত্র এর প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যে বোয়িংয়ে করে এম,এন,এ-দের আসার কথা তাতে করে আনা হচ্ছে সৈন্য। আনা হচ্ছে বাঙ্গালীদের আশা-আকাঙ্খাকে দমনের জন্যে।"

সে সময় স্থানীয় সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ একটি সামরিক আইন বিধি (১১০ নম্বর) জারী করে, এই বিধি পত্র-পত্রিকায় এমন ধরনের খবর, মতামত কিংবা ছবি প্রকাশ নিষিদ্ধ করলো যা পাকিস্তানের সংহতি এবং সার্বভৌমত্বকে বিনষ্ট করে।

৮ই মার্চ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আহবান সম্বলিত 'ফরওয়ার্ড ষ্টুডেন্টস্ ব্লক' নামে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে "আপোসের চোরাবালিতে বাঙলার এ স্বাধীনতার উদীত সূর্য যেন মেঘাচ্ছন্ন না হয়" বলে একটি প্রচারপত্র বিলি করে।

যেখানে পুরা প্রদেশব্যাপী সর্বব্যাপী অভ্যুত্থানের অবস্থা বিরাজমান, সেখানে কে বা কারা এ দিন গেরিলা যুদ্ধ করার নিয়ম সংক্রান্ত একটি বেনামী লিফলেট বিলি করে।

এদিন রাতে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ পূর্বে ঘোষীত হরতাল কর্মসূচীর কিছু পরিবর্তন ও শিথিলতা ঘোষণা করেন। উক্ত ঘোষণায় অন্যান্যের মধ্যে মিল-ফ্যাক্টরী চালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যেমন পাট, আখ কেনার জন্যে টাকা তোলা, পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক সার ও ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিত করা, ইটখোলার জন্যে কয়লা সরবরাহ চালু রাখা, খাদ্যশস্য সরবরাহ চলাচল অব্যাহত থাকা, শুধুমাত্র বাংলাদেশের ভেতর পোস্ট ও টেলিগ্রাম সার্ভিস বলবৎ থাকা, পূর্ব পাকিস্তান

Scanned by CamScanner

সড়ক পরিবহণ সংস্থার বাংলাদেশের সর্বত্র কাজ চালিয়ে যাওয়া, অভ্যন্তরীণ ব্যাংক লেনদেনের জন্য বেলা ৯টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত খোলা রাখার কথা বলা হয়।

এদিন থেকে বিদেশী নাগরিকরা ঢাকা ছাড়তে শুরু করে, তাঁরা বুঝেছিলেন মারাত্মক কিছু হতে যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে। ঐ দিন তেজগাঁও বিমান বন্দরে রয়্যাল ডাচ এয়ারলাইন্স, লুফ্‌ৎহানসা, বিওএসি প্রভৃতি সংস্থার বিমান অবতরণ করে। তাতে করে অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা ছাড়া হল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি ও বৃটিশ নাগরিকরা ঢাকা ছেড়ে যায়। পশ্চিম জার্মানির একটি জেট বিমানও নেমেছিল তেজগাঁও বিমান বন্দরে তাদের নাগরিকগণকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

৯ মার্চ সকালে এম,ভি, সোয়াত নামের একটি জাহাজ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারি অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে এসে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর জেটিতে ভিড়ে। বন্দর শ্রমিকদের কাছে বিষয়টি জানাজানি হলে তাঁরা জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাসে অস্বীকৃতি জানায়।

এ সকল ঘটনা যে ভয়াবহ তা দেখেশুনেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব যথাযোগ্য ব্যবস্থা না নিয়ে ছয়-দফার দাবীর চোরাবালিতে জনগণকে আটকে রাখলেন।

৯ই মার্চ লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসেবে শপথ গ্রহণ করাতে ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি,এ সিদ্দিকী অস্বীকার করেন।

এদিন ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে একটি জনসভা করেন। সে জনসভায় জনাব আতাউর রহমান খানও বক্তৃতা করেন। মওলানা ভাসানী সেদিন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "সাত কোটি বাঙ্গালীর মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। পূর্ব বাংলাকে একটি পৃথক রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমেই দেশের দু'অঞ্চলের তিক্ততার অবসান হতে পারে। ... দুই পাকিস্তান হ'লে সৌহার্দ বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নতি হবে। ... বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাথে কেউ আপোস করতে পারবে না। ... আপোসের দিন শেষ হয়ে গেছে। ইয়াহিয়া ঢাকায় এলে মুজিব তাঁর সাথে বাঙ্গালীর দাবী নিয়ে আপোস করতে যেতে পারে না। শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু বা যে বন্ধুই হোক না কেন আপোস করতে গেলে পিঠের চামড়া খুলে ফেলবো। ...আমি ৩১টি সমিতির সভাপতি ছিলাম, তার একটি সমিতির সেক্রেটারী ছিল শেখ মুজিব। শেখ আমার ছেলের মত। আমি তাকে হাতে খড়ি দিয়ে রাজনীতি শিখিয়েছি। তাকে আপনারা অবিশ্বাস করবেন না। "(দৈনিক পাকিস্তান ও দৈনিক সংগ্রাম ঃ ১০ই মার্চ, ১৯৭১ (কালো পঁচিশের আগে ও পরে ঃ আবুল আসাদ))। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। পাকিস্তান আর অখন্ড রাখব না।" (নয়া দিগন্ত ঃ ৯ মার্চ, ২০০৫)। মাওলানা ভাসানী বলেন, "১৩ বছর আগে কাগমারি সম্মেলনে আমি আসসালামু-আলাইকুম বলেছিলাম। ... তাই বলেছিলাম যে, তোমরা (পাকিস্তানিরা) তোমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কর, আর আমরা আমাদের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করি। লাকুম দীনুকুম ওলিয়াদীন, শেখ মুজিবুর রহমান আজ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। ... পূর্ব বাংলা স্বাধীন হবেই।" (দৈনিক পাকিস্তান)। মওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে এই দাবীর মর্যাদা রক্ষা করে অবিলম্বে ৭ কোটি বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা দানের আহবান জানান। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন, আগামী ২৫শে মার্চের মধ্যে এই দাবী মেনে না নিলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে এক হয়ে বাঙ্গালীর স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করবেন। (দৈনিক পাকিস্তান ঃ ১০ই মার্চ, ১৯৭১)। ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী সেদিন ১৪ দফা সম্বলিত একটি কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

Scanned by CamScanner

যেখানে ব্যাপকভাবে সৈন্য আমদানি চলছে, সেখানে মওলানা ভাসানীর ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খানকে সময় প্রদানের বিষয়টি আমাদের বোধগম্য নয়।

ঐ সভায় জনাব আতাউর রহমান খান তাঁর বক্তৃতায় কালবিলম্ব না করে জাতীয় সরকার ঘোষণা করার জন্যে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে দাবী জানান। তিনি বলেন, "ভানুমতির খেলা শুরু হয়েছে। চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল ফেলা হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের জাল ভেদ করতে হবে। কাজেই আপনি পরিষদের (অর্থাৎ, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ) কথা ভুলে যান এবং জাতীয় সরকার ঘোষণা করুন।" আজকের এই মুহূর্ত আর বারবার ফিরে আসবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

৯ই মার্চ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী 'পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন' শিরোনামে একটি প্রচারপত্র বিলি করেন। এ প্রচারপত্রে অন্যান্যের মধ্যে তিনি বলেন, "আজ আমি সাত কোটি পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই জরুরী আহবান জানাইতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনারা দল, মত, ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ একত্রে এবং একাযোগে একটি সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করুন, যার মূল লক্ষ্য হবে, ২০ বৎসরের অমানুষিক এবং শোষণকারী শাসক গোষ্ঠীর করাল কবল থেকে পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম করা।

... আসুন, আজ আমরা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করি যে, পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের হাতে গণতান্ত্রিক পূর্ণ ক্ষমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরণ সংগ্রাম করে যাব।"

এদিন 'পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)' ঢাকা জেলা শাখা একটি প্রচারপত্র বিলি করে, যার প্রথম দিকের লাইনগুলো হ'ল ঃ 'বন্দুকের নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে'—মাও সে-তুঙ। পূর্ব বাংলার মুক্তির জন্য শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন নয়, হরতাল-ধর্মঘট নয়; অস্ত্র হাতে লড়াই করুন; শত শত মানুষের হত্যার বদলা নিন; গ্রামের কৃষকদের গেরিলা লড়াই-এ সংগঠিত করুন!

উক্ত প্রচারপত্রে বলা হ'ল ঃ

"পূর্ব বাংলার মেহনতি গরীব ভাইসব,

গত কয়েক দিনে শাসকগোষ্ঠীর পুলিশ মিলিটারী পূর্ব বাংলার শত শত মেহনতী মানুষকে হত্যা করেছে। আরো হত্যা করার নতুন হুমকি দিয়েছে। অথচ, হত্যাকারীদের একটি চুলও খসেনি। অতীতেও তারা জনতার উপর হত্যালীলা চালিয়েছে। মরেছে, মার খেয়েছে শুধু গরীব জনসাধারণই। কিন্তু গরীব লোকের উপর শোষণ কমেনি, অত্যাচার কমেনি বরং বেড়েই চলেছে। শাসক গোষ্ঠীর হত্যালীলা ও শোষণের বিরুদ্ধে আজ যখন সারা পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, পূর্ব বাংলার পূর্ণ মুক্তির জন্য মেহনতি মানুষ পাগল হয়ে উঠেছে এখন তথাকথিত বাংলার দরদী নেতারা অস্ত্র হাতে লড়াই শুরু করার আহবান না দিয়ে বিপ্লবী জনগণকে এত হত্যালীলার পরও শান্তি পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশ দিচ্ছে।

... পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এবং পূর্ব বাংলার তথাকথিত দরদী বিশ্বাসঘাতক নেতাদের পরামর্শ দাতা হল কুখ্যাত নরপশু মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড। এই নরঘাতক শূয়োরের বাচ্চাটি চক্রান্ত করে ইন্দোনেশিয়ার লক্ষ লক্ষ নিরীহ গরীব মানুষকে হত্যা করেছে। ... অস্ত্র হাতে নিয়ে ছোট দলে (৪/৫জন) বিভক্ত হয়ে অতর্কিতে দেশী-বিদেশী সকল শোষকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন। শহরের বস্তিতে বস্তিতে, পাড়ায় পাড়ায়, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গেরিলা লড়াই (গোপন যুদ্ধ) চালিয়ে অত্যাচারী

Scanned by CamScanner

জোতদার, মহাজন ও দালালদের খতম করুন। গণবাহিনী গড়ে তুলুন। গ্রামে গ্রামে গরীবের রাজত্ব কায়েম করুন।

... শোষিত নির্যাতিত ভাইসব,—পূর্ব বাঙলাকে মুক্ত করতেই হবে। পূর্ব বাঙলার শ্রমিক কৃষক রাজত্ব কায়েম করতেই হবে, এর জন্য গ্রামকে লড়াইয়ের ঘাঁটি করুন। জনগণের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলুন। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী)-র ডাকে ও নেতৃত্বে ১৯৭০ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে গ্রামে কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ...জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাঙলা কায়েম করুন।"

লক্ষণীয় যে, "পূর্ব বাংলার পূর্ণ মুক্তির" কথা বলা হচ্ছে, "পূর্ব বাঙলাকে মুক্ত করতেই হবে" বলা হচ্ছে, "জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাঙলা কায়েমের" কথা বলা হচ্ছে—অথচ এ পর্যায়েও আকড়ে ধরা থাকল "গেরিলা লড়াই চালিয়ে অত্যাচারী জোতদার, মহাজন ও দালালদের খতম"-এর কর্মসূচী।

৯ মার্চ 'পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি' "শত্রু বাহিনীকে মোকাবেলায় প্রস্তুত হউন; গণস্বার্থে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন" শিরোনামে একটি প্রচারপত্র বিলি করে। তাতে বলা হ'ল ঃ

"ভাইসব,

বাংলাদেশের জনগণ আজ গণতন্ত্র ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে একটা পৃথক ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ও এই জন্য এক গৌরবময় সংগ্রাম চালাইতেছেন। ...পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্টরা দীর্ঘকাল হইতেই বাঙালীসহ পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতির বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবী করিয়া আসিতেছে। পূর্ব বাংলার জনগণ আজ অনেক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া পূর্ব বাংলায় একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা উহাকে ন্যায্য মনে করি, তাই পূর্ব বাংলার জনগণের বর্তমান সংগ্রামে আমরাও সর্বশক্তি লইয়া শরিক হইয়াছি।

... সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় ইতিমধ্যেই গণহত্যা ঘটাইয়াছে ও রক্তের বন্যায় পূর্ব বাংলার জনতার সংগ্রামকে স্তব্ধ করিবার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। তাই বাংলাদেশের দুশমন হইল সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার ও উহাদের সেনাবাহিনী। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান, বেলুচ, সিন্ধি, পাঞ্জাবী জাতিসমূহের মেহনতী জনতা পূর্ব বাংলার জনগণের শত্রু নয়। বরং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের গণতন্ত্র ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় অধিকারকেও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীই নস্যাৎ করিয়া রাখিয়াছে।

... ঐক্যবদ্ধ গণশক্তি ও জনতার সংগ্রামের জোরে গণদুশমনদের ও উহাদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া এখানে জনগণের দাবী মতে 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অগ্রসর করিয়া লইতে হইবে।

... কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশে এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম আহবান জানাইতেছে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ উৎখাত করিয়া ও পুঁজিবাদী বিকাশের পথ পরিহার করিয়া জনগণের স্বার্থে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা ও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবার বিপ্লবী পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।

Scanned by CamScanner

কতকগুলো তথাকথিত "কমিউনিস্ট পার্টি" জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য "ধর্মঘট, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতির প্রয়োজন নাই", "গ্রামে গ্রামে কৃষি বিপ্লব শুরু কর", "জোতদারদের গলা কাট" প্রভৃতি আওয়াজ তুলিতেছে।

... নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রভৃতি যে দাবীগুলি আওয়ামী লীগ প্রধান উত্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি আদায় করিতে পারিলে 'স্বাধীন বাংলা' কায়েমের সংগ্রামের অগ্রগতির সুবিধা হইবে—ইহা উপলব্ধি করিয়া ঐ দাবীগুলির পিছনে কোটি কোটি জনগণকে সমবেত করা এবং ঐ দাবীগুলো পূরণে ইয়াহিয়া সরকারকে বাধ্য করা—ইহা হইল এই মুহূর্তে জরুরী কর্তব্য।

... কিন্তু জনগণকে আজ সংগ্রাম করিতে হইতেছে প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। তাই শান্তিপূর্ণ পন্থায় শেষ পর্যন্ত জনগণের সংগ্রাম বিজয়ী হইবে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর আজ্ঞাবাহী সেনাবাহিনী জনগণের উপর সশস্ত্র হামলা শুরু করিতে পারে।

... এই জন্য পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে, কল-কারখানায় সর্বত্র দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শক্তি নিয়া গড়িয়া তুলুন স্থানীয় সংগ্রাম কমিটি ও গণবাহিনী। সেনাবাহিনী আক্রমণ করিলে উহা প্রতিরোধের জন্য ব্যারিকেড গঠন করুন, যাহার যাহা আছে উহা দিয়াই শত্রুকে প্রতিহত করুন।

... সাহসের সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে সঠিকভাবে সংগ্রাম চালাইতে পারিলে আমাদের জনগণের বিজয় সুনিশ্চিত।"

উল্লেখ্য যে, "বাংলাদেশের জনগণ... একটা পৃথক ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করতে বদ্ধ পরিকর" বলা হচ্ছে, "গণদুশনদের ও উহাদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া" স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে, বুঝতেও পারছেন যে, "শান্তিপূর্ণ পন্থায় শেষ পর্যন্ত জনগণের সংগ্রাম বিজয়ী হইবে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই", বুঝলেন যে, "প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর আজ্ঞাবাহী সেনাবাহিনী জনগণের উপর সশস্ত্র হামলা শুরু করিতে পারে", — অথচ জনগণকে নির্ভর করতে বলা হচ্ছে "নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রভৃতি যে দাবীগুলি আওয়ামী লীগ প্রধান উত্থাপন করিয়াছেন" তার উপর ; এবং "সেনাবাহিনী আক্রমণ করিলে উহা প্রতিরোধের জন্য ব্যারিকেড গঠন"-এর উপর। আহবান জানান হ'ল "শত্রুর বিরুদ্ধে সঠিকভাবে সংগ্রাম চালাইতে" পারার উপর। কোনরূপ যুদ্ধের প্রস্তুতির বা আক্রান্ত হওয়ার আগেই দুর্বল শত্রুকেই আক্রমণের কথা তাদের চিন্তায় এলো না।

'পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি' এখন বলছে যে, "পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টরা দীর্ঘকাল হইতেই বাঙালীসহ পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতির বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবী করিয়া আসিতেছে", অথচ তাদের দোসর তথা তাদের ভাষায় তৎকালীন আওয়ামী লীগে 'কৌশলগত অবস্থিত' থাকার সময়কালে ১৯৫৬ খ্রীঃ সাংবিধানিকভাবে যখন পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলকে এক ইউনিট তথা চারটি প্রদেশ ভেঙ্গে দিয়ে একটি প্রদেশে রূপান্তর করা হল এবং পাঠান, বেলুচ, সিন্ধী ও পাঞ্জাবীদের উপর রাষ্ট্রভাষা হিসেবে (যা এ 'দলেরও' দাবী ছিল) বাংলা ও উর্দু চাপিয়ে দেয়া হ'ল তখন টু শব্দটি করে নি।

এদিন জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট ঢাকায় জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধিকে জাতিসংঘ কর্মচারী পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন।

Scanned by CamScanner

জাতিসংঘের মহাসচিব টের পাচ্ছেন, কী হতে যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে, অথচ আমাদের নেতারা সেদিন তা বুঝতে সক্ষম হলেও যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার দিকে এগুলেন না।

৯ই মার্চ মঙ্গলবার গভীর রাতে পি,পি,আই এবং এনা পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর সংশ্লিষ্ট সামরিক বিধি পরিবর্তন করে লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে 'খ' অঞ্চলের মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁর এ নিয়োগ গত ৭ই মার্চ থেকে কার্যকরী হবে।

১০ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, "মুক্তি অর্জনে বাংলার মানুষ অটল থাকবে।" তিনি বলেন, "জনগণের ইচ্ছাই বাংলাদেশের প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। ...যারা মনে করছে শক্তির বলে আমাদের উপর তাদের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেবে, তাদের স্বরূপ বিশ্বের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে। ...হঠকারী গণবিরোধী শক্তি তাদের বেপরোয়া কর্মপদ্ধতিতেই জিদ ধরে রয়েছেন। সমরসজ্জা অব্যাহত রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রতিদিনই অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য আনা হচ্ছে।" তিনি আরো বলেন, "কোন অশান্ত এলাকা থেকে নিজ কর্মচারীদের সরিয়ে নিলেই জাতিসংঘের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। আজ আমরা গণহত্যার মুখোমুখি। এই হুমকি এ দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক অধিকার তথা জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদ লঙ্ঘনের হুমকি।"

এদিন নারায়ণগঞ্জে জেল ভেঙ্গে ৪০ জন কয়েদী পলায়ন করে। পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে ১ জন নিহত ও ২৯ জন আহত হয়।

১১ই মার্চ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী টাঙ্গাইল-এর এক জনসভায় আবারো বলেন, স্বাধীনতাই একমাত্র মুক্তির পথ। স্বাধীনতা ছাড়া আপসের আর কোনো পথ খোলা নেই।

আজ পূর্ব পাকিস্তান সিভিল-সার্ভিসেস দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। তারা আওয়ামী লীগের তহবিলে একদিনের বেতন দান করেন।

এদিন ঢাকায় নিযুক্ত জাতিসংঘের সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি উলফ শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি এমন নয় যে, কর্মচারীদের অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। এটা হয়ত শেখ মুজিবের প্রতিবাদের মুখে শান্তনামাত্র।

১১ই মার্চ ছাত্র ইউনিয়ন "শোষণমুক্ত স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রাম আরও দুর্বার করিয়া তুলুন" বলে একটি প্রচারপত্র বিলি করে। প্রচারপত্রে অন্যান্যের মধ্যে বলা হ'লঃ

"পূর্ব বাংলার জনগণ আশা করিয়াছিল যে নির্বাচনের পরে যথানিয়মে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিবে, শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়া যাইবে।

... শত শত শহীদের রক্তে পূর্ব বাংলার শ্যামল মাটি রক্তলাল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা জনগণের এই মহান বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে সার্বিক নীতিতে অগ্রসর করিয়া লইয়া এমন একটি 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' রাষ্ট্র গঠনের আহবান জানাইতেছি যে রাষ্ট্রে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি জনগণের প্রকৃত আশা-আকাংক্ষা পূরণের পথ উন্মুক্ত হইবে।

...আমরা ছাত্র-জনতার প্রতি আবেদন জানাইতেছি যে, গণস্বার্থে সঠিক নীতিতে 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' কায়েমের সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন।

Scanned by CamScanner

বর্তমান গণসংগ্রামের পটভূমিতে ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক আহূত জাতীয় পরিষদে অংশ গ্রহণের প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বশর্ত হিসেবে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমানে ৪টি দাবী উত্থাপন করিতেছেন। এই দাবী হইল সামরিক শাসন প্রত্যাহার কর, শাসন ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে অর্পণ কর, সেনাবাহিনী ব্যারাকে লও, গণহত্যার তদন্ত চাই। বর্তমান গণঅভ্যুত্থানকে অগ্রসর করিয়া লওয়ার স্বার্থেই ২৫শে মার্চের মধ্যে এই সকল দাবী পূরণের জন্য গণসংগ্রাম অব্যাহত রাখুন, সরকারের প্রতি অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখুন, ইয়াহিয়া সরকারকে দাবী মানিতে বাধ্য করুন।"

ছাত্র ইউনিয়ন শেখ মুজিবের চার-দফা দাবীর কথা যথার্থভাবে উল্লেখ করলেও, তাদের মূল দল 'পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি'র করণীয়র সঙ্গেই সুর মিলালেন।

১১ মার্চ, ১৯৭১ জানা যায় যে, পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি প্রধান জেড,এ,ভুট্টো করাচী থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট টেলিগ্রাম পাঠান। টেলিগ্রামে ভুট্টো বলেন, "দেশের ঘটনাবলী সম্প্রতি যে দিকে মোড় নিয়েছে সেজন্য আমি দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করছি। ... আমরা পাকিস্তানের জন্যে একটি নয়া সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সে সমাজ এমন হবে যেখানে মানুষের উপর মানুষের শোষণ এবং অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণ থাকবে না। শুধুমাত্র শাসনতন্ত্রের মাধ্যমেই আসুন সকল পাকিস্তানীই এজন্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাই। ... আমরা এমন একটি স্তরে এসে দাঁড়িয়েছি, যখন পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য পাকিস্তানের দুই অংশকে অনতিবিলম্বে একটি সাধারণ সমঝোতায় অবশ্যই পৌছতে হবে। দেশকে রক্ষা করতেই হবে এবং যে কোন মূল্যেই রক্ষা করতে হবে। ...আমি শ্রীঘ্রই ঢাকা গিয়ে আপনার সাথে দেখা করতে প্রস্তুত। ... আমরা এসব সমস্যা নিরসনে ব্যর্থ হয়েছি জনগণ যেন এমন কথা বলতে না পারে এবং ভাবিষ্যতেও ইতিহাস যেনো এমন কথা লিখতে না পারে।" যদিও সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর খবরে বলা হলো যে ১১ই মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্তও শেখ মুজিব ভুট্টোর কোন টেলিগ্রাম পাননি।

এদিকে ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম ভুট্টো লন্ডনের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র টাইমস (Times) -এর চতুর্থ পৃষ্ঠায় পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির পক্ষ থেকে একটি ডাবল কলাম বিজ্ঞাপন ছাপে। তাতে বলা হয় ঃ

"আওয়ামী লীগের এমন অনেক যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন যারা পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির সাথে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের অধিকাংশের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি সম্মানজনক শাসনতান্ত্রিক সমঝোতার পক্ষপাতী। আওয়ামী লীগের উচিত নয় তাদের পথ রোধ করা এবং বৈপ্লবিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার সাধিত হতে দেয়া উচিত যা একমাত্র ঐক্যবদ্ধ জনগণই অর্জন করতে পারে।"

এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে শিক্ষক সমিতির সভা থেকে বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন করার জন্যে বিশ্ববাসীর প্রতি আহবান জানানো হয়।

এদিন আওয়ামী লীগ নেতা কামারুজ্জামান এক বিবৃতিতে চলমান আন্দোলনের বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশকে শোষণমুক্ত করাই সংগ্রামের লক্ষ্য।"

১২ই মার্চ মওলানা ভাসানী ময়মানসিংহে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা পুনরায় ঘোষণা করেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর আস্থা রাখার জন্যও সকলের প্রতি আহবান জানান।

Scanned by CamScanner

এদিন বাঙালী সি.এস.পি ও ই.পি.সি.এস কর্মকর্তাগণ অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তাদের দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করেন। তারা মিছিল ও সমাবেশ করে তাদের ঘোষণার কথা জানান। আওয়ামী লীগের সাহায্য তহবিলে তারা এক দিনের বেতন জমা দেন।

প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা অসহযোগের প্রতি সমর্থন জানিয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করে দেন।

এদিন চট্টগ্রাম বন্দরমুখী মালবোঝাই একটি মার্কিন জাহাজের গতি পরিবর্তন করে করাচী বন্দরে পাঠানো হয়।

এদিন বগুড়ার জেল থেকে ২৭ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। জেল ভেঙ্গে পালানোর সময় কারা রক্ষীদের গুলিতে ৮ জন হতাহত হয়।

১৩ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ 'খ' অঞ্চলের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এক আদেশ বলে সামরিক বিভাগে কর্মরত বেসামরিক কর্মচারীদের ১৫ই মার্চ যথারীতি কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দেন। নির্দেশে সতর্ক করে বলা হয় যে, ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজে যোগ না দিলে কেবল চাকুরী হইতেই বরখাস্ত করা হইবে না, উপরন্তু সামরিক আদালতের বিচারে সর্বোচ্চ দশ বছর সশ্রম করাদন্ড দেয়া হবে।

১৩ই মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের জাতীয় পরিষদের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলোর (কাইয়ুম মুসলীম লীগ বাদে) এক সভা আওয়ামী লীগের চার দফা দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

ন্যাপ নেতা আবদুল ওয়ালী খান এ দিন ঢাকায় আসেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে শেখ মুজিবের ঘোষিত সামরিক আইন প্রত্যাহার, নির্বাচিত জনপ্রতিনিদিধের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রভৃতি দাবীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

এদিন ভৈরবে এক জনসমাবেশে মওলানা ভাসানী বলেন, ভুট্টোর উচিত পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। আমরা আমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করব। বাঙালীরা আর শাসিত হবে না।

প্রেস শ্রমিকরা এদিন পূর্ব পাকিস্তানে চলমান আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

১৪ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে আন্দোলনের ৩৫টি আদেশ সম্বলিত নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করেন যা ১৫ই মার্চ থেকে কার্যকরী হবে বলে বলা হয়। অন্যান্যের মধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ, রেলওয়ে, ইপিআরটিসি, আভ্যন্তরীণ নদী বন্দর, বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র, বিদ্যুৎ সরবরাহ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ, ইস্টার্ণ রিফাইনারী, ইপিআইডিসি ও ইপসিকের সকল কারখানা, পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন ও পোস্টাল জীবন বীমা, সকল ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দোকান-পাট নিয়মিতভাবে চলবে বলা হল। তবে, সৈন্য চলাচলে কিংবা সমরাস্ত্র আনানোর ও বাংলাদেশের মানুষকে নির্যাতনের জন্যে সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা-নেয়ার কাজে কোনভাবেই সহযোগিতা বা সাহায্য করা যাবে না বলে বলা হ'ল।

নির্দেশাবলীতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে যতটুকু দরকার তার বাইরে সকল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারী ও বেসরকারী অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশের সকল কোর্ট হরতাল পালন করবে বলে বলা হল। তাতে আরও বলা হ'ল যে, সমগ্র বাংলাদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

Scanned by CamScanner

১৪ই মার্চ বিকালে করাচীতে এক জনসভায় পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরামর্শ দেন। তিনি অন্যান্যের মধ্যে আরো যা বলেন তার মধ্যে আছে ঃ তার দল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের এক পাকিস্তানে বিশ্বাসী; এখনো আওয়ামী লীগের সাথে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব; আওয়ামী লীগ প্রধানের কাছে তার বার্তাটি পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটি আবেদন। ভুট্টো বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধানের সাথে আলোচনা করার জন্য তিনি এখনো পূর্ব পাকিস্তান যেতে রাজী আছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু দল বলেই তিনি তার দলের সাথে কথা বলার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর তিনটি দফা তিনি গ্রহণ করেছেন। বাকী তিনটি দফার বেলাতেও আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় পৌছানো সম্ভব। ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টির জন্য কারো সাথে তার দলের চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ ভুট্টো অস্বীকার করেছেন।

কার্যতঃ ভুট্টো তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানকে দুই ভাগে ভাগ করে দুই প্রধানমন্ত্রী ও দুই পার্লামেন্টের কথাই বললেন। এককথায় ভুট্টো দুই শাসনতন্ত্রের দুই সরকার এবং দুই পাকিস্তান চায়।

এদিন সরকারী কর্মচারীরা সামরিক আইন অমান্য করে এর বিরুদ্ধে মিছিল বের করেন। তারা সামরিক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে হঠকারী হিসেবেও উল্লেখ করেন। এদিকে সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে জারী করা সামরিক নির্দেশের জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, "উস্কানিমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করুন।" তিনি বলেন, এ বড় দুঃখজনক যে, এমন পর্যায়েও কিছু অবিবেচক মানুষ সামরিক আইন বলে নির্দেশ জারী করে বেসামরিক কর্মচারীদের একাংশকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। কিন্তু আজ এদেশের মানুষ সামরিক আইনের কাছে মাথা নত না করার দৃঢ়তায় একাট্টা। সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাদের প্রতি সর্বশেষ নির্দেশ জারী করা হয়েছে, তাঁদেরকে হুমকির কাছে মাথা নত না করতে আবেদন জানান।

তিনি বলেন, "জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে আর আত্মমর্যাদার সাথে বাস করার নিশ্চয়তা দিয়ে যেতে চাই। মুক্তির লক্ষ্যে না পৌছা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে।" এখানে স্বাধীন দেশ বলতে শেখ মুজিব পাকিস্তানকেই বুঝিয়েছেন।

এদিন সন্ধ্যায় ছাত্র ইউনিয়ন "শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা কায়েম কর" স্লোগান সহ মশাল মিছিল করে।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা আগমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। একদিকে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আক্রমণের প্রস্তুতি, অন্যদিকে আলোচনার বাহানা—মূলতঃ সামরিক সজ্জার জন্য প্রস্তুতির সময় পাওয়া। ঢাকার পথে ১২ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া করাচী এসে পৌছেছিলেন। তিনি যে ঢাকায় আসছেন একথা শেখ মুজিবুর রহমানকে জানানো হয়েছিল। ১৪ই মার্চ শেখ মুজিব সাংবাদিকদের জানালেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলে তিনি তাঁর সাথে আলোচনা করতে প্রস্তুত রয়েছেন।

১৫ই মার্চ করাচীতে পিপলস্ পার্টি প্রধান জেড,এ, ভুট্টো এক সংবাদ সম্মেলনে (কিছুটা কৌশল পাল্টে) সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক সরকার পাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে মন্তব্য ক'রে, দুই

Scanned by CamScanner

পাকিস্তান ও দুই প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যটিকে খন্ডন করেন। তিনি এদিন বলেন যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর যখন হবে তখন কেন্দ্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই বৃহৎ পার্টির কাছে এবং প্রদেশগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে এটাই তাদের পার্টি চায়। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলদুটো একত্রিত হয়ে গণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করবে। তিনি বলেন যে, তাঁর দল পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি, তাই রাষ্ট্রক্ষমতায় এ পার্টিকে বাদ দিলে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করা হবে।

জেড,এ, ভুট্টো করাচীতে সংবাদ সম্মেলনে যে বক্তব্য রেখেছেন, সে বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে ও প্রতিবাদ জানিয়ে যারা সেদিন বিবৃতি দেন তারা হলেন, নবাবজাদা শের আলী খান, লাহোর জামায়াত-ই-ইসলামির ভারপ্রাপ্ত আমীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ, পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মালিক হামিদ সরফরাজ, রাওয়ালপিন্ডির কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ আলী আসগর শাহ্, বাহাওয়ালপুর যুক্তফ্রন্ট নেতা নির্বাচিত এম,এন,এ মিয়া নিযামউদ্দীন হায়দার, রাওয়ালপিন্ডির কাউন্সিল মুসলিম লীগ সভাপতি খাজা মাহমুদ আহমেদ মান্টু, সর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাহমুদ (তিনি আব্দুল কাউয়ুম খানেরও সমালোচনা করেন), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালি)-র মহাসচিব মাহমুদুল হক ওসমানী, সর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি কাজি ফয়েজ মোহাম্মদ, জামায়াত-ই-ইসলামী নেতা নির্বাচিত এম,এন,এ প্রফেসর গফুর আহমেদ, পাঞ্জাব জোনাল কাউন্সিল মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক খাজা মোহাম্মদ সফদর, সর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ খলিল আহমদ তিরমিযি, করাচী সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মঞ্জুরুল হক, পশ্চিম অঞ্চলের পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ্, রাওয়ালপিন্ডি বিভাগীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ,আর, সামসুদ্দোহা, রাওয়ালপিন্ডি বিভাগীয় জামায়াত-ই-ইসলামি আমীর মওলানা ফতে মোহাম্মদ প্রমুখ নেতাগণ। তাঁদের কেউ কেউ ভুট্টোর বক্তব্যকে ষড়যন্ত্রমূলক বলেও আখ্যায়িত করেন।

এদিন স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বায়তুল মোকাররম চত্বরে এক সমাবেশ করে। সেখানে তারা ১১৫ নম্বর সামরিক বিধির সমালোচনা করে। বক্তারা বাংলাদেশ রক্ষার জন্য অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকতে সকল নাগরিকের প্রতি আহবান জানান। এতে আ,স,ম, আব্দুর রব ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। আমাদের ওপর সামরিক বিধি জারি করার ক্ষমতা কারো নেই। একই সমাবেশে শাজাহান সিরাজ বলেন, প্রতিপক্ষ এখনো নিশ্চুপ রয়েছে, তবে চরম আঘাত হানার জন্য অপেক্ষা করছে। তাদেরকে প্রতিহত করা না গেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না।

১৫ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ঢাকায় পৌছেন। তাঁর সফরসঙ্গী হন বেশ কয়েকজন জেনারেল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল হামিদ, প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস,এম,জি, পীরজাদা, লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসান, জাতীয় নিরাপত্তা ও সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ প্রধান মেজর জেনারেল গোলাম ওমর, আই,এস,আই (Inter-Services Intelligence)-এর প্রধান মেজর জেনারেল আকবর।

এদিন পূর্বাহ্নে শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বাংলাদেশের অতিথি হিসেবে স্বাগত জানানো হবে বলে ঘোষণা দেন এবং ফার্মগেটের ব্যারিকেড সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেন।

Scanned by CamScanner

নিয়াজীর আত্মসমর্পনের দলিল বইয়ের লেখক সেদিন প্রেসিডেন্টের ঢাকা আগমন প্রসঙ্গে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হ'ল ঃ

"আমি বেশ কয়েকজন প্রেসিডেন্ট ও রাষ্ট্রপ্রধানের আগমন-নির্গমন দেখেছি। কিন্তু ১৫ মার্চে যে পরিবেশে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেন, তা কোন দিনই ভুলবার নয়। বিমান বন্দরে প্রবেশের সব পথই বন্ধ করে দেয়া হয়। টার্মিনাল ভবনের ছাদের উপর হেলমেট পরিহিত সৈনিকদের পাহারায় বসানো হল। অনুসন্ধানী ক্যামেরা বসানো হয়েছিল বিমান বন্দর বিল্ডিংয়ের প্রতিটি করিডোরে। পি,এ,এফ, গেটের কাছে টারম্যাকে পৌছানোর একমাত্র গেটটিতে পাহারার জন্যে একদল নির্বাচিত সৈনিক বসানো হয়। প্রেসিডেন্টকে শহরের ভেতর পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পদাতিক ব্যাটালিয়নের (১৮ পাঞ্জাব) এক কোম্পানী সৈনিক মেশিনগানে সজ্জিত হয়ে ট্রাকে বসে গেটের বাইরে অপেক্ষা করছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নির্বাচিত মাত্র কয়েকজন অফিসারকে বিমান বন্দরের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। তাদের জন্যে বিশেষ নিরাপত্তা পাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাকেও একটা পাস দেয়া হয়।

কোন ফুলের তোড়া ছিল না। ছিল না বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কিংবা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সারি। ... এমনকি সরকারী ফটোগ্রাফারকেও ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। এক অদ্ভুত ধরনের ভীতিকর পরিবেশ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ... উপরে ওঠা এবং নামার মহড়া দিচ্ছিল হেলিকপ্টারটি। এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরত্বের প্রেসিডেন্ট হাউসে যাওয়ার জন্যে যদি প্রেসিডেন্ট শহরের বিপদসংকুল পথ পরিহার করতে চান তাহলে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ওটা ব্যবহার করা হবে। যারা প্রেসিডেন্টের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল খাদিম রাজা, মেজর জেনারেল ফরমান ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল এ,ও, মিঠ্ঠি। ... প্রেসিডেন্ট বেলা তিনটায় পৌছুলেন। ...প্রেসিডেন্টের গাড়ীতে টিক্কা খানও উঠলেন।" তিনি লিখেছেন, যাইহোক, প্রেসিডেন্ট নিরাপদে তাঁর নিবাসে পৌছে গেলেন। সেখানে তিনি টিক্কা খান, খাদিম রাজা, ফরমান আলী, মিঠ্ঠি প্রভৃতি জেনারেল এবং এয়ার কমোডর মাসুদকে নিয়ে একটি বৈঠক করেন। সভায় ইয়াহিয়ার সামরিক পরিকল্পনার যায়গায় রাজনৈতিকভাবে সমাধানের কথা বলার কারণে কয়েকদিন পরই জেনারেল মিঠ্ঠিকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল।

এদিকে শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানকে মেহমান হিসেবে স্বাগত জানানোর ঘোষণা দিলেও, ইয়াহিয়া খানের আগমনে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে-ধিক্কারে ফেটে পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের অলি গলি।

১৬ই মার্চ বেলা ১১টায় প্রেসিডেন্ট ভবনে (বর্তমানে সুগন্ধা) শেখ মুজিবুর রহমান বৈঠকে বসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে। প্রথম দিনের এ আলোচনা চলে সুদীর্ঘ আড়াই ঘন্টা, আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় একান্তে কোন সহকারী ছাড়াই।

শেখ মুজিব কালো পতাকা শোভিত একটি মাজদা গাড়িতে এসে বৈঠকে যোগ দেন। প্রেসিডেন্ট ভবনের বাইরে বাঙালী ই,পি,আর-দের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না, দীর্ঘ বাঁশের লাঠি নিয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিন থেকে এসব বাঙালী ই,পি,আর জোয়ানদের কাছ থেকে সামরিক কর্তৃপক্ষ অস্ত্র তুলে নিয়েছিল।

প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপের পর শেখ মুজিবের গাড়ি প্রেসিডেন্ট ভবনের গেইটের বাইরে আসতেই সাংবাদিকরা তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরেন। মুজিব গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে প্রেসিডেন্টের সাথে

Scanned by CamScanner

আলোচনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বললেন, দেশের রাজনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর আলোচনা হয়েছে। আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন, আলোচনা চলবে, আলোচনা এখনো শেষ হয়নি। মেহেরবানী করে এর বেশী কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এটা দু'তিন মিনিটের ব্যাপার নয়। এজন্যে পর্যাপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

এদিন শেখ মুজিবের সঙ্গে মুসলীম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী শেখ মুজিবের বাসভবনে দেখা করেন। তবে আলোচনার বিষয়বস্তু জানা যায়নি।

শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন নির্দেশ দেন, এখন থেকে ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক কেন্দ্রের শুল্ক কর, আবগারি কর ও বিক্রয় কর গ্রহণ করবে। কিন্তু এসব কর স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান-এ জমা দেয়া হবে না।

সারা দেশে গণজাগরণ ঠেকাতে পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষ এদিন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, ডক্টর জোহা হল, মুন্নুজান হল, যশোর, রংপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকার পিলখানা, ফার্মগেট, রামপুরা ও কচুক্ষেত এলাকায় অসহযোগ আন্দোলকারীদের ওপর হামলা চালায়।

১৭ই মার্চ সকালে চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে ন্যাপ প্রধান মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বলেন যে, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এ ধরণের ঘোষণা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য থাকতে পারে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবের মধ্যে আপোসের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর এবং শেখ মুজিবের মধ্যে পরিষ্কার কোন বোঝাপড়া হয়েছে কিনা এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সবকিছুই সাংবাদিকদের কাছে বলা যায় না। অনেক কিছুই রাজনীতিকদের নিজেদের কাছে গোপন থাকে। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এখন সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন। এখন সব ক্ষমতা জনসাধারণ ও তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। ইয়াহিয়া এখন যা করতে পারেন তা হলো একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা। তার কাজ হবে দু'অংশের মধ্যে সম্পদ ও দায়ের হিসেব করা এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে তা দু'অংশের মধ্যে বন্টন করে দেয়া। তিনি বলেন যে, দেশের দুই অংশের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত জনাব ভুট্টোর সুপারিশ ভুট্টোকে আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। তিনি বলেন, "আমি সাম্যবাদ, লেনিনবাদ এবং মাওবাদ সম্পর্কে কিছু বুঝি না। মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল' বইও আমি পড়িনি, তবে আমি একথা ভাল করে বুঝি যে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক না খেয়ে রয়েছে।"

মওলানা ভাসানী এদিন পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা পিপলস্ পার্টি প্রধান জনাব জেড.এ.ভুট্টোর হাতে অর্পণের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানান।

১৭ই মার্চ প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে দ্বিতীয় দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট ভবনে। উভয়ে কারো সাহায্য ছাড়াই এক ঘন্টা আলোচনা করেন। সেদিনও শেখ মুজিব কালো পতাকা সজ্জিত গাড়িতে করে প্রেসিডেন্টের ভবনে গিয়েছিলেন। বৈঠক শেষে বেরিয়ে আসার সময় প্রেসিডেন্ট ভবন গেটে বিপুল সংখ্যক দেশী ও বিদেশী সাংবাদিক তাঁকে ঘিরে ধরে আলোচনার অগ্রগতি এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্নবাণ ছুঁড়তে থাকেন। উত্তরে শেখ মুজিব বিমর্শচিত্তে বলেন, "আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, আমার কিছু বলার নেই। আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং আমাদের মধ্যে আরও আলোচনা হতে পারে। তবে

Scanned by CamScanner

সময় নির্ধারিত হয়নি।" তবে অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর তিনি "হ্যাঁ" বা "না" দিয়ে শেষ করে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে ধানমন্ডির বাড়িতে চলে যান।

সিদ্ধান্ত হয় যে ১৮ই মার্চ কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে না। ইতিমধ্যে উভয় পক্ষ সম্মত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নের খুটিনাটি দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে বলে জানা যায়।

প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে নিজের বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করে শেখ মুজিব তার দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এক রুদ্ধদার বৈঠকে মিলিত হন।

এরপর শেখ মুজিব সগৃহে দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের ঘরোয়াভাবে সাক্ষাৎদান করেন। তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে পুনঃ উল্লেখ করেন, আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং আমাদের মধ্যে আরও আলোচনা হতে পারে। তবে সময় নির্ধারিত হয়নি। জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে এবং লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।" শেখ মুজিব পাল্টা প্রশ্নও করেন, "আমি কি আন্দোলন প্রত্যাহার করেছি?" একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, "আপনি কি আপনার চার-দফা দাবী নিয়ে আলোচনা করেছেন?" শেখ মুজিব উত্তরে বলেন, "যখন আমি প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়েছি, তখন অবশ্যই রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমার দাবী নিয়ে আলোচনা করেছি।"

সেদিন বিকেলে শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনের সামনে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, "জনগণ সত্য ও ইনসাফের জন্যে সংগ্রাম করছে এবং তাদের দাবীর প্রশ্নের কোন আপোস হতে পারে না।"

সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ হয়ত আলোচনার তথা সময়ক্ষেপণের লক্ষ্যে ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়। তাছাড়া শেখ মুজিব সামরিক বাহিনী তলব এবং সোনাবিহিনী কর্তৃক ২রা থেকে ৯ই মার্চ হত্যা সম্পর্কে তদন্তের জন্যে যে শর্ত আরোপ করেন, তা পূরণের জন্যে ১৭ই মার্চ ঢাকায় সামরিক আইন প্রশাসক একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। ঘোষণায় বলা হয় যে, হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনিত একজন বিচারপতি তদন্ত কমিটির নেতৃত্ব দেবেন। ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত দিক সম্পর্কে পরামর্শ দেয়ার জন্যে বিচারপতি এ, আর, কর্ণেলিয়াসকে ঢাকা আনা হয়। এসবই ছিল আসলে প্রহশন তথা সময়ক্ষেপণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সামরিক কর্তৃপক্ষের কৌশলমাত্র।

শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট ভবন ত্যাগের কিছু সময় পরে জেনারেল টিক্কা খান প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করেন। সামরিক পরিকল্পনা রচনাই হয়ত উদ্দেশ্য!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ থেকে ছাত্ররা শুরু করে সামরিক প্রশিক্ষণ। লক্ষ্য গণমানুষের মুক্তি।

এদিন স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগামী ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসকে প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করে।

১৭ই মার্চ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সার্ভিসেস ফেডারেশন এক সভায় জনগণের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে এবং জননেতা শেখ মুজিবের নির্দেশানুযায়ী অফিসে অনুপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

Scanned by CamScanner

এদিন দেশরক্ষা খাতে বেতনভুক বেসামরিক কর্মচারীদের এক সভায় একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। সভায় সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণ-হত্যার নিন্দা করা হয়। ১৯৭ নং সামরিক নির্দেশ প্রত্যাহার করার জন্যে সভায় দাবী জানানো হয়।

এদিন ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ৫২ তম জন্মদিন। বিদেশী সাংবাদিকরা শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ৫২ তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালে অন্যান্যের মধ্যে তিনি বলেন, "আমার আবার জন্মদিন কি, মৃত্যু দিবসই বা কি? আমার জীবনই বা কি? মৃত্যুদিন আর জন্মদিবস অতি গৌণভাবে এখানে অতিবাহিত হয়। আমার জনগণই আমার জীবন।" সেদিন তাঁকে গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দেয়া যায়।

১৭ই মার্চ চট্টগ্রামে লেঃ কর্নেল এম,আর, চৌধুরীর ডাকে রাত সাড়ে ন'টায় চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে সামরিক আইন সদর দফতরে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো—চারজন সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালী অফিসারের মধ্যে। চারজন হলেন লেঃ কর্নেল এম,আর, চৌধুরী, মেজর জিয়াউর রহমান, নোয়াখালির মেজর আমিন আহমদ চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন অলি আহমদ। সে বৈঠকে কর্নেল চৌধুরী সুস্পষ্টভাবে বললেন, সশস্ত্র অভ্যুত্থানই একমাত্র পথ। তিনিই প্রথম বাঙ্গালী অফিসার যিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহবান জানান। ঠিক হ'ল ক্যান্টনমেন্টের স্টেশন কমান্ডার একমাত্র বাঙ্গালী ব্রিগেডিয়ার এম,আর,মজুমদারকে এ পরিকল্পনা থেকে বাইরে রাখতে হবে। ঠিক হয়েছিল লেঃ কর্নেল এম,আর,চৌধুরীর নেতৃত্বেই তাঁরা বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালিয়ে যাবেন।

১৮ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য ২ মার্চ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনী তলব করা সংক্রান্ত বিষয় তদন্তের জন্য সামরিক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশন প্রত্যাখ্যান করে এ কমিশনকে কোন প্রকার সহযোগিতা না করার জন্যে জনগণের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, তথাতথিক কমিশন নিয়োগের যে ঘোষণা করা হয়েছে, তা বাংলাদেশের তরফ থেকে উত্থাপিত দাবীকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। সামরিক আইন আদেশের মাধ্যমে এর গঠন এবং সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে এর রিপোর্ট পেশের বিধানও অত্যন্ত আপত্তিকর।

শেখ মুজিবুর রহমান কি পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল তা সরেজমিন তদন্ত করে রিপোর্ট করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য আবিদুর রেজা খানকে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন। তারা সরেজমিন তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করবেন বলে বলা হয়।

বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যগণ এদিন চলমান সংগ্রামের সঙ্গে তাদের একাত্মতা ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তারা একটি সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিভিন্ন দেশের সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছে তারবার্তা প্রেরণ করে। এতে তারা গণ-হত্যা ও যুদ্ধ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিবৃত্ত করার জন্যে অনুরোধ জানান।

স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া, চীন সহ বিভিন্ন শক্তিধর দেশের প্রতি তাদের সরবরাহ করা অস্ত্রে বাঙালীদের হত্যা চেষ্টা বন্ধের আবেদন জানান।

Scanned by CamScanner

এদিনও পাকিস্তানী সেনারা তেজগাঁ মহাখালীতে শ্রমিকদের ট্রাকে হামলা চালায়। আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম এর প্রতিবাদে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি পাঠিয়ে বলেন, "এ ধরনের উস্কানি সহ্য করা হবে না।"

১৮ই মার্চ করাচীতে পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জেড.এ.ভুট্টো উচ্চপর্যায়ের দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার পর সাংবাদিকদের জানালেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে আলোচনার জন্যে ঢাকা সফরের যে আহবান জানিয়েছিলেন, তা তিনি রক্ষা করতে পারছেন না। তিনি কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত ঢাকা থেকে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় আগামীকাল তিনি যদি ঢাকা যান, তবে তাতে কোন লাভ হবে বলে তিনি মনে করেন না।

এদিন প্রাদেশিক রাজধানী শহর ঢাকা থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে জয়দেবপুরের রাজবাড়ীতে অবস্থানরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়নের হাতিয়ার (অস্ত্রশস্ত্র) অবাঙ্গালী অফিসারদের দ্বারা ছিনিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছে বাঙ্গালী সৈনিকরা। ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের অস্ত্র ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কিন্তু সৈনিকরা তা অগ্রাহ্য করে। বারুদের মুখে দাঁড়িয়ে বিশেষ ট্রেনিং গ্রহণরত সৈনিকেরা ওপরওয়ালাদের নির্দেশকে প্রতিরোধ করে। অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করে সৈনিকদের মূল ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার ষড়যন্ত্রমূলক হুকুম দেয়া হলে বাঙ্গালী সৈনিকরা তা তামিল করেনি। এ ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে গ্রামের পর গ্রাম থেকে মানুষ টঙ্গি-জয়দেবপুর রোডের মোড়ে জমায়েত হওয়া শুরু করে, গড়ে তোলে একটার পর একটা ব্যারিকেড।

এ ঘটনার পরও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ছয়-দফার দাবী নিয়ে দর-কষাকষি চালাতে থাকেন। অথচ এ ঘটনার অন্তরালে কী আছে তা তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করলেন না। বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্য দাঁড়ায় একটিই তা হ'ল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানদের সামরিক আক্রমণ যাতে বাঙ্গালী সৈনিকরা প্রতিরোধ করতে না পারে তার পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করা।

১৯ মার্চ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে তৃতীয় দফা আলোচনায় বসেন। আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট ভবনে রুদ্ধদার কক্ষে এবং তা স্থায়ী হয় দেড় ঘন্টা। এদিনের আলোচনায়ও কারো কোনো সহকারী ছিল না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনার পর শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন যে, এ আলোচনা সাধারণ ব্যাপার নয়। এ জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনার কোন লিখিত দলিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা প্রশ্ন করা হলে শেখ মুজিব বলেন, এ ধরনের কিছুই হয়নি। যে আলোচনার উপর পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি সহ সমগ্র পাকিস্তানের ১৩ কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সে আলোচনার কোনরূপ লিখিত দলিল না থাকাটা সত্যিই আশ্চর্যজনক।

এদিন শেখ মুজিব সাংবাদিকদের, প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমি সব সময়েই ভাল আশা করি, তবে খারাপের জন্যও তৈরী থাকি। উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আলোচনার অগ্রগতি বোঝায় কিনা, প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন, আপনারা যা খুশী ধারণা করতে পারেন। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সাথে শেখ মুজিব দেখা করতে রাজী কিনা, জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে কোন রাজনৈতিক নেতা তাঁর সাথে আলাপ করতে এলে তিনি তাঁদের স্বাগত জানাবেন। তাঁর গৃহের দুয়ার সবার জন্যই উন্মুক্ত। দলীয় নেতা অথবা ব্যক্তি যে-কোন সময়ে তাঁর সাথে দেখা করতে পারেন বলে তিনি জানান।

Scanned by CamScanner

আজ গাজীপুরের জয়দেবপুরে পাকিস্তানী সেনাদের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ হয়। আট/দশ হাজার জনতার উপস্থিতি ছিল সেখানে। সংঘর্ষে ১২৫ জন লড়াকু সৈনিকের মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। সন্ধ্যায় জয়দেবপুরে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। অনেক লোককে পাক সৈন্যরা রাস্তা থেকে ধরে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। সেদিন সেখানে পাকিস্তানী বিগ্রেড কমান্ডারের জনগণের প্রতি গুলি চালানোর নির্দেশ উপেক্ষা করে প্রথমদফায় মাটিতে ও দ্বিতীয়বার উপরে গুলি ছোঁড়ার মত ঘটনা ঘটিয়েছিল বাঙ্গালী সৈনিকরা। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শিদ্ধান্তহীনতায় ঐ সময়কালে সৈনিকরা এর চেয়ে বেশী কী-ই-বা করতে পারতেন? তবে, এ থেকে, রাজনৈতিক নির্দেশ পেলে, তাঁরা যে কী করতে পারতেন তা সহজেই অনুমেয়। ঐদিন রাতে ৪টি চাইনিজ রাইফেল, একটি এস-এম-জি এবং কিছু গোলাগুলি সহ ৫ জন বাঙ্গালী সৈন্য সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

শেখ মুজিবুর রহমান জয়দেবপুরে পাক সৈন্যদের গুলির প্রতিবাদে এক বিবৃতি দেন। এতে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়। তার অর্থ এই নয় যে তারা শক্তি প্রয়োগকে ভয় পায়। জনগণ যখন রক্ত দিতে তৈরী হয়, তখন তাদের দমন করতে পারে এমন শক্তি দুনিয়াতে নেই।

শেখ মুজিবুর রহমান অনেক কিছুই বুঝলেন, কিন্তু তিনি যা বুঝতে চাইলেন না তা হ'ল, জনগণ তখন আর ছয়-দফা চায় না—বাঙালী সৈনিক সহ জনগণ তখন চায় এক দফা—তারা চায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা।

এদিন সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমানের তিনজন উপদেষ্টার সাথে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার তিনজন উপদেষ্টার দু'ঘন্টা স্থায়ী একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবের উপদেষ্টা ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন অহমদ এবং ডঃ কামাল হোসেন। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ছিলেন সাবেক আইনমন্ত্রী এ,আর, কর্ণেলিয়াস, প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপ্যাল ষ্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীরজাদা এবং সামরিক বাহিনীর জজ এডভোকেট জেনারেল কর্নেল হাসান। উপদেষ্টাগণ কোন্ ফর্মুলার ভিত্তিতে আলোচনা চলবে সে সম্পর্কে মতামত বিনিময় করেন বলে জানা যায়।

প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাগণের সঙ্গে বৈঠক শেষে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, শেখ মুজিব এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যে আগে যে আলোচনা হয়েছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে উভয় পক্ষের উপদেষ্টাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। জনাব তাজউদ্দিন আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি বলেন, "অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।" অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি কোন কিছু প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি বলেন যে, সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরা জয়দেবপুরে গুলিবর্ষণের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

১৯ মার্চ রাতে ভয়েস অব আমেরিকার খবরে বলা হয় যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবের মধ্যে আলোচনা চলছে। বেতার আরও সংবাদ দিয়েছে যে, ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে উভয়ে আলোচনা করেছেন।

২০ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মধ্যে নিজ নিজ উপদেষ্টাগণকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক সকাল ১০টায় শুরু হয়ে প্রায় দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত চলে। শেখ মুজিবের উপদেষ্টামন্ডলিতে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, জনাব মনসুর আলী, জনাব এ,এইচ,এম, কামরুজ্জামান এবং ডক্টর কামাল হোসেন। অপরপক্ষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে ছিলেন বিচারপতি এ.আর. কর্ণেলিয়াস, লেঃ জেনারেল পীরজাদা এবং জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল (আর্মি) কর্নেল

Scanned by CamScanner

হাসান। পত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আলোচনা শেষে শেখ মুজিব ও তাঁর উপদেষ্টাগণ সহাস্যবদনে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে আসেন।

পরে শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে, রাজনৈতিক সংকট সমাধানের পথে তাঁরা এগুচ্ছেন। তিনি বলেন, উভয় দলের উপদেষ্টাদের বৈঠক চলবে এবং তিনি ইয়াহিয়া খানের সাথে আগামীকাল সোমবার সকালে পুনরায় আলোচনায় মিলিত হবেন।

শেখ মুজিব বলেন, আমাদের আলোচনা চালু রয়েছে এবং আমরা অগ্রসর হচ্ছি। এই আলোচনায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে পৃথকভাবে এই ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করবেন। তিনি আরো বলেন, প্রয়োজনবোধে আমরাও যৌথভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি।

তাঁরা একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব বলেন, তাঁরা দেশের রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করছেন। আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, "আমি যখন বলি আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে, তার থেকেই আপনারা বুঝতে পারেন।" তবে তিনি বলেন যে, অবশ্যই অনির্দিষ্টকালের জন্য আলোচনা চলতে পারে না। তিনি বলেন যে, তাঁরা রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন এবং এর বেশী কিছু তিনি এখন বলবেন না।

জয়দেবপুরের ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছিলেন কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, তিনি উল্লেখ করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট এ বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

উপদেষ্টা পর্যায়ে পরবর্তী বৈঠক কখন অনুষ্ঠিত হবে, জনাব তাজউদ্দিন আহমদের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয় জানার অপেক্ষায় তাঁরা রয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, শুধু জয়দেবপুরে অবস্থিত ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টেই নয়, অন্যত্রও বাঙ্গালী সৈনিকদের নিরস্ত্র ও দুর্বল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কর্নেল শাফায়াত জামিল-এর পূর্বোক্ত বই থেকে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ থেকেও তা সহজেই বোধগম্য হবে। তিনি লিখেছেন, "১১ মার্চ কুমিল্লা থেকে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার আমাকে নির্দেশ দিলেন ৩১ পাঞ্জাব ব্যাটালিয়নের ১৭ ট্রাকের একটা কনভয় (গোলাবারুদ ও রেশনবাহী সামরিক যানের বহর) এসকর্ট করে সিলেট পৌঁছে দিতে। ব্যাটালিয়নটি তখন ছিল সিলেটের খাদিমনগরে। ইতিমধ্যেই পথে বেশ কয়েকবার জনতার বাধার সম্মুখীন হতে হতে ট্রাক কনভয়টি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেছিল। ... এতোগুলো ট্রাক নিরাপদে সিলেট পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাকে দেয়া হলো মাত্র একটা প্লাটুন (৩৫ জন সৈন্য)। রাস্তায় ৫/৬ মাইল পরপরই সামনে বড়ো বড়ো গাছের ব্যারিকেড পড়তে লাগলো। ... ব্যারিকেডের কারণে ১২০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে ২/৩ দিন লেগে গেল। ১৬ মার্চ সিলেটে পৌঁছুলাম আমরা। পৌঁছবার পর ৩১ পাঞ্জাবের কমান্ডিং অফিসার সাফল্যের সঙ্গে করভয় নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানালেন আমাকে। তারপর তাদের ছাউনিতে থাকার এবং আমাদের অস্ত্রশস্ত্র তাদের কোতে জমা দেয়ার প্রস্তাব করলেন তিনি। কিন্তু পাকিস্তানিদের মতলব বুঝতে পেরে আমি তাতে রাজি হলাম না। সিনিয়র এনসিওরা আমাকে বলেছিল, আমরা একটা 'অপরেশনাল এরিয়া' থেকে এসেছি, তাই আমরা নিজেদের অস্ত্র দিয়েই একটা ছোটখাটো অস্ত্রাগার বানিয়ে রাখবো। সিওকে আমার মতামত জানিয়ে দেয়া হলো। তিনি আর এ ব্যাপারে চাপাচাপি করলেন না। পরে মনে হয়েছে, ঐ সময় পাকিস্তানিরা বেশি জোরাজুরি করে নি এজন্য যে, ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পরিকল্পনাটি তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারতো। তারা চায়নি বাধ্য হয়ে আমরা এমন একটা কিছু করি, যাতে ২৫ মার্চের আগেই পরিস্থিতি বদলে যায়।"

Scanned by CamScanner

তিনি লিখেছেন, "অধিনায়কের ওপর একজন সুবেদার মেজর প্রচুর প্রভাব খাটিয়ে থাকেন। চতুর্থ বেঙ্গলে অবস্থানরত অন্যান্য বাঙালি অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করে ইদ্রিস মিয়া (সুবেদার মেজর) আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সিওকে চাপ দিলেন। শেষ পর্যন্ত সিও কর্নেল খিজির হায়াত খান কুমিল্লা ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে আসবার নির্দেশ দেন। ১৯ মার্চ আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে এলাম। চারদিকে তখন চাপা উত্তেজনা।"

২০ মার্চ মিরপুর, পার্বতীপুর, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুরে বাঙ্গালিদের সঙ্গে অবাঙ্গালিদের দাঙ্গা বাঁধে।

শেখ মুজিবুর রহমান এদিন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিকর উত্তেজনা সৃষ্টির বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন এবং সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে জনগণের প্রতি আহবান জানান।

এদিনই জানা যায় যে, প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি প্রধান ভুট্টো আগামীকাল ঢাকায় আসবেন। এদিন পাকিস্তান রেডিও'র খবরে বলা হয়, জনাব ভুট্টো একটি উপদেষ্টা দল নিয়ে ঢাকা যাচ্ছেন। শেখ মুজিব ভুট্টোর সঙ্গে বসতে রাজী আছেন, প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এ বার্তা পাওয়ার পরই ভুট্টো আসতে রাজী হন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বোকা বানানোর নাটিকার শেষ অধ্যায় ছিল এটা। কারণ, তাদের নির্বিঘ্নে আরো কয়েকদিন সময় প্রয়োজন ছিল।

এদিন বিবিসি'র সংবাদ ভাষ্যে মন্তব্য করা হল, পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সংকট দূরীভূত হচ্ছে।

এদিকে সমানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ এসে অবতরণ করছে ঢাকা বিমান বন্দরে। সে-সঙ্গে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যাত্রী বহনকারী সমুদ্রগামী জাহাজ এম,ভি, সামস্ ও এম,ভি, সাফিনা-ই-আরবকে সৈন্য পরিবহণের কাজে ব্যবহার। একাজে আরও ব্যবহার হচ্ছিল নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ।

এদিন (২০ মার্চ) চট্টগ্রাম বন্দরের ১৭ নম্বর জেটিতে নোঙর করা ভারি অস্ত্র-শস্ত্র বোঝাই এম.ভি, সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের চেষ্টা নেয় সেনাবাহিনী। সে কাজে বাধা দেয় চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রমিক ও চট্টগ্রামবাসীগণ। তাতে সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করে। কয়েকজন হতাহত হন বলে জানা যায়। তবে, সেনাবাহিনী সেদিনের মত অস্ত্র-শস্ত্র খালাস স্থগিত রাখে।

২১ মার্চ সকালে শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যে একটি অনির্ধারিত বৈঠক হয় এবং বৈঠক চলে এক ঘন্টা ত্রিশ মিনিট। শেখ মুজিবের সঙ্গে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন বলে জানা যায়। এ বৈঠকের বিবরণও ঠিক আগের মতই, জনগণের বলে দাবীদার নেতাদের কাছ থেকে জনগণ কিছুই জানতে পারলেন না। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব জানালেন, আজকের বৈঠক আশ্চর্যজনক বা আকস্মিক এমন কিছুই নয়। প্রেসিডেন্ট যতক্ষণ এখানে আছেন ততক্ষণ প্রয়োজনের স্বার্থে যে কোন সময় যে কোন ব্যাখ্যার প্রশ্নে উভয়ে আলোচনায় মিলিত হতে পারেন। উভয়ের মধ্যে আলোচনার বিবরণ জানতে চাওয়া হলে শেখ মুজিব নীরব থাকেন। পরে বলেন, ইতিপূর্বের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় প্রশ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন যে, তাঁরা নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

২১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো বিকেলে ঢাকায় আসেন তাঁর উপদেষ্টামন্ডলী সহ। তিনি এসেই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমানে হোটেল শেরাটন) ওঠেন। তবে বিমান বন্দর থেকে কড়া সেনা পাহারায় হোটেলে যাওয়ার পথে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিবাদী মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়েন।

Scanned by CamScanner

ঢাকা আসার পর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ভবনে যেয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে প্রায় দুই ঘন্টা একান্তে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সাংবাদিকরা ভুট্টোর কোন সাক্ষাৎকার নিতে সক্ষম হননি। তবে, পিপিআই-এর একজন প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, "সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। আপনার কাছে এখন শুধু এটুকুই বলতে পারি।" তবে, পরে জানা যায় যে, প্রেসিডেন্ট আওয়ামী লীগের পরিকল্পনার মুখ্য বিষয়গুলো ভুট্টোকে অবহিত করেন এবং তাঁদের পরিকল্পনা অনুসারে করণীয় বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

এদিন মওলানা ভাসানী চট্টগ্রামের পোলো ময়দানে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, জেনারেল ইয়াহিয়ার উচিত শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে সরে পড়া। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ শেখ মুজিবের পেছনে কাতারবন্দি। আমরা এ দেশকে স্বাধীন করবই। তিনি আরো বলেন, মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে স্বাধীনতা প্রিয় বিশ্বের সকল দেশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে।

উল্লেখ্য যে, মওলানা ভাসানীর বক্তব্য মানুষকে কখনও কখনও মারাত্মক বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ১৭ই মার্চ চট্টগ্রামে বললেন, "শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন", অথচ সে চট্টগ্রামেই এদিন বলছেন, "মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে স্বাধীনতা প্রিয় বিশ্বের সকল দেশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে"।

জয়দেবপুরে ১৯ মার্চ জারী করা সান্ধ্য আইন এদিন ছয় ঘন্টার জন্যে প্রত্যাহার করা হয়।

এদিন শীতলক্ষ্যা নদীর বুকে আন্দোলন-সংগ্রামের পক্ষে একটি জাহাজ মিছিল হয়।

২২ মার্চ দৈনিক আজাদ তার এক রাজনৈতিক রিপোর্টে লিখল, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের চার দফা শর্তের ব্যাপারে একটা গ্রহণযোগ্য ফর্মুলা প্রণয়নের পরই মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে এবং এই ফর্মুলা প্রণয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন 'পাঞ্জাব প্রেসার গ্রুপ'-এর উপর নির্ভরশীল বলিয়া ওয়াকিফহাল মহল সূত্রে আভাস পাওয়া গিয়াছে। ... বঙ্গবন্ধুর প্রথম শর্ত অর্থাৎ সামরিক শাসন প্রত্যাহারের প্রশ্নে একটি বিশেষ মহল যে বিরূপ চাপ অব্যাহত রাখিয়াছে, তাহাতে কার্যতঃ মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনায় জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে।"

২২ মার্চ বায়তুল মোকাররমের সম্মুখে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অবসর নেয়া কর্মকর্তা ও সৈনিকরা সমবেত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। এখানে তাঁরা স্বাধীনতার শপথ নেন।

এদিন বেশ কিছু সংবাদপত্র এক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। "বাংলার স্বাধীকার" শিরোনামে প্রকাশিত এ ক্রোড়পত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের শুভেচ্ছা বাণী প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাতকোটি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য আমাদের এই সংগ্রাম। অধিকার বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ সংগ্রাম চলবে। বুলেট-বেয়নেট দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে আর স্তব্ধ করা যাবে না। কেননা জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ।

এদিন প্রেসিডেন্ট ভবনে শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠক চলে এক ঘন্টা পনের মিনিট। বৈঠক চলাকালেই প্রেসিডেন্টের জনসংযোগ অফিসার বাইরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের এসে জানালেন, প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আগামী ২৫শে মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য ঘোষণা করেছেন। ঘোষণায় বলা হ'ল যে, দেশের উভয় অংশের নেতাদের সাথে পরামর্শ করে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুবিধার জন্যে প্রেসিডেন্ট আগামী ২৫শে মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঘোষণায় আরও বলা হয় যে, প্রেসিডেন্ট অল্পদিনের মধ্যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।

বৈঠক শেষ করে শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে ফিরে এসে সাংবাদিকদের বলেন, তাঁর সাথে প্রেসিডেন্টের যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টোকে তা জানিয়েছেন এবং জনাব

ভুট্টোর সাথে আলাপ-আলোচনা করেছেন। শেখ মুজিব আলোচনার উপর এর বেশী কিছু বলতে অস্বীকার করেন।

আলাপ-আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, "যদি কোন অগ্রগতি না হোত, তাহলে আমি কেন আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি?"

সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিব বলেন যে, তাঁর সাথে আজ প্রেসিডেন্টের আলাপ-আলোচনা হবার কথা ছিল। তাঁর সাথে আমি দেখা করতে গিয়ে দেখি যে, জনাব ভুট্টোও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, আমি অনেক আগেই দাবী করেছি যে, আমাদের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা পরিষদের অধিবেশনে বসবো না। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব সাংবাদিকদের জানালেন যে, আগামীকাল (২৩শে মার্চ) প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর বৈঠক হতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাগণ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাগণের সাথে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হবেন।

এদিন প্রেসিডেন্ট ভবনের সামনে উপস্থিত জনতা জনাব ভুট্টোর প্রতি বিদ্রূপ ধ্বনি করেন এবং শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানান। পরে জনতা দীর্ঘ সময় ধরে ভুট্টো-বিরোধী তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। জনাব ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে যখন হেটেলে ফিরে আসেন তখন সেখানেও ভুট্টো-বিরোধী তুমুল বিক্ষোভ চলে।

এদিকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের কর্মচারীরা সেদিনও বাংলাদেশের নতুন পতাকা এবং কালো ব্যাজ লাগিয়ে হোটেলে কাজ করেন।

সাজানো নাটকের অংশ হিসেবে এদিন সন্ধ্যায় পিপিপি প্রধান জেড,এ ভুট্টো সাংবাদিকদের জানালেন যে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট এবং শেখ মুজিব ব্যাপক সমঝোতা ও মতৈক্যে পৌঁছেছেন যা প্রেসিডেন্ট তাঁকে অবহিত করেছেন। তাঁর দল সমঝোতার শর্তগুলো পরীক্ষা করে দেখছে।

অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস, তৎকালীন পাকিস্তান মর্নিং নিউজ, করাচীর সহকারী সম্পাদক, তাঁর "দি রেপ অব বাংলাদেশ" গ্রন্থে পরবর্তীকালে এ দিনের (২২শে মার্চ) একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এদিন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালি) সভাপতি খান আবদুল ওয়ালি খান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁরা একান্তে কথা বলেন। সে আলাপচারিতার একটি ভাষ্য হল এইরূপ ঃ

"শেখ সাহেব, আমাকে বলুন আপনি কী এখন পর্যন্ত অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন?

মুজিব উত্তরে বলেন, খান সাহেব আমি একজন মুসলীম লীগার।

মুজিবের উত্তরের তাৎপর্য এই যে, খান ওয়ালি খান ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির বিরোধীতা করেছিলেন বলে তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। যেমন করেছিল জামায়াত-ই-ইসলামি, যা এখন পাকিস্তানের আদর্শের রক্ষক বলে দাবী করছে। তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন কেবলমাত্র তিনি অর্থাৎ মুজিব পাকিস্তান আন্দোলনেরই সমর্থণ করেছিলেন এবং এখন পর্যন্ত এর ধারণার প্রতি অনুগত রয়েছেন।"

এ প্রসঙ্গে জনাব মাসুদুল হক তাঁর "স্বাধীনতার ঘোষণা মিথ ও দলিল" গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা হ'ল, "হামলা আসছে, এ ব্যাপারে তার (শেখ মুজিব) বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সবরকমের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে, এও তার অজানা ছিল না। কী ঘটতে যাচ্ছে, তা তিনি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন। এই ভয়ঙ্কর সময়ে তার মুখ থেকে একথা বেরুলো কেন?

Scanned by CamScanner

নিজের পরিচিতি সম্পর্কে যে বাক্য তার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো—তখনো পর্যন্ত কী তিনি তাই-ই ছিলেন? ছিলেন বলেই কী স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বরণ করলেন?"

সেদিন (২২ মার্চ) জানা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সমাধানের ব্যাপারে একটা মোটামুটি ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন, যাতে অবিলম্বে প্রাদেশিক সরকারগুলো গঠন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অধীনে অস্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে কাজ করতে দেয়া এবং একটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের বিষয় অন্তর্ভুক্ত। সংবিধানেই অন্তর্ভুক্ত থাকবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি কিভাবে হবে সে বিষয়াবলী। সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের সীমিত ক্ষমতা থাকবে। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা—এ তিন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা থাকবে। বাকি সব ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

যদিও একথা সত্য যে, শেখ মুজিব ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বা প্রেসিডেন্ট, শেখ মুজিব এবং জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে সমঝোতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সরকার যেমন তার মুখ বন্ধ রেখেছিল, শেখ মুজিবও জনগণকে কিছু জানাতে রাজী হচ্ছিলেন না।

এদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস উপলক্ষ্যে প্রদত্ত এক বাণীতে জঘন্য মিথ্যাচারের মাধ্যমে সমগ্র দেশের মানুষকে বোকা বানানোর পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তিনি তাতে বললেন, "নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাতে একটি সহজ ও কার্যকরী ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের উপযোগী সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্বিঘ্নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে পারেন সেজন্য বর্তমানে সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে।"

অথচ শেখ মুজিব বলেছেন যে তাঁরা আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, আর জনাব ভুট্টো বলেছেন, তাঁর দল সমঝোতার শর্তগুলো পরীক্ষা করে দেখছে।

লেখক সংগ্রাম শিবির-এর উদ্যোগে এদিন বিকেলে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ডক্টর আহমদ শরীফ-এর সভাপতিত্বে একটি কবিতা পাঠের আসর বসে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। জয়দেবপুরে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ জনিত ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

২৩ মার্চ ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক The People পত্রিকায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাকিস্তানী আইনবিদ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ জনাব এ,কে,ব্রোহীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তা থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তানের ঐ পর্যায়ে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে, যেখানে এখনও সংবিধান রচিত হয়নি, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় কিনা, তাঁকে সে প্রশ্ন করা হয়েছে। এর উত্তরে জনাব এ,কে,ব্রোহী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে কোন আইনগত বাধা নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

এদিন সরকারী ও বেসরকারী ভবনগুলোতে পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে পাকিস্তানের পতাকা উড়ার কথা, সে উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তার কিছুই হয়নি। সারা পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী পতাকা ওড়েনি। শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট ভবন, তেজগাঁ বিমানবন্দর এবং সামরিক ছাউনিতে উড্ডিন ছিল পাকিস্তান পতাকা। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্রই উড়েছে বাংলাদেশের পতাকা ও কালো পতাকা।

এদিন স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে ঢাকাস্থ বৃটিশ হাই কমিশন এবং সোভিয়েত কনস্যুলেটে বাংলাদেশের পাতাকা উত্তোলন করা হয়।

পাকিস্তান সরকারের ২৩শে মার্চের পাকিস্তান দিবসের কর্মসূচী অনুযায়ী ঢাকাস্থ চীনা, ইরানী, ইন্দোনেশীয় ও নেপালী দূতাবাসে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। পরে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও জনতা এসব দূতাবাসে গিয়ে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে দেয়।

Scanned by CamScanner

মার্কিন দূতাবাস এদিন বিতর্ক এড়ানোর নামে কোন পতাকাই উত্তোলন করেনি।

শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনেও এদিন কালো পতাকার সাথে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছিল।

এদিন (২৩ মার্চ) টেলিভিশন কর্মচারীদের সঙ্গে পাকিস্তানী সৈন্যরা দুর্ব্যবহার করলে সম্প্রচার বন্ধ থাকে, এতে করে আজ কোন জাতীয় সঙ্গিতই পরিবেশিত হয়নি।

এদিন সকাল ৯টা ২০ মিনিটে পল্টন ময়দানে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের গণবাহিনীর (জয় বাংলা বাহিনী) কুচকাওয়াজ শুরু হয়। সম্মিলিত গণবাহিনী ঢাকার রাজপথ ধরে কুচকাওয়াজ করে গার্ড অব অনার দেয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে যান। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে গণবাহিনীর সালাম নেন। সে সময় রেকর্ডে "আমার সোনার বাংলা"—জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়ে শোনানো হয়। এদিন শেখ মুজিবের বাসভবনে শত শত মিছিল আসতে থাকে। ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্মচারীদের মিছিল বের হয়, তাঁরা মুক্তি সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

শেখ মুজিব এদিন তাঁর দেয়া বক্তৃতাসমূহে দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কথা পুনরায় ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান দিবসকে শেখ মুজিবুর রহমান "লাহোর প্রস্তাব দিবস" এবং স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এ দিনকে "প্রতিরোধ দিবস" হিসেবে ঘোষণা করেছিল। প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে এদিন স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ছাত্র-শ্রমিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্র-শ্রমিক নেতৃবৃন্দ 'স্বাধীনতা' রক্ষার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে সকলের প্রতি আহবান জানান। এ সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে সকল পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্য বর্জনের আহবান জানানো হয় এবং এজন্যে ২৪ থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্য বর্জন সপ্তাহ পালনের আহবান জানানো হয়। আর একটি প্রস্তাবে আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, যুক্তরাজ্য, ভারত, সিংহল, বার্মা, ইরান প্রভৃতি দেশের প্রতি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিকট কোন প্রকার অস্ত্র সাহায্য, বিক্রয় অথবা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্যে স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথ ব্যবহারের অনুমতি না দেয়ার জন্যে আবেদন জানানো হয়।

এদিন পিপিপি প্রধান জেড,এ, ভুট্টোর সঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার লেঃ জেনারেল পীরজাদার একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট ভবনে ৭৫ মিনিট স্থায়ী ছিল সে বৈঠক। বৈঠকের বিবরণ না জানা গেলেও বুঝা যায় যে সে বৈঠকে নিশ্চয়ই সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়াবলী আলোচিত হয়।

এদিকে ভুট্টোর পিপলস্ পার্টি ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলের নেতারা এদিন শেখ মুজিব এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সংকট নিরসনে তাঁদের ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেন। উল্লেখ্য যে, এসব নেতাগণ আগেই শেখ মুজিবের ৭ই মার্চ ঘোষিত চার দফা দাবীর প্রতি সমর্থন দান করেন।

অপরদিকে এদিন করাচীতে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বকারী পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট দলগুলোর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পিপ্‌লস্ পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র মুখপাত্র বলে জনাব ভুট্টো যে দাবী করেছেন, সর্বসম্মতিক্রমে সে দাবী প্রত্যাখান করা হয়। বৈঠক থেকে বলা হলো, সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরই বর্তমান রাজনৈতিক উত্তরণের একমাত্র উপায়। সভায় প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এম,এম, আহমদের অবিলম্বে অপসারণ দাবী করা হয়। বৈঠক থেকে বলা হ'ল এম,এম, আহমদই বর্তমান অচলাবস্থার জন্য দায়ী।

Scanned by CamScanner

এদিন প্রেসিডেন্টের ডাকে ঢাকায় এলেন আওয়ামী লীগের ছয়-দফা বিরোধী নেতা জনাব কাইয়ুম খান। এ দিনই তিনি দেখা করলেন প্রথমে ভুট্টোর সঙ্গে এবং পরে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে হোটেলে ফিরে তিনি সাংবাদিকদের বললেন যে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তবে তিনি এ সম্পর্কে আর কোন কথা বলবেন না। কাইয়ুম খানের কথা থেকে যেটা বেরিয়ে এল তা মূলতঃ একটি হুমকি, কারণ ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানের যে সমস্যার সমস্যার সমাধানের একটিই মাত্র পথ তাদের জন্য খোলা ছিল তা হল সামরিক হস্তক্ষেপ, অর্থাৎ ইয়াহিয়া–ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কাইয়ুম খানও যে সরাসরি জড়িত তা বুঝা গেল।

সিদ্দিক সালিক তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ে এদিনের বিবরণ দিতে যেয়ে লিখেছেন, "এইভাবে ২৩শে মার্চের সূর্য উদিত হল। তারিখটি ঐতিহাসিক পাকিস্তান দিবসের স্মৃতিবার্ষিকীর দিন। এই দিনে, ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ এই দিনটিকে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করলো। তারা পাকিস্তানের পতাকা পোড়ালো, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি টুকরো টুকরো করে ছিড়লো এবং তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করলো। অন্যদিকে তারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ালো এবং জাঁকজমকের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবির প্রদর্শনী করলো। রেডিও ও টেলিভিশন নতুন জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার বাংলা' গানটি বাজালো। এ শুধু ছাত্রদের তামাশা ছিল না। মুজিব নিজেই এর অংশীদার ছিলেন। সকালে তিনি তাঁর বাড়ীতে একটি ছাত্র প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁর বাড়ীর ছাদে (ডিফ্যাক্টো প্রেসিডেন্ট ভবন) বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের অনুমতি দেন। বাড়ীর সামনে দিয়ে মার্চপাস্ট করে এগিয়ে যাওয়া ছাত্রদলের সালাম গ্রহণ করেন। সারা শহর ছেয়ে যায় তামাটে লাল ও সোনালী রঙের পতাকায়। পাকিস্তানের পতাকা তখন মাত্র দুইটি স্থানে দেখা গেল। একটি উড়ছিল গভর্নমেন্ট হাউসে ও অন্যটি সামরিক আইন সদর দফতরে। কিছু দুষ্ট ছেলে গভর্নমেন্ট হাউসের পশ্চিম প্রবেশ দ্বারে বাংলাদেশের একটি ছোট্ট পতাকা সেঁটে দিয়েছিল। কিন্তু সংযুক্ত পাকিস্তানের প্রতীক হয়ে তখনো প্রধান ভবনের শীর্ষে পাকিস্তানের প্রতাকা পত পত করে উড়ছিল। অবশ্য তাকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছিল। বাঙালী যুবকরা 'জয় বাংলা' শ্লোগানে নগরীর রাজপথ প্রকম্পিত করে তুললো। আসলে দিনটি তাদের স্বাধীনতা দিবস হয়ে ওঠে।"

মার্চ মাসের ঘটনাবলীতে জাতীয় নিরাপত্তা ও সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ প্রধান মেজর জেনারেল গোলাম ওমর এবং আই,এস,আই প্রধান মেজর জেনারেল আকবর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর প্রচন্ডভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন। ২৩শে মার্চের সকল ঘটনাবলীতে উল্লিখিত দুই বিভাগীয় প্রধান সহ কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট তাঁদের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য যে, এদিন শেখ মুজিব বা তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বা তাঁর উপদেষ্টাদের কোনোরূপ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো না।

২৪ মার্চ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় যে, গতকাল (মঙ্গলবার) ২৩শে মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী পতাকা ওড়েনি। সর্বত্রই উড়েছে নতুন বাংলাদেশের পতাকা ও কালো পতাকা। এদিন দি পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় একটি খবরে বলা হয়ঃ

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ দেশ শাসনের ব্যাপারে একটি ঘোষণা দিতে পারেন। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থায় সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং বাংলাদেশ সহ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশে সরকার গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট থাকিবেন।

এদিন শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কোন বৈঠকে বসেন নি। তবে এদিন শেখ মুজিব এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে যে তিনজন উপদেষ্টা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম,

Scanned by CamScanner

জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং ডঃ কামাল হোসেন। বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে জনাব তাজউদ্দিন সাংবাদিকদের জানালেন, উপরোক্ত বৈঠকে তাঁরা তাদের সকল মতামত ব্যক্ত করেছেন। সে জন্যে তাদের দিক থেকে আর কোন বৈঠকের প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, তাঁরা আওয়ামী লীগের বক্তব্য ও 'সম্পূর্ণ পরিকল্পনা'র ব্যাখ্যা দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। জনাব তাজউদ্দিন সাংবাদিকদের কাছে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আরও বলেন, সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে আর কাল-বিলম্ব করলে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে।

এদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে পিপিপি প্রধান জনাব ভুট্টোর একটি বৈঠক প্রেসিডেন্ট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে হোটেলে ফিরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, অলোচনার অগ্রগতি হচ্ছে। আলোচনা চলছে, আমরা সামনে এগুতে পারছি। তিনি বললেন, প্রেসিডেন্ট, আওয়ামী লীগ এবং পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির উপদেষ্টাদের একটি যুক্ত বৈঠক ব্যাপারটিকে আরও তরান্বিত করতে পারতো, কিন্তু এ মুহূর্তে তা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি জানালেন যে, তিনি অখন্ড পাকিস্তানের জন্য আবেগপূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত। তিনি আরও জানালেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা "দুঃখজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক"। তিনি আরো জানালেন, আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় নন, তাঁর দলের এমন কিছু নেতা আজ দুপুরে ঢাকা ত্যাগ করে চলে গেছেন। জনাব ভুট্টো জানান যে, তাঁর এখানে আরো আলোচনার প্রয়োজন আছে। একজন সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যতদিন প্রয়োজন তিনি ঢাকা থাকবেন। আসলে তাঁর ঢাকায় উপস্থিতি ছিল একটি কৌশলমাত্র। তবে, পূর্ব পাকিস্তানে যে দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটতে যাচ্ছে তা তিনি বলেও দিয়েছেন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে।

এদিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাগণ শেখ মুজিবের উপদেষ্টাগণকে বলেছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত আগামী কাল (২৫শে মার্চ) জানাবেন।

এ প্রসঙ্গে বলতে যেয়ে সিদ্দিক সালিক তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন, "২৪শে মার্চ আওয়ামী লীগ একটি নতুন প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলো। আগের শাসনতান্ত্রিক কমিটির প্রস্তাব পরিত্যাগ করে শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনের (সম্মেলন) প্রস্তাব দিল। এই কনভেনশন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে পৃথক পৃথক দু'টি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। জাতীয় পরিষদ এই দু'টি শাসনতন্ত্র নিয়ে বৈঠকে বসবে। দু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেশনে পরিণত করবে। একই দিনে ভুট্টো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলেন। দু'জনেই এই ঐকমত্যে পৌছেন যে, সম্ভবতঃ প্রথমবারের মত নয় যে, আওয়ামী লীগ তার বাজির চাল ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থেকে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ভাঙ্গনের পদক্ষেপ নিয়েছে। জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্যে তারা যে ব্যবস্থাই গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা করুন না কেন কিংবা যা-ই সিদ্ধান্ত নেন না কেন—ঘোষণা করা হল যে, আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী তাজউদ্দিন আহমদ সন্ধ্যায় ঘোষণা করলেন, 'তার দল 'চূড়ান্ত' প্রস্তাব পেশ করেছে এবং এতে নতুন কিছু সংযোজন কিংবা সমঝোতামূলক কিছু করার নেই।' ভুট্টোর সহচররা এবং পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং উপদেষ্টারা করাচীর পথে 'ফেরা' শুরু করলেন। যেমন বুদ্ধিমান পাখীরা আসন্ন ঝড়ের আগেই নিজের নিজের নীড়ে ফিরে যায়।"

এদিন শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাসভবনের সামনে এক সমাবেশে কোনোরূপ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, আমাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত ও স্পষ্ট এবং সেগুলো গ্রহণ করতেই হবে। জনগণ জেগে উঠেছে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ। পৃথিবীর কোন শক্তিই তাদের দাবী দাবিয়ে রাখতে পারবে না। লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। শেখ মুজিব জনগণকে তাদের সংগ্রামে শৃঙ্খলা রক্ষার আহবান জানান। তিনি বলেন যে,

Scanned by CamScanner

জনগণের একটি অংশ জনগণের সংগ্রামে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোয় সচেষ্ট। তিনি বলেন, সৈয়দপুরে তেমন চেষ্টা হয়েছে। তিনি বলেন, আমার মাথা কেনার সামর্থ্য কারো নেই। অন্যেরা শহীদের রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও, আমি করতে পারি না।

শেখ মুজিব বলেন যে, চূড়ান্ত সংগ্রামের নির্দেশ দেয়ার জন্য তিনি বেঁচে থাকবেন কি না তা তিনি জানেন না। জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা অবশ্যই অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। শেখ মুজিব এদিন জনগণকে বলপ্রয়োগ ও অত্যাচার সহ্য না ক'রে তা প্রতিহত করার আহবান জানান।

এদিন চট্টগ্রাম বন্দরে এম,ভি, সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র নামানোর সময় জনগণ বাধা দেয়। জনগণ ব্যারিকেড তৈরী করে। বাঙ্গালী সৈন্যরা জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে সাদা পোষাকে দুর্জয় প্রাচীর গড়ে তুলতে সহায়তা করেন। চট্টগ্রাম বন্দর জনতা ঘিরে রাখে। কয়েক মাইল এলাকায় ব্যারিকেড দেয় জনগণ। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করে। তাতে অন্ততপক্ষে ৩০ জনের মৃত্যু ও অনেক আহতের ঘটনা ঘটে।

সৈয়দপুরে এদিন অবাঙ্গালী ও পাকিস্তানী সৈন্যরা এক হয়ে বাঙ্গালিদের ওপর হামলা চালিয়ে অন্তত ৫০ জনকে হত্যা করে এবং আহত করা হয় কয়েক শতক। রংপুরেও সৈয়দপুরের মত উন্মত্ত হয়ে উঠলো সেনাবাহিনী। সে আক্রমণ গ্রামে পর্যন্ত প্রসারিত হল।

এদিন ঢাকার মীরপুরে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের উপস্থিতিতে যে সকল বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছিল সে সকল বাড়িতে বন্দুক, বোমা ও অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সন্ত্রাসীরা আক্রমণ চালায়। দুপুর ১২-০০ ঘটিকা থেকে ২-৩০ মিঃ পর্যন্ত এসকল আক্রমণ চলে। কিছু কিছু পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়, কোন কোনটি জ্বালিয়েও দেয়া হয়। কোন কোন বাড়িতে আগুন লাগানো হয়। আগের রাতে মীরপুর বাংলা মাধ্যমিক স্কুল বিল্ডিং-এর উপরে বাংলাদেশের পতাকা উড়ানোর কারণে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে সন্ত্রাসীরা নাজেহাল করে এবং তাকে ছুরিকাঘাত করে। পরে ঐ পতাকাটি জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

সারা প্রদেশব্যাপী আক্রমণের অনেক ঘটনা ঘটে। এ সকল ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ঢাকার জনগণ। সারা ঢাকা মানুষের প্রতিবাদী স্লোগানে স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে। সারা প্রদেশে হত্যা ও হামলার প্রতিবাদে ঢাকার মিছিলগুলো জঙ্গিরূপ ধারণ করে।

এদিন খুলনার রক্ষাব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করে তোলার জন্য যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে যানবাহন ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক বিরাট সৈন্যবাহিনী রওনা হয় খুলনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারা বিনা বাধায় আসতে পারেনি। দেশ প্রেমিক জনতা তাদের রুখে দাঁড়িয়েছিল। তারা প্রথম বাধা পায় যশোর জেলার অন্তর্গত নওয়াপাড়ায়। ওরা দ্বিতীয়বার বাধা পায় খুলনা জেলার অন্তর্গত ফুলতলায়। ফুলতলায় প্রায় ১২ ঘন্টা যুদ্ধ চলেছিল। প্রবল আক্রমণের ফলে পাক-সৈন্যবাহিনী যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ভোগ করে। জনতার মধ্য থেকেও অনেকে হতাহত হন। পাক বাহিনীর সঙ্গে ছিল আনুমানিক পঁয়ত্রিশটি গাড়ি বোঝাই অস্ত্রসজ্জিত সৈন্য এবং ষোলটি কামান সজ্জিত জীপ। জনতার আক্রমণের ফলে সকল সৈন্য খুলনা পৌঁছতে পারেনি। একটি অংশ হতাহতদের নিয়ে যশোর ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এদিন এক বিবৃতিতে রাজনৈতিক সমাধান বানচালের চক্রান্ত সফল হতে না দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, লাহোর থেকে একজন পিপলস্ পার্টি নেতা পিপলস্ পার্টির সাথে পরামর্শ না করে কেন্দ্রে সরকার গঠনের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

এদিন পূর্ব পাকিস্তান ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট-এর নির্দেশ ছিল ঃ জবরদস্তির মুখেও সাংবাদিকরা বাহুর কাল ব্যাজ খুলবে না।

Scanned by CamScanner

২৪মার্চ রাতে ঢাকার পিলখানায় অর্থাৎ ই,পি,আর হেড কোয়ার্টারে নিয়োজিত সকল বাঙ্গালী ই,পি,আর সদস্যগণকে নিরস্ত্র করা হয়। ই,পি,আর-এর পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যগণ বাঙ্গালী সদস্যগণকে বলে যে, শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের দাবীকৃত চারদফা দাবী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মেনে নিয়েছেন এবং শিগ্‌গিরই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের এরূপের ভুয়া আশ্বাসে বিশ্বাস করেছিলেন সরলপ্রকৃতির বাঙ্গালী সদস্যগণ। তবে, আক্রমণের আশংকা থাকায় তাঁরা অস্ত্রাগারের একটি ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়েছিল। কিন্তু ২৫ মার্চ রাতে দখলদার বাহিনী আক্রমণের শুরুতেই অস্ত্রাগার দখল করে নিয়েছিল। ফলে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র বের করার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল।

কর্নেল সাফায়াত জামিল তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন, "২৪ মার্চ বিকেলে ঢাকা থেকে আমার স্ত্রী রাশিদা ফোন করলো। কুশলাদি বিনিময়ের পর রাশিদা বললো, 'ঢাকায় যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধ তোমাদেরকে করতেই হবে। সময়মত সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করো না।"

একজন গৃহিণী উপলব্ধি করতে পারছেন পরবর্তীতে কি হতে যাচ্ছে। অথচ সবকিছু দেখে এবং সে-সঙ্গে বিভিন্ন সেনা ছাউনি, ইপিআর ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত খবরাখবর পেয়েও আমাদের রাজনৈতিক নেতারা কোনরূপ সিদ্ধান্ত নিতে বা দিতে পারছেন না। তখনও তাঁরা স্বপ্ন দেখছেন ছয়-দফা আদায়ের এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠনের।

২৪শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ নেতাদের অবিলম্বে ঢাকা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন।

২৫ মার্চ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক সংবাদ বিবৃতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি শিপিং কোম্পানিগুলোকে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, বাংলাদেশের মালামাল পরিবহণ প্রত্যাখ্যান করা চলবে না। আমদানির ক্ষেত্রে লেটার অব ক্রেডিটে উল্লেখ্য গন্তব্যস্থান পরিবর্তন করা যাবে না। ১লা মার্চ থেকে পিআইএ-র যে সব পার্সেল ও ডকুমেন্টস্ বিলিবন্টন বন্ধ ছিল তা বিলিবন্টনের সিদ্ধান্ত দেয়া হল। ম্যানিলা ও লন্ডনের মাধ্যমে বিদেশের সঙ্গে তার-যোগাযোগ সম্পাদনের অনুমতি দেয়া হল। টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন এবং টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপ যথারিতি চালুর নির্দেশ দেয়া হ'ল।

এদিন শেখ মুজিবুর রহমান অপর একটি বিবৃতির মাধ্যমে সৈয়দপুর, রংপুর এবং জয়দেবপুরে জনতার উপর সেনাবাহিনীর নির্বিচার গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২৭শে মার্চ শনিবার সারা দেশব্যাপী হরতাল আহবান করেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, নিরস্ত্র জনগণের উপর নৃশংসতা ও হত্যা আমরা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেব না। ২৭ মার্চ আহূত হরতাল থেকে যা যা মুক্ত থাকবে বলে বলা হলো তা হ'ল, হাসপাতাল, এ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তারের গাড়ী, ঔষধের দোকান, পত্রিকা ও পত্রিকার কাজে নিয়োজিত গাড়ী, পানি, গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ।

২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি স্থানে বাঙালী অবাঙ্গীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। অবাঙ্গালিরা অনেক যায়গায় সামরিক কর্তৃপক্ষের মদদ পায়।

২৫শে মার্চ বেলা একটার সময় মেজর জামিল, জেনারেল স্টাফ অফিসার, হেডকোয়ার্টার ই-পি-আর ই-পি-আর-এর বাঙ্গালী অফিসার মেজর দেলোয়ার হোসেনকে অফিসে ডেকে নিয়ে তিনটা পর্যন্ত অফিসিয়াল আলাপের অভিনয় করে এবং তিনটার সময় মেজর দেলোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করে।

এদিন পূর্ব পাকিস্তানের শহরবাসী জনগণের মধ্যে সচেতন অংশের অনেকেই অনুমান করছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শক্তির প্রয়োগ করতে পারে, শেখ মুজিবুর রহমান সহ আওয়ামী লীগের নেতাদের গ্রেফতার করতে পারে।

Scanned by CamScanner

অন্যদিকে ঢাকাবাসীগণ এদিন দুপুরের পর থেকেই তাদের অভিমত ব্যক্ত করতে শুরু করলেন, তারা বলতে লাগলেন যে, সামরিক আক্রমণ হতে যাচ্ছে। যতই সময় এগোতে থাকল ততই মানুষের চিন্তাগুলো দানা বাঁধতে থাকলো। বৈকালের দিকে দেখা গেল যে, অধিকাংশ লোকই আজই সামরিক আক্রমণ হতে পারে বলে মনে করতে লাগলেন। তবে সে আক্রমণ যে গণ-হত্যার দিকে ধাবিত হবে তা হয়ত তারা অনুধাবন করতে পারেন নি। বিভিন্ন সেনা ছাউনি থেকে চঞ্চলতার খবরাখবর ছড়িয়ে পড়তে থাকল। চিন্তাশীল মানুষ সন্ধ্যার পরে মোটামুটি বুঝে নিলেন যে সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে আজই। শুধু বুঝতে পারলেন না তার তীব্রতা ও ভয়াবহতার মাত্রা। ভয়াভিভূত অবস্থায়ই তারা যার যার অবস্থানে ঠাঁই নিলেন।

২৪ মার্চের শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাগণের মধ্যে বৈঠকের বক্তব্য অনুসারে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের পক্ষ থেকে যে সিদ্ধান্ত আজ (২৫ মার্চ) জানানোর কথা, তা জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর উপদেষ্টাগণ। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত কোনোরূপ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হিসেবে না এসে শেষ পর্যন্ত যা এলো তা হ'ল, পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি মানুষকে অবদমনের জন্য সামরিক জান্তার সুপরিকল্পিত গণ-হত্যার বার্তা। আর এ অবদমনের পথ পরিষ্কার করার লক্ষ্যে প্রথমেই ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছাড়া সকল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিভিন্ন কোম্পানীগুলোকে পৃথকীকরণ করে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করা হয়েছিল ভাগ-ভাগ করে। ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ২৫ মার্চের পূর্বেই ঢাকায় নিরস্ত্র করে। তাছাড়া ঢাকায় অবস্থানরত ৬০৪ ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিট, সিগনাল রেজিমেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন, ৬০৪ কম্বাইন্ড ওয়ার্কশপ, ১৪৭ ইনফ্যান্ট্রি ওয়ার্কশপ, সাপ্লাই ও ট্রান্সপোর্ট ব্যাটালিয়ন, স্টেশন সাপ্লাই ডিপো, গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী, কম্বাইন্ড অর্ডন্যান্স ডিপো, স্টেশন সাপ্লাই ডিপো, ট্রানজিট ক্যাম্প, ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স এবং পাকিস্তান বিমান বাহিনীর নিম্ন পদের সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্যদেরকে বিভিন্ন কায়দায় ও চালাকি করে নিরস্ত্র করে নিয়েছিলো।

এদিন অর্থাৎ, ২৫ মার্চ রাত আটটায় একটি বোয়িং বিমানে আরোহন করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করলেন। এটা যত গোপনেই হোক না কেন, আওয়ামী লীগ নেতারাও তা জেনেছিলেন। যদিও একথা সত্য যে, জনতার চোখে ধূলো দেয়ার জন্যে কিছু কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা মুহাম্মদ নূরুল কাদিরের বক্তব্য থেকেও জানা যায় যে, সন্ধ্যার কিছু আগে 'রাতে আর্মি মুভ করতে পারে' শেখ মুজিব তা জেনেছিলেন। আর ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম পরিষ্কার ভাষায়ই বলেছেন যে, "২৪শে মার্চ বিকেল থেকেই বঙ্গবন্ধু সকলকে ঢাকা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেন"; ২৫শে মার্চ "বৈঠকে আত্মগোপনের জন্য আমরা সকলে বঙ্গবন্ধুকে চাপ দেই"। শেখ মুজিবুর রহমান আত্মগোপন করতে রাজি হননি। ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম আরও বলেছেন, "আমরা সংক্ষেপে শহরের অবস্থা জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের সাথে চলে যাবার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানাই। ... শহরের অবস্থার কথা শুনে তিনি বলেন, আমার কাছে সব খবর আছে। ইয়াহিয়া খান ঢাকা ছাড়ার পরই আক্রমণ শুরু হবে।" জনাব মওদুদ অহমেদ-এর বক্তব্য থেকেও জানা যায় যে, প্রেসিডেন্টের পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগের এবং সেনাবাহিনীর অভিযানের পরিকল্পনা শেখ মুজিবকে জানানো হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, তারপরও তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন না কেন?

দ্বিতীয়তঃ, শেখ মুজিব যখন ২৪ মার্চ বিকেল থেকেই তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার তথা আত্মগোপনের নির্দেশ দিলেন, ২৫ মার্চ তিনি যখন বললেন যে, ইয়াহিয়া ঢাকা ছাড়ার পরই আক্রমণ শুরু হবে, তখন জনগণের বলে কথিত নেতা জনগণকে তা না জানিয়ে তিনি শুধু ব্যস্ত থাকলেন নিজ আত্মসমর্পণ এবং তাঁর নেতাদের আত্মগোপন নিয়ে! বিংশ শতাব্দির পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপের নজীর আছে কি না, আমাদের জানা নেই।

Scanned by CamScanner

শেখ মুজিবুর রহমান 'রাতে আর্মি মুভ করতে পারে' আভাস পাওয়ার পরেও সুপ্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত একটি সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে দেয়ার জন্য রাস্তায় 'ব্যারিকেড যুদ্ধের' যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন তা শুধু ছেলেখেলাই নয়, হাস্যকরও বটে। তাঁর সে প্রস্তুতির বিবরণ দেয়ার জন্য এখানে আমরা মুহাম্মদ নূরুল কাদির রচিত একটি বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

মুহাম্মদ নূরুল কাদির "দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা" বইয়ে লিখেছেন, "সন্ধ্যার কিছু আগে 'রাতে আর্মি মুভ করতে পারে' এমন একটা আভাস পাওয়ার পর, বঙ্গবন্ধু আমাকে আদেশ দিলেন—ঢাকার সব কয়টা ইউনিয়ন ঘুরে, ইউনিয়ন নেতাদের নিকট, সকল রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করার নির্দেশ, তখনই পৌঁছে দেয়ার জন্যে। ...সন্ধ্যা থেকে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত ঢাকা শহরের সব কয়টি ইউনিয়ন ঘুরে ইউনিয়ন নেতাদের নিকট রাতে ভালভাবে সকল রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করার বঙ্গবন্ধুর আদেশ পৌঁছে দিলাম। সবার শেষে রাজারবাগ ইউনিয়নে খবরটি পৌঁছে দিয়ে বড় একটা কাজ করেছি ভেবে, আত্মতৃপ্তিতে কিছুটা গর্বিতভাবে, মাঝরাতের সামান্য আগে যখন বাড়ি ফিরছিলাম, ঠিক তখনই এক অকল্পনীয় অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে, ভয়ে-বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।"

তিনি লিখেছেন, "গোলাগুলির প্রচন্ড আওয়াজ ও আকাশে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে মনে হলো—পশ্চিম পাকিস্তানী সশস্ত্র সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য, সন্ধ্যা থেকে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত ঢাকার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় যে অতি সাধারণ ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছিল, আসলে তা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সন্ধ্যা থেকে ঢাকার সকল ইউনিয়নের প্রায় সকল রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করতে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীগণ সাধারণত ঠেলাগাড়ি, রিক্সা, ভ্যান, গাছের গুড়ি, ইট, পাথর, সিমেন্টের মোটা পাইপ, বেড়া, বাঁশ ইত্যাদি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গোলার প্রচন্ড আঘাতে সেই সব ব্যারিকেড তুলোর মত উড়ে গিয়েছিল।"

২৪শে মার্চের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবের উপদেষ্টাদের মধ্যকার শেষ বৈঠকের পর আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব যে ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা জেনারেল পীরজাদার তরফ থেকে একটা চূড়ান্ত বৈঠকে যোগ দেয়ার আহবানের অপেক্ষা করছিলেন, সে প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের তৎকালীন উপদেষ্টা ডক্টর কামাল হোসেনের The Daily News পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাতকারের (যা উক্ত পত্রিকায় ২৬ মার্চ, ১৯৮৭ প্রকাশিত হয়) অংশবিশেষ উল্লেখ্য, তিনি বলেন ঃ

"২৪শে মার্চ সকাল পর্যন্ত খসড়া ঘোষণার অর্থনৈতিক ধারাগুলো এক এক করে ক্লজ বাই ক্লজ পাঠ ও পর্যালোচনা সমাপ্ত হলো। অতঃপর আওয়ামী লীগ টিম যখন ২৪শে মার্চ বিকেলের আলোচনা বৈঠকে যোগদানের জন্যে প্রেসিডেন্ট হাউজে যাত্রা করছিলেন, তখন শেখ মুজিব ইংগিত দিলেন যে, রাষ্ট্রের নাম আমাদের "কনফেডারেশন অব পাকিস্তান" প্রস্তাব করা উচিত। তিনি বললেন, তাঁদের আমাদের বুঝানো উচিত জনগণের যে সেন্টিমেন্ট তার কারণেই এটা প্রয়োজন। এই প্রস্তাব অংশত স্বাধীনতার জনপ্রিয় দাবীর প্রতিফলন যা বিশেষ করে গণ আন্দোলনের অগ্রবাহিনী মিলিট্যান্ট যুবকরা চাইছিল। এই প্রস্তাব যখন সরকারী পক্ষের কাছে পেশ করা হলো, তারা এর তীব্র বিরোধিতা করল এই বলে যে, আমাদের অবস্থানের এটা মৌলিক পরিবর্তন। আমরা যুক্তি দিলাম যে, সব বিষয় ও নীতিমালা যখন ঠিক থাকছে, নিছক নামের একটা পরিবর্তন মৌলিক পরিবর্তন হয় না। মনে হল বিচারপতি কর্ণেলিয়াস আমাদের যুক্তি বুঝলেন। কিন্তু তিনি আমাদের প্রস্তাবের পাল্টা বললেন, "কনফেডারেশন" এর বদলে "ইউনিয়ন" শব্দ গ্রহণ করা যেতে পারে। এরপর আওয়ামী লীগ টিম মত প্রকাশ করল যে, মতপার্থক্যটা একটা শব্দ নিয়ে, এই মতপার্থক্যটা যদি আমরা দূর করতে না

Scanned by CamScanner

পারি, তাহলে বিষয়টার সমাধান শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার বৈঠকে হবে, যখন খসড়া ঘোষণার চূড়ান্ত করণ করা হবে।

এটা মনে হয়েছিল, ২৪শে মার্চের বিকেলের বৈঠক তাঁদের শেষ বৈঠক হবে, যেখানে আলোচনা উপসংহারে পৌঁছবে। কারণ আলোচনা চালিয়ে যাবার মত পয়েন্ট আর কমই আছে।

২৪শে মার্চ বিকেলের আলোচনা বৈঠকে খসড়া ঘোষণার সব ক্লজ ও সিডিউল এক সাথে পড়া সম্পূর্ণ হলো। আমি তখন জরুরী বিষয় হিসেবে পীরজাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, খসড়া কখন চূড়ান্ত করা হবে? আওয়ামী লীগ পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হলো, আমি ও কর্ণেলিয়াসকে আজ রাতেই খসড়া ঘোষণা চূড়ান্ত করার জন্যে বসা দরকার যাতে পরের দিন সকালেই এটা ইয়াহিয়া ও মুজিবের কাছে পেশ করা যায়। কর্ণেলিয়াস এই প্রস্তাবের সাথে একমত হলেন। কিন্তু জেনারেল পীরজাদা বললেন, "না, আজ আমাদের আরও কাজ আছে, আপনারা আগামী কাল সকালে বসতে পারেন।" আমি আবার পরামর্শ দিলাম, "কাল কটায় বৈঠক হবে তা ঠিক করা হোক।" কিন্তু জেনারেল পীরজাদা পুনরায় বাধা দিয়ে বললেন, "এটা টেলিফোনেই ঠিক করা যাবে এবং তার সাথে এ ব্যাপারে ফোনে যোগাযোগ করা হবে।" তারপর পীরজাদা আমার দিকে ফিরে বললেন, "কখন ঘোষণাটি চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে করেন?" উত্তরে আমি বলালাম, "আগামী পরশুর আগেই এটা হয়ে যাওয়া উচিত।" এই সময় তাজউদ্দিন বললেন, "আওয়ামী লীগ টিম মনে করে তারা প্রত্যেকটি বিষয়ই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, আর আলোচনার কোন বিষয়ই অবশিষ্ট নেই। যা এখন বাকি তা হল, খসড়া ঘোষণা শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার কাছে অনুমোদনের জন্যে পেশ করা। অনুমোদন হয়ে গেলেই প্রেসিডেন্টের ঘোষণা জারি হতে পারে।" তাজউদ্দিন-এর এই কথাটিকেই পরে এইভাবে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ আলোচনা ভেঙ্গে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এর মধ্যে সত্যের কোন নাম-গন্ধ নেই। যখন বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে, তখন তো বাকি ছিল শুধু শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার কাছে অনুমোদনের জন্যে পেশ করণার্থে খসড়া ঘোষণার চূড়ান্তকরণ করার কাজটিই।

দুর্ভাগ্যজনক ২৫শে মার্চের গোটা দিন আমি পীরজাদার টেলিফোনের অপেক্ষা করেছি। কিন্তু সে টেলিফোনটি কখনই এলো না। অবশেষে ২৫ মার্চের রাত ১০টা ৩০ মিনিটের দিকে আমি উঠে বাড়ী ফেরার জন্যে শেখ মুজিবের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম, তখন শেখ মুজিব টেলিফোনটি পেলাম কি না জিজ্ঞেস করলেন। পাইনি তা আমি তাকে জানালাম।"

২৫শে মার্চ ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমানের সবচাইতে কাছের মানুষ তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসার ভাষ্য বিবেচনার দাবী রাখে। ১৯৭২ খ্রীঃ ২৬ মার্চ দৈনিক বাংলা পত্রিকার প্রথম পাতায় "প্রথম থেকেই ইয়াহিয়া পশুটাকে আমি বিশ্বাস করতাম না ঃ বেগম মুজিব" শিরোনামে বেগম মুজিবের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারে বেগম মুজিব যা বলেন তা হ'ল ঃ

"অসহযোগ আন্দোলনের সেই অনন্য দিনগুলো। ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাংলার মানুষ এক হয়ে গেছে। ঠিক এমনি মুহূর্তে আলোচনার প্রস্তাব নিয়ে ইয়াহিয়া চক্র বাংলায় এলো। প্রথম থেকেই পাকিস্তানী নৃশংস এ পশুটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। আলোচনা বৈঠকে প্রথম থেকেই এক অশুভ কালো ছায়াকে আমি যেনো দেখতে পেয়েছিলাম সেদিনের জাগ্রত বাংলার অঙ্গনে। শেখ সাহেবকেও আমি বলেছিলাম যারা তাঁকে আগরতলা মামলায় জড়িয়েছে, তারা ভালোভাবেই জানে যে, শেখ সাহেব বাংলাদেশ আর বাঙালীদের চিন্তা-ভাবনাই করেন—পাকিস্তান প্রশ্নে তার আগ্রহ নেই। পাকিস্তানের ক্ষমতা তারা শেখ সাহেবকে দেবে না। কাজেই আলোচনা আরম্ভ

Scanned by CamScanner

করে তারা অন্য কোনো নতুন কৌশল বের করার সুযোগ খুঁজছে মাত্র। আমার কথা শেখ সাহেব শুনলেন। মুখে কিছুই বললেন না। তিনি দলীয় নেতাদের বৈঠক ছাড়া বাইরে তেমন কিছু বলতেন না তখন।

গত বছর ২৫ মার্চের (অর্থাৎ একাত্তরের ২৫ মার্চ) সকাল থেকে বাড়ির অবস্থা ভার ভার লাগছিল। দুপুর তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। আমাদের বাসার সামনে দিয়ে সৈন্য বোঝাই দুটো ট্রাক চলে গেল। দোতলা থেকেই ট্রাকগুলো দেখে আমি নিচে নেমে এলাম। শেখ সাহেব তখনও আগত লোকদের সাথে কথাবার্তায় ব্যস্ত। তাকে ভেতরে ডেকে মিলিটারি বোঝাই গাড়ি সম্বন্ধে বলতেই দেখলাম পলকের তরে মুখটা তার গম্ভীর হয়ে গেল। পরক্ষণেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত দিনটা কেটে গেল থমথমে ভাবে। এলো রাত। সেই অশুভ রাত। রাত সাড়ে আটটায় তিনি সাংবাদিকদের বিদায় দিলেন। আওয়ামী লীগ সহকর্মীদেরও কিছু কিছু নির্দেশ দিয়ে দ্রুত বিদায় দিলেন।

রাত প্রায় ১০টার কাছাকাছি কলাবাগান থেকে এক ভদ্রলোক এসে শেখ সাহেবের সামনে একেবারে আছড়ে পড়লেন। তাঁর মুখে শুধু এক কথা আপনি পালান। বঙ্গবন্ধু পালান। ভেতর থেকে তাঁর কথা শুনে শংকিত হয়ে উঠলো আমারও মন। বড় মেয়েকে তার ছোট বোনটা সহ তার স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। যাবার মুহূর্তে কি ভেবে যেনো ছোট মেয়েটা আমাকে আর তার আব্বাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলো। শেখ সাহেব তার মাথায় হাত বুলিয়ে শুধু বললেন—বিপদে কাঁদতে নেই মা।

তখন চারদিকে সৈন্যরা নেমে পড়েছে। ট্যাংক বের করেছে পথে। তখন অনেকেই ছুটে এসেছিল ৩২ নং রোডের এ বাড়িতে। বলেছিল—বঙ্গবন্ধু আপনি সরে যান। উত্তরে দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়েছিলেন তিনি—না, কোথাও অমি যাবো না।

রাত ১০টা থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। দূর থেকে তখন গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। দেখলাম প্রতিটি শব্দ-তরঙ্গের সাথে সাথে শেখ সাহেব সমস্ত ঘরটার মাঝে পায়চারী করছিলেন। অস্ফুটভাবে তিনি বলছিলেন—এভাবে বাঙালীকে মারা যাবে না—বাংলা মরবে না। রাত ১২টার পর থেকেই গুলির শব্দ এগিয়ে এলো। ছেলেমেয়েদের জানালা বন্ধ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম পাশের বাড়িতে সৈন্যরা ঢুকে পড়েছে। স্পষ্ট মনে আছে এ সময় আমি বাজের মতোই এক ক্রুদ্ধ গর্জন শুনেছিলাম—গো অন, চার্জ.... সেই সাথে সাথেই শুরু হলো অঝোরে গোলাবর্ষণ। এ তীব্র গোলাগুলির শব্দের মধ্যেও অনুভব করলাম সৈন্যরা এবার আমার বাড়িতে ঢুকেছে। নিরুপায় হয়ে বসেছিলাম আমার শোবার ঘরটাতে। বাইরে থেকে মুষলধারে গোলাবর্ষণ হতে থাকলো এ বাড়িটা লক্ষ্য করে। ওরা হয়তো এ ঘরটার মাঝেই এমনিভাবেই গোলাবর্ষণ করে হত্যা করতে চেয়েছিল আমাদেরকে। এমনভাবে গোলা বর্ষিত হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল সমস্ত বাড়িটা বোধহয় ধ্বসে পড়বে। বারুদের গন্ধে মুখচোখ জ্বলছিল। আর ঠিক সে দুরন্ত মুহূর্তটাতে দেখছিলাম ক্রুদ্ধ সিংহের মতো সমস্ত ঘরটার মাঝে অবিশ্রান্তভাবে পায়চারি করছিলেন শেখ সাহেব। তাকে ঐভাবে রেগে যেতে কখনো দেখিনি।

রাত প্রায় সাড়ে ১২টার দিকে ওরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে উপরে উঠে এলো। এতক্ষণ শেখ সাহেব ওদের কিছু বলেননি। কিন্তু এবার অস্থিরভাবে বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সামনে। পরে শুনেছি সৈন্যরা সেই সময়ই তাঁকে হত্যা করে ফেলতো যদিনা কর্নেল দুহাত দিয়ে তাকে আড়াল করতো। ধীর স্বরে শেখ সাহেব হুকুম দিলেন গুলি থামাবার জন্য। তারপর মাথাটা উঁচু রেখেই নেমে গেলেন তিনি নিচের তলায়।

Scanned by CamScanner

মাত্র কয়েক মুহূর্ত। আবার তিনি উঠে এলেন উপরে। মেজ ছেলে জামাল এগিয়ে দিল তার হাতঘড়ি ও মানিব্যাগ। স্বল্প কাপড় গোছানো স্যুটকেস আর বেডিংটা তুলে নিল সৈন্যরা। যাবার মুহূর্তে একবার শুধু তিনি তাকালেন আমাদের দিকে। পাইপ আর তামাক হাতে নিয়েই বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সাথে।"

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের সাংবাদিক জ্যোতি সেনগুপ্ত তাঁর "বাংলাদেশ : ইন ব্লাড অ্যান্ড টিয়ারস" বইয়ে দেখিয়েছেন ঃ

আগের রাতে ১৯৭১ সালে ২৪ মার্চ গোয়েন্দাসূত্র আওয়ামী লীগকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হামলার কথা জানিয়ে দেয়। জেনারেল ওসমানী ধানমন্ডির বাসভবনে আসেন শেখ-এর সঙ্গে দেখা করতে এবং তিনি তাকে একই খবর দেন। ওই দিন শেষ রাত পর্যন্ত করণীয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তারা আত্মগোপন করবেন এবং পালিয়ে ভারতে চলে যাবেন। কিন্তু ২৫ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তাজউদ্দিন এসে দেখেন তিনি তাঁর বিছানাপত্র গুছিয়ে তৈরি হয়ে আছেন। মুজিব তাঁকে বললেন যে, তিনি থেকে যাবেন—গ্রেফতার বরণ করবেন।

এদিকে এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস তাঁর "দি রেপ অব বাংলাদেশ" বইয়ে লিখেছেনঃ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ৮ টায় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি দ্রুত সাইকেল রিক্শা চালিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে আসে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনের সামনে এসে থামে। তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধুর জন্য একটি জরুরী চিরকুট নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে নিজেই প্যাডেল মেরে এসেছেন। বাংলায় লেখা স্বাক্ষরবিহীন সে বার্তাটি ছিল সংক্ষিপ্ত ঃ "আপনার বাসভবনে আজ রাতেই হামলা চালানো হবে।"

জনাব মওদুদ আহমেদ তাঁর Bangladesh : Constitutional Quest for Autonomy বইয়ে লিখেছেন, "২৫শে মার্চ বিকেলে মুজিব ক্যান্টনমেন্ট সোর্সে জানতে পারলেন যে, রাজনৈতিক সমাধানের কোন সম্ভাবনা নেই এবং সেনাবাহিনী তার অভিযানের জন্যে তৈরী হচ্ছে। বিকেলে ঐ একই উৎস থেকে মুজিবকে বলা হলো, ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করছেন। সেনাবাহিনীর আসন্ন অভিযানের রকম প্রকৃতি শেখ মুজিব অনুমান করতে পারলেন না। তিনি তাঁর চারদিকের সহকর্মীদের তৎক্ষণাৎ ঢাকা শহর থেকে সরে যাবার পরামর্শ দিলেন এবং তোফায়েল, রাজ্জাক প্রমুখ যুব নেতাদের বুড়িগঙ্গার ওপারে গ্রামাঞ্চলে সরে যেতে বললেন।"

এ প্রসঙ্গে জনাব অলি আহাদ তাঁর "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫" বইয়ে লিখেছেন, "এমনি কাফেলার সঙ্গী হইয়া পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি নেতা জনাব মনসুর আলী সহ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের যুবক সদস্য ডাঃ আবু হেনা নদী পাড়ি দেন এবং অপরতীরে জিঞ্জিরা পথে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামানের সহিত তাঁহাদের মোলাকাত হয়। তাঁহারা একই সঙ্গে কলাতিয়ার জনাব রতন সাহেবের বাড়ীতে আথিত্য গ্রহণ করেন। পূর্বাহ্নে ঐ বাড়ীতে শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাত্রে নূরে আলম সিদ্দিকী ও আবদুল কুদ্দুস মাখনও আশ্রয় সন্ধানে ঐ বাড়ীতে আসেন।"

সঙ্গত কারণেই এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের নেতাদের বুড়িগঙ্গার অপর পারে যাওয়ার তথা আশ্রয় নেয়ার বিষয়টি যেভাবেই হোক হয়তো পাকিস্তান দখলদার

Scanned by CamScanner

বাহিনীর কাছে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী জিঞ্জিরাসহ ওপারের ব্যাপক এলাকায় তোপ দাগিয়ে ব্যাপক ধ্বংস সাধন করেছিল, সে সঙ্গে চালিয়েছিল ব্যাপক গুলিবর্ষণ। তাতে বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংসের সঙ্গে অনেক লোক হতাহত হয়েছিল, ২৬ মার্চ বোট থেকেও গোলা বর্ষণ করা হয়েছিল।

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম "মুক্তিযুদ্ধ ঃ শত্রু-মিত্রের সন্ধানে হৃদয়ে বাংলাদেশ" প্রবন্ধে লিখেছেন, "পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পাশবিক হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিরাপদ স্থানে সরে যেতে অস্বীকার করেন এবং পাকিস্তানীদের হাতে গ্রেফতার হন। তাজউদ্দিন আহমদ ২৭শে মার্চ পর্যন্ত ঢাকা শহরে আত্মগোপন করে থাকার পর ব্যারিষ্টার আমীর-উল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন এবং ২৯শে মার্চ সন্ধ্যায় নানা জনপদ ঘুরে ঝিনাইদহে এসে উপস্থিত হন। ৩০শে মার্চ ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মাহবুবউদ্দিন-সহ একটি জীপে চড়ে চুয়াডাঙ্গা আসেন। ঐ দিনই বিকেলে তাজউদ্দিন ও ব্যারিষ্টার ইসলাম মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই এলাহী চৌধুরী ও মাহবুবউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন। প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পঁচিশে মার্চের পর এটাই প্রথম যোগাযোগ। ভারতীয় বি এস এফ-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা গোলক মজুমদারের সহায়তায় তাজউদ্দিন ও ব্যারিষ্টার ইসলাম সীমান্ত অতিক্রম করে কোলকাতা যান এবং ঐ রাতেই সেখান থেকে একটি সামরিক বিমানে করে তাঁরা দিল্লী চলে যান।" (আজকের কাগজ ঃ ঢাকা, সোমবার ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৯৮)।

দিনাজপুরের এম,এন,এ, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নির্বাচিত চীফ হুইপ) ২৫শে মার্চে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর আলাপ প্রসঙ্গে বলেন, "২৫শে মার্চ সন্ধার পর আমি বাসা থেকে বেরুচ্ছি আওয়ামী লীগ অফিসে যাওয়ার জন্য। হঠাৎ বাইরের ঘরে ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরতেই বঙ্গবন্ধুর সেই ভারী গলা—তিনি দিনাজপুরের অবস্থা জানতে চাইলে সংক্ষেপে জানিয়ে বললাম, ঢাকার অবস্থা কি? তিনি বললেন, মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করো। আরেকবার ঢাকার কথা জানতে চাইলে তিনি আবার বললেন "সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যাবে" বলেই ফোন ছেড়ে দিলেন। অন্যান্য দিন অন্তঃত দু'এক কথায় ঢাকার অবস্থা তিনি জানাতেন কিন্তু আজ কেন কিছুই বললেন না ভেবে মনটা অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠলো। এরপর আওয়ামী লীগ অফিসে কয়েকজন বসে আছি। অনিশ্চিত ও থমথমে অবস্থা। ... যা হোক রাত তখন ঠিক ১২টা ৩ মিনিট। হঠাৎ গুলির শব্দ। ... আওয়ামী লীগ অফিসে থাকাটা আমরা নিরাপদ মনে করলাম না। সবাই আপনাপন বাড়ীর দিকে দ্রুত রওয়ানা হলাম। ...ভাবলাম এস,পি-র কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করি প্রকৃত ব্যাপারটা কি, ফোন তুলেই দেখি লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। হতভম্ব হয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে থানার দিকে পায়ে হেটে এগিয়ে গেলাম। অতিরিক্ত এস,পি-কে পেলাম তিনিও বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। শুধু এটুকু বললেন, মিলিটারীরা ট্রাকে করে বেরিয়ে এলোপাথারি গুলি করে বেড়াচ্ছে। এমনকি জিলা স্কুলের কাছে রাত্রিকালীন পাহারারত পুলিশের গাড়ীর দিকেও লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে।"

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা এম,এম, আহমদ ২৫ মার্চ চলে গেছেন ঢাকা ত্যাগ করে। শেখ মুজিবুর রহমানের উপদেষ্টাগণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে সেদিন ব্যর্থ হন।

দিনাজপুর জেলা থেকে নির্বাচিত এম,এন,এ, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান-এর নিকট থেকে জানা যায় যে, এদিন দিনাজপুর ইপিআর বাহিনীর একজন সুবেদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর

Scanned by CamScanner

আক্রমণের পূর্বেই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং পাকসৈন্যদের (অর্থাৎ, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের) হত্যার জন্যে তাঁর এবং জেলা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী অধ্যাপক ইউসুফ আলীর কাছে অনুমতি চান। কিন্তু তাঁরা সুবেদার-এর প্রস্তাবে রাজী হন নি।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা ছেড়ে করাচীর পথে রওয়ানা দেয়ার আগেই আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল। সে লক্ষ্যে ২৫ মার্চের আগেই চট্টগ্রামে অবস্থিত তৎকালীন সর্বোচ্চ বাঙ্গালী সেনা অফিসার বিগ্রেডিয়ার মজুমদারকে ২৪শে মার্চ ঢাকায় কৌশলে ডেকে এনে আক্রমণ পরিকল্পনাকারীদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছিল। পরে তাঁকে এবং আরো দু'জন সিনিয়র অফিসার ২-ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাসুদুল হাসান এবং গভর্ণরের ইন্সপেকশন টীমের লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াসিনকে সামরিক কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করেছিল। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সঙ্গে মেজর আমিন আহমদ চৌধুরীকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল। অন্যদিকে, আর একজন সিনিয়র অফিসার ই-বি-আর-সির চীফ ইন্সট্রাক্টর লেঃ কর্নেল এম,আর,চৌধুরী ২৫শে মার্চ থেকে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। এর দুদিন আগে তিনি হাতে ব্যথা পেয়েছিলেন। তৎকালীন ক্যাপ্টেন এনামুল হক চৌধুরীর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে ২৫শে মার্চ সকালে লেঃ কর্নেল এম,আর,চৌধুরী তাঁকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জোয়ানদের দিয়ে দিতে বলেন। তবে, ২৫ তারিখ রাতের হত্যালীলা থেকে সহজেই অনুমিত যে তা পালন করা সম্ভব হয় নি। সেই ভয়াবহ রাতে ক্যাপ্টেন এনামুল সেনানিবাস থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

২৫ মার্চ রাত ১০-৩০ মিনিটের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী দখলদার বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিগ্রেডিয়ার আরবারের অধীন ৫৭ বিগ্রেডের সাঁজোয়া, গোলন্দাজ, পদাতিক বাহিনীর সমন্বয়ে ২২ বালুচ রেজিমেন্ট, ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ১৩ লাইট এ এ রেজিমেন্ট, ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে বের হয়ে রাস্তায় পেতে রাখা ব্যারিকেড ভাংতে ভাংগে ফার্মগেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রতিরোধের মুখে জনতার ওপর ব্যাপক গোলাগুলি চালায়। প্রথম গোলাগুলি শুরু হয় রাত এগারোটার দিকে। এদিকে যে সকল সৈন্যরা ঢাকা শহরের ভেতরে আগে থেকেই বিভিন্ন সরকারী স্থাপনায় পাহারা দিচ্ছিল যেমন, রেডিও এবং টেলিভিশন কেন্দ্র, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, স্টেট ব্যাংক প্রভৃতি, তারাও রাত ১০-৩০ মিনিট থেকে নির্দিষ্ট সময়ে আঘাত হানার জন্যে ছিল প্রস্তুত। এ সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪০ হাজারে দাঁড়িয়েছিল বলে জানা যায়।

প্রথম পর্বে দখলদার বাহিনীর আক্রমণের মূল টার্গেট হয় বাবুপুরা বস্তি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, ইপিআর হেড কোয়ার্টার (পিলখানা), রাজারবাগ পুলিশ লাইনস (পুলিশ হেড কোয়ার্টার), নবাবপুর এলাকা, পুরনো ঢাকা বিশেষত শাখারিপট্টি ইত্যাদি কেন্দ্রগুলো। দখলদার বাহিনী প্রথম বড় বাধার সম্মুখীন হয় ফার্মগেটে। জনতা সেখানে ব্যারিকেড দিয়ে "জয় বাংলা", "জয় বাংলা" বলে স্লোগান দিচ্ছিলেন। সে এলাকায় ঐ সময়কার বিবরণে সিদ্দিক সালিক তার পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন, "মুহূর্তে রাইফেলের গুলীর কিছু শব্দ 'জয় বাংলা' স্লোগানের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেল। একটু পরেই একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বিস্ফোরণ বাতাসে তীক্ষ্ণ শব্দ তুললো। এরপর কিছুক্ষণ ধরে গগনবিদারী স্লোগান ও গুলীর শব্দের সঙ্গে হালকা মেশিনগানের কিচিরমিচির আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসতে থাকলো। পনের মিনিট পর গোলমালের শব্দ কমে

Scanned by CamScanner

এলো এবং স্লোগান ক্ষীণতর হতে হতে এক সময় থেমে গেল। স্পষ্টতঃই অস্ত্র বিজয়ী হল। সেনাদল শহরের ভেতর এগিয়ে গেল।" সহজেই অনুমেয় কি মর্মান্তিক মৃত্যু সেদিন বরণ করেছিলেন সেখানে উপস্থিত ব্যারিকেড সৃষ্টিকারী সাহসী সরল জনতা।

দখলদার বাহিনী রেডিও ও টেলিভিশন কেন্দ্রগুলোতে অতিরিক্ত শক্তি নিয়োজিত করতে এগিয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং একই কায়দায় প্রতিরোধকারীদের দমন করে করে গন্তব্যে পৌছতে হয়। উল্লিখিত কেন্দ্রগুলোতে দখলদাররা শক্ত নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।

ব্যাপক প্রতিরোধ হয়েছে ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, ইপিআর হেড কোয়ার্টার, রাজারবাগ পুলিশ লাইনে, জনগণের হাতে যার যা ছিল তা-ই নিয়ে তাঁরা এ সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ প্রতিরোধে অবতীর্ণ হতে এগিয়ে এসেছেন (যেমন, খুলনার মুজিবর রহমান চৌধুরী, পিআইএ-র রইসউদ্দিনকে দেখা গেল রাজারবাগে দখলদারদের মর্টার-মেশিনগানের বিপরীতে যথাক্রমে রিভলবার ও টু-টু বোর রাইফেল ব্যবহার করতে)। অনেকের হাতে লাঠিও দেখা যায়। হাজার হাজার মানুষ রাজারবাগ পুলিশের সে রাতের প্রতিরোধ প্রত্যক্ষ করে নিরুপায় দর্শকের মত। একই ঘটনা ঘটেছে পিলখানার আশপাশ এলাকায়ও। তবে সে প্রতিরোধ কোথাও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি—সর্বোচ্চ দুই-তিন-চার ঘন্টা। দখলদার বাহিনী আক্রমণ চালায় পুরনো ঢাকায়, হামলা চালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর আবাসিক এলাকায়, রমনা কালীবাড়ী, আনন্দময়ী আশ্রম, শিববাড়ী প্রভৃতি স্থানে, আক্রমণ চালায় বুড়িগঙ্গায় কিছু ভাসমান মানুষবাহী যানের উপর ও নদীর অপর পাড়ে বিশেষতঃ জিঞ্জিরা এলাকায়। পুরান ঢাকায় সহ অনেক স্থানে অগ্নি সংযোগ করে। দখলদার বাহিনী শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন অভিমুখী সকল ব্যারিকেড ও প্রতিরোধ ধ্বংস করে দখল করে শেখ মুজিবের বাসভবন এবং শেখ মুজিব নিজ ঘরে থেকে গ্রেফতারের জন্য নিজেকে সমর্পণ করলে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। অপারেশন সার্চ লাইট নামে দখলদার বাহিনী সর্বত্র মানুষ মারে পাখির মত। দখলদাররা অনেককে ফেলে রাখে, অনেককে গণকবর দেয়, আবার অনেককে ফেলে দেয় নদীতে।

সে রাতে এবং পরের দিনে ঢাকার যে সব জায়গায় দখলদাররা আগুন লাগালো তার মধ্যে ছিল ইংলিশ রোড, ফ্রেন্স রোড, নয়া বাজার ইত্যাদি। অনেক বাড়িঘর ও দোকান কোনটা ভেঙ্গে দিলো কোনটা মাটিতে মিলিয়ে দিলো। হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে শাঁখারীপট্টিতে।

বেগম মুজিব যদিও বলেছেন যে, রাত ১০টা থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল, এ সময়টির উল্লেখ এখানে ভাবোদ্দীপক। কারণ, ড. কামাল হোসেন রাত ১০-৩০ মিনিটের পরে বাড়ী যাওয়ার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবের কাছ থেকে বিদায় নেন। তিনি সে সময় কোন গোলাগুলির শব্দের কথা বলেন নি, দ্বিতীয়ত, তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে বাড়ী ফেরার উদ্দেশ্যে তিনি রওয়ানা দিতেন কি-না তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। দখলদারদের প্রথম ছোঁড়া গোলাগুলির সময় রাত ১০-৩০ মিনিটের পরই হবে। আনুমানিক রাত্র ১১টার দিকেই যে গোলাগুলি শুরু তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে, রাত প্রায় সাড়ে ১২টার দিকে যে শেখ মুজিব গ্রেফতার বরণ করেছেন সে বিষয়ে বেগম মুজিবের বক্তব্যে কোন ভুল নেই। তাছাড়া, পথিমধ্যে সমস্তরকমের ব্যারিকেড গুড়িয়ে দিয়ে দখলদাররা রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পৌছে গিয়েছিল রাত ১১-৩০ মিনিটের দিকেই। তবে, বেগম মুজিব যে গোলাগুলির কথা বলেছেন সে গুলি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসা দখলদার বাহিনীর নয়, সে সময় মোহাম্মদপুরে কিছু গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে South Asian Review-তে ৪ জুলাই, ১৯৭১ প্রকাশিত Nagotiating for Bangladesh : A Participant's view প্রবন্ধে শেখ

Scanned by CamScanner

মুজিবুর রহমানের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা জনাব রেহমান সোবহানের "২৫শে মার্চের রাত ১১টায় সেনা অভিযান শুরু হল" বক্তব্যটি যথার্থ। জনাব মুহাম্মদ নূরুল কাদিরের উল্লিখিত বইয়ে তিনিও যা লিখেছেন তা হ'ল "মাঝরাতের সামান্য আগে যখন বাড়ি ফিরছিলাম, ঠিক তখনই এক অকল্পনীয় অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে, ভয়ে-বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।" এখানে তিনি দখলদারদের আক্রমণের কথাই বলেছেন এবং তা মাঝরাতের সামান্য আগেই বলেছেন।

তৎকালীন সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের ক্যাপ্টেন আবু তালেব সালাহউদ্দীন বলেছেন, "ছাত্ররা ফার্মগেটে ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছিল...। আমরা যখন মিছিলের মাঝে পড়ি তখন কয়েকজন ছাত্র আমাদের পরিচয় জানতে চায়। আমি সেনাবাহিনীর পরিচয় না দিয়ে বাঙ্গালী ও সাধারণ মানুষ, গুলশানে বাসা আছে বলে জানাই। তখন তারা আমাদের গাড়ি চলার জন্য একটু জায়গা পরিষ্কার করে দেয় (তখন রাত প্রায় এগারটা)। ব্যারিকেড অতিক্রম করার পরই আমরা দেখলাম সেনাবাহিনীর ৪ খানা মেশিনগান লাগানো গাড়ী (বাতি নেভানো) কয়েকজন সৈন্য ফার্মগেটের দিকে ঠেলে নিচ্ছে। আমাদের গাড়ী একটু থামালাম। গাড়ী কয়খানা ফার্মগেটের কাছাকাছি গিয়েই ছাত্রদের উপর গুলি চালাতে শুরু করে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে বেশকিছু ছাত্র ও সাধারণ মানুষ সেখানেই মারা যায়।"

একই রাতে ১১-৩০ মিনিটের সময় চট্টগ্রামে অবস্থিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা আক্রমণ চালিয়ে প্রশিক্ষণরত রিক্রূট্ সহ ২০০০/২৫০০ বাঙ্গালী সেনাদের অধিকাংশকে হত্যা, আহত ও বন্দী করেছিল। তৎকালীন ক্যাপ্টেন রফিক-উল-ইসলামের বক্তব্য মতে সে রাতে দখলদার বাহিনী এক হাজারেরও বেশী বাঙ্গালী সৈন্যকে হত্যা করেছিল। এরপর দখলদাররা বাঙ্গালী সৈন্যদের আবাসিক কোয়ার্টারগুলোতে ঢুকে পড়ে অস্ত্রের মুখে নারী ও শিশু সহ যাকে পায় তাকেই হত্যা করে।

এ রাতে চট্টগ্রাম শহরে ই,পি,আর-এর ক্যাপ্টেন রফিক-উল-ইসলাম বিদ্রোহ করেন এবং তাঁর কমান্ডের সৈন্য নিয়ে হালিশহর এবং চট্টগ্রাম নগরীর অন্যান্য এলাকার ৫০০ অবাঙ্গালী সৈনিক, জেসিও এবং কয়েকজন ই-পি-আর অফিসারকে নিরস্ত্র করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু কোনরূপ পূর্ব পরিকল্পনার অভাব এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ তথা সমন্বয়হীনতার জন্য সর্বব্যাপী যুদ্ধ শুরু হ'তে পারেনি। একটা পর্যায়ে ক্যাপ্টেন রফিকের বাহিনীর গোলাবারুদ প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। একদিকে সম্মুখ যুদ্ধ অন্যদিকে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর কমানগুলো তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। সে সঙ্গে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্যাংক নিয়ে এসেছিল শত্রু সৈন্যরা। অথচ কোনো ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র তাদের ছিল না। ক্যাপ্টেন রফিক-উল-ইসলাম বলেছেন, আওয়ামী লীগ কর্মী "ডাঃ জাফরকে বললাম ঃ "আমাদের জনগণকে মুক্ত করার জন্য পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে আমি আমার ই-পি-আর সেনাদের নিয়ে যুদ্ধ করবো। আপনারা ষোলশহরে এবং ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে বাঙ্গালী সৈন্যদেরকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলুন। তারপর রেলওয়ে হিলে আমার সদর-দফতরে দেখা করবেন।" এরপর তিনি বলেছেন, "রাত তখন ৮টা ৪৫ মিনিট। আমি শেষবারের মতো আমার সারসন রোডস্থ বাসভবন ত্যাগ করলাম।" এভাবেই তাঁর বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, চট্টগ্রামে অবস্থিত ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার-এর কোন কর্মকর্তার সঙ্গে সরাসরি কোনোরূপ যোগাযোগ না করে, একজন আওয়ামী লীগ কর্মীর মাধ্যমে একতরফা একটি বার্তা প্রেরণ করে কী সমন্বিত যুদ্ধ শুরুর আশা করা যায়?

Scanned by CamScanner

২৫শে মার্চ রাতে দখলদার বাহিনীর আক্রমণের পর থেকে ই,পি,আর বাহিনীর এক অংশ, পুলিশের এক অংশ সহ জনতা কোনোরূপ কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নির্দেশ ও সমন্বয় ছাড়াই যে যার মত করে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থানীয় ভাবে গড়ে উঠতে থাকে প্রতিরোধ বাহিনী। ২৫ মার্চ দিনগত রাত ১টার পর এবং ২টা বেজে ১৫ মিনিটের মধ্যে চট্টগ্রামে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বিদ্রোহ ঘোষণা করে ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের ঘোষণা দেন।

দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঐ রাতেই মাইকে ঘোষণা দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকায় কারফিউ জারী করেছিল। প্রদেশের অন্যান্য জায়গায়ও বিভিন্ন মেয়াদে কারফিউ জারী করেছিল দখলদার বাহিনী।

জনাব অলি আহাদ পূর্বোক্ত বইয়ে সে ভয়াবহ রাত্রের বর্ণনায় লিখেছেন, "২৫শে মার্চ কালো রাত্রিতে পাক সেনা বাহিনীর নির্মম হামলায় প্রাণ হারান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় প্রধান আসামী পাক নৌ-বাহিনীর তেজস্বী অফিসার লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। ... লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে তাহার ধানমন্ডির বাসভবন হইতে বলপূর্বক বাহিরে আনিয়া প্রাণাধিক প্রিয় স্ত্রী ও সন্তানদের দৃষ্টিসীমার স্বল্প দূরেই গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। শুধু তাঁহাকেই নয়, সেই কালো রাত্রে হত্যা করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, প্রফেসর এম, মুনিরুজ্জামান, জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, সিনিয়র লেকচারার ডঃ ফজলুর রহমান খান, সিনিয়র লেকচারার এম,এ, মোকতাদির, লেকচারার অনুর্দ্বেপায়ন ভট্টাচার্য, লেকচারার এম, আর, খান খাদেম, লেকচারার শরাফত আলী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিনিয়র লেকচারার ডঃ মোহাম্মদ সাদত আলী ও সিনিয়র টিচার মোঃ সাদেককে। ইহা ছাড়াও এই কালো রাত্রিতে এস,এম,হল, জহুরুল হক ও জগন্নাথ হলের বহু সংখ্যক আবাসিক ছাত্রকে হত্যা করা হয়। ব্যারিকেড রচনাকারী জনতা, রেসকোর্স মন্দিরবাসী, নিঃস্ব বস্তিবাসী কেহই এই হত্যাযজ্ঞের হাত হইতে রেহাই পায় নাই। বস্তুতঃ সেই রাত্রিতে হত্যার তান্ডব নৃত্যই চলিয়াছে পাক বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ নগরীতে। খেলা হইয়াছে রক্তের হোলি। সংহতি রক্ষার নামে কি অদ্ভূত পাশবিক নৃশংস কর্মকান্ড। কিন্তু শুধু কি মানুষ? পাক বাহিনীর হাতে সেই রাত্রিতে অগ্নিদাহ হইয়াছে জনতার কণ্ঠ দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, সাপ্তাহিক গণবাংলা ও ইংরেজী দৈনিক পিপলস্ অফিস। অগ্নিদাহ হয় নয়াবাজার বস্তি, কাঠের আড়ত।"

সিদ্দিক সালিক তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয় ভবন ভোর চারটায় দখলে এলো। ...শহরের বাদবাকী অংশে সৈনিকরা তাদের কাজ ভালভাবেই সম্পাদন করলো। রাজারবাগের পুলিশ বাহিনী এবং পিলখানার পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসকে নিরস্ত্র করলো। ত্রাস সৃষ্টির জন্যে অন্যান্য এলাকায় গোপন স্থান থেকে গুলী ছোঁড়া হয় এবং বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। যেসব বাড়ী বিদ্রোহীরা আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করে এবং যে বাড়ীগুলো অপারেশন পরিকল্পনায় উল্লেখ করা ছিল (রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারের জন্য), সেগুলো ছাড়া আর কোন বাড়ীতে তারা প্রবেশ করবে না।

২৬শে মার্চের সূর্য উদিত হবার আগেই সৈনিকরা তাদের মিশন সমাপ্তির রিপোর্ট প্রদান করলো। ... বেলা বাড়তেই ভুট্টোকে তাঁর হোটেল কক্ষ থেকে বের করে আনা হ'ল এবং সেনাবাহিনীর প্রহরায় বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হল। ভুট্টো প্লেনে ওঠার আগে গত রাতে সেনাবাহিনীর কাজের প্রশংসা করে একটি সাধারণ মন্তব্য করলেন। সশস্ত্র প্রহরীদের প্রধান

Scanned by CamScanner

ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে বলেন, 'আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ, পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেছে।' করাচী পৌঁছে তিনি এই উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন।"

"বাংলাদেশ ঃ সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট" বইয়ে মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি লিখেছেন, "পাক সামরিক জান্তার ২৫শে মার্চের হামলার পর একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ও পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ জণগণকে কামানের গোলার মুখে ফেলে রেখে কলকাতায় পাড়ি জমালেন।"

পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধে মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম আরো লিখেছেন, "তাজউদ্দিন ৩রা (ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলামের বক্তব্য অনুসারে ৪ঠা এপ্রিল—লেখক) এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। প্রথমেই ইন্দিরা গান্ধী জিজ্ঞাসা করেন, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়েছে কি না, তাজউদ্দিন এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জানান, ২৫শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। নিজেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উপস্থাপন করে জানান, শেখ মুজিব স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং অন্যান্য সহকর্মীরা মন্ত্রিসভার সদস্য তাজউদ্দিন ভারতীয় সাহায্যের আবেদন জানালে ইন্দিরা গান্ধী সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা দানের আশ্বাস দেন।

... তাজউদ্দিন একটি ডাকোটা প্লেনে করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও আব্দুল মান্নান সহ ১১ই এপ্রিল আগরতলা যান। খোন্দকার মোশতাক আহমেদ ও কর্নেল ওসমানী এই সময় আগরতলায় অবস্থান করছিলেন। ... এপ্রিলের প্রথম দিকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে তিনি (খোন্দকার মোশতাক আহমেদ) আগরতলা যান এবং ওমরাহ পালনের জন্য মক্কা গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য প্রদানের সম্মতি ও তাঁকে মন্ত্রিসভায় নিতে তাজুদ্দিনের আগ্রহের কথা জানতে পেরে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে চান। নতুন মন্ত্রিসভা আগরতলা থেকে কোলকাতা ফিরে আসে এবং ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় আম্রকাননে (স্থানটি মুজিবনগর নামে পরিচিত) বহু দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করে।"

তিনি লিখেছেন, "খোন্দকার মোশতাক, কামরুজ্জামান ও মনসুর আলী নিজেদের সমর্থকদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবি তুলে ধরেন। এঁরা সবাই তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হন। শেখ মনি প্রচার করতে থাকেন যে শেখ মুজিবের গ্রেফতার হওয়ার জন্য তাজউদ্দিনই দায়ী। তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করে এবং নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ষড়যন্ত্রে সবচেয়ে বেশী লিপ্ত ছিলেন খোন্দকার মোশতাক।"

ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম বলেছেন, "সে সময় কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে তাজুদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধুকে ধরিয়ে দিয়ে ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলামকে নিয়ে ভারতে এসে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন।"

এভাবে একটি জাজ্বল্যমান কল্পিত বক্তব্যকে আশ্রয় করে, শেখ মুজিব কোনোরূপ স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও তাঁকে স্বাধীনতার ঘোষক বানিয়ে জনাব তাজউদ্দিন ইন্দিরা গান্ধীকে জয় করে নিয়েছিলেন সেদিন। জনাব তাজউদ্দিনের এভাবে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অসত্য ঘোষণাকে সেদিন অন্যান্য

আওয়ামী লীগ নেতারা মেনে না নিয়ে প্রধানমন্ত্রিত্ব পাওয়ার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন। যদিও জানা যায় যে, ঐরূপ দাবীর জন্যে পরবর্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে জনাব তাজউদ্দিনকে নাজেহাল হতে হয়েছিল।

ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম বলেন, "...নির্বাচনে বংগবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ উভয় পরিষদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

... ৭ই মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু আন্দোলনের নয়া কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ...২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। ...ঐ দিন সন্ধ্যায় বংগবন্ধুর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া পেশ করা হয়। ... ২৪শে মার্চ বিকেল থেকেই বংগবন্ধু সকলকে ঢাকা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেন। ... ২৫শে মার্চ তারিখেও এ ধরণের শলাপরামর্শ চলে।

...বংগবন্ধু একদিন তাঁর বেড রুমে হাইকম্যান্ডের বৈঠকের সময় তাজউদ্দিন আহমদ ও আমাকে ডাকেন। ...বৈঠকে আত্মগোপনের জন্য আমরা সকলে মিলে বংগবন্ধুকে চাপ দেই। ...২৫শে মার্চ বিকেলে আমার আবার ইচ্ছা হলো আত্মগোপন করার জন্য বংগবন্ধুকে অনুরোধ জানাই। ...আমি জাতির উদ্দেশে বংগবন্ধুর শেষ বক্তব্যের খসড়া তৈরী করতে ব্যস্ত। আমার খসড়া প্রস্তুত হলো। বংগবন্ধু একটু দেখে ঠিক করে দেন। রাত সাড়ে আটটার দিকে বংগবন্ধু সাংবাদিকদের সামনে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ...আমি বংগবন্ধুর বাসা থেকে বেরিয়ে পাশে বদরুন্নেছা আহমদের বাসায় খোঁজ নিতে যাই। নূরুদ্দিন ভাই বলেন, সেনানিবাস থেকে শীগগীরই ট্যাংক বেরিয়ে আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো জনতার ওপর আক্রমণ শুরু হবে। আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে ফিরে এসে দেখি তিনি ওপরে চলে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে আবার বেরিয়ে আসি। ...তাজউদ্দিন ভাই এর বাড়ীতে গিয়ে দেখি নুরজাহান মোর্শেদ এম,পি বসে আছেন। ...কথা শুনে বুঝলাম তাজউদ্দিন ভাইয়ের মন খারাপ। কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিছু না বলেই এই বাড়ী ত্যাগ করি। উদ্দেশ্য কামাল হোসেনের সাথে দেখা করা। গাড়ীতে নুরজাহান মোর্শেদকে নিয়ে নিলাম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তার বাসায় নামিয়ে দিতে যেয়ে তাকে বললাম, আজ রাতটা বড় খারাপ। তাকে নামিয়ে আমার বাসায় আসার পথে দেখি পাক সৈন্যরা বেতার ভবন দখল করে নিয়েছে। ...আমার বাড়ীতে যাওয়ার পূর্বে কামাল হোসেনের বাড়ীতে যাই। তিনি বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে আহমেদুল কবীর ও তাঁর স্ত্রীকে বিদায় দিচ্ছেন। বিদায়ের সময় লম্বা না করার জন্য আমি তাঁদের তাড়া দিলাম। তাঁদের বিদায় দিয়ে ডঃ কামাল কি করা যায় বলে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। বললাম, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি প্রস্তুত হোন। আমি বাসায় লীলাকে বলে আসি। ...পূর্বের মত দেয়াল টপকিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে কামাল হোসেনের বাসায় আসি। তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

পথে দেখি শাহবাগের মোড়ে জনতা গাছ কেটে ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে। ...বহু কষ্টে কর্মীদের সহযোগিতায় রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসায় আমরা পৌঁছি। বঙ্গবন্ধু যে আত্মগোপন করতে নারাজ গাড়ীতে ডঃ কামালকে সে কথা জানাই। ৩২ নম্বরের বাড়ীতে প্রবেশ করে দেখি বঙ্গবন্ধু নীচের তলায় খাবার শেষ করেছেন। ... আমরা সংক্ষেপে শহরের অবস্থা জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের সাথে চলে যাবার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানাই। বঙ্গবন্ধু তার পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল। তিনি বললেন, তোমরা প্রতীজ্ঞা পাঠ করেছ, আমি যা নির্দেশ করবো তাই শুনবে। তারপর তিনি আমাদের দু'জনের পিঠে দু'হাত রেখে বলেন, 'কামাল, আমিরুল আমি কোন দিন তোমাদেরকে

Scanned by CamScanner

কোন আদেশ করিনি। আমি তোমাদের আজ আদেশ করছি, এই মুহূর্তে তোমরা আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। আর তোমাদের দায়িত্ব তোমরা পালন করবে'। আর শহরের অবস্থার কথা শুনে তিনি বলেন, আমার কাছে সব খবর আছে। ইয়াহিয়া খান ঢাকা ছাড়ার পরই আক্রমণ শুরু হবে।

...আমরা তাজউদ্দিন আহমদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হই। তাজউদ্দিন ভাইকে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত করি। তাঁকে জানাই, বঙ্গবন্ধু সকলকে আত্মগোপনের নির্দেশ দিয়েছেন। ...ডঃ কামাল গাড়ী যোগে অন্যত্র যেতে চাইলেন। আমি বললাম, এটা ঠিক হবে না। তাজউদ্দিন আহমদের কিছুটা দেরী হলো। তিনি বেরিয়ে আসলেন। তার পরনে লুঙ্গি ও গায়ে পাঞ্জাবী। কাঁধে একটি ব্যাগ ঝোলানো রয়েছে। আর তার ঘাড়ে একটি রাইফেল। ...রাইফেল বেশী দূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি ...কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো এই এলাকায় পাক সৈন্য এস যাবে। পুরাতন ঢাকার একটা বাড়ীতে সকলের একত্রিত হবার কথা ছিল। ...বঙ্গবন্ধুর বাড়ী ছেড়ে না যাবার সিদ্ধান্তে নেতাদের মন ভেঙ্গে যায়।

... ১৫ নম্বর সড়কের কাছাকাছি এলে ডঃ কামাল গাড়ী থামাতে বলেন। তিনি বলেন, সকলে এক বাড়ীতে না থেকে আমি এখানে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে যাই। আমার অনিচ্ছা থাকা সত্বেও বাধা দিতে পারলাম না। ...কামাল হোসেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু তার একক সিদ্ধান্ত নেয়ার ধরণটা মেনে নিতে পারলাম না। ... পরবর্তীকালে তিনি পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন।

... গফুর সাহেব আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ... আমরা বাড়ীতে ঢুকার ৫/৭ মিনিটের মধ্যেই এক প্রচন্ড শব্দে সমস্ত ঢাকা শহর কেঁপে উঠলো। পরে জেনেছি এটা ছিল আঘাত শুরু করার সংকেত। ... আমাদের ওপর হামলা হবে একথা জানতাম। সেটা হবে রাজনীতিবিদ, ছাত্র ও কর্মীদের ওপর। কিন্তু আধুনিক সমর সজ্জায় সজ্জিত পাক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙ্গালীর ওপর বর্বরভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা ভাবতে পারিনি। ... মধ্যরাতের দিকে ব্রাশ ফায়ার ও বিকট শব্দ শুনে তাজউদ্দিন আহমদ বলে ওঠেন, এবার দস্যুরা ৩২ নাম্বার বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে হামলা করছে। ... ২৬শে মার্চ সকালে দু'জনে বসে গতরাত থেকে ঘটনা গুলো বুঝবার চেষ্টা করলাম। নিজেদের কর্তব্য স্থির করতে দেরী করিনি। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রথম কাজ হলো এই বাড়ী ত্যাগ করা। ... ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বক্তৃতা দেন। ... জনগণের শতকরা ৯৭ ভাগ ভোট লাভকারী আওয়ামী লীগকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেআইনী ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়ার গলা থেকে সুতীব্র ক্রোধ বেরিয়ে আসে। ইয়াহিয়ার বক্তৃতা ও গত কয়েক ঘন্টার নৃশংস হত্যাকান্ড আমরা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করি।

দু'জনে ঠিক করলাম, পাক বাহিনীর এই বর্বরোচিত হামলার খবর যে কোনভাবে বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। ২৫শে মার্চে ঢাকায় গণহত্যার খবর ভারত বা বিশ্বের কোন বেতারে প্রচারিত হয়নি। তবে ২৬শে মার্চ রাতে অষ্ট্রেলিয়া বেতার ঢাকার গণহত্যার খবর প্রচার করে। ... এই অবস্থায় তাজউদ্দিন ভাই এর নাম মহম্মদ আলী আর আমার নাম রহমত আলী ঠিক করে নেই। ...২৬শে মার্চ সারাদিন গফুর সাহেবের বাড়ীতে আটক থাকি। বাইরে কার্ফু। চারদিকে মিলিটারী জীপ টহল দিচ্ছে। ... পরদিন ঘুম থেকে উঠে লক্ষ্য করলাম, কার্ফু ও গোলাগুলীর মধ্যেও সাধারণ মানুষের গতি অব্যাহত রয়েছে। ... ভেতরের রাস্তা দিয়ে সাধারণ মানুষ চলাচল করছে। ... মনে মনে ঠিক করলাম, সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গেলে আমার চলাচলেও কোন অসুবিধা হবে না। আমি একাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি। ... মৌলানাকে ঐ বাড়ীতে আমার আত্মীয় মহম্মদ আলী আছেন, তাকে

Scanned by CamScanner

নিয়ে আসার জন্য বললাম। কিছুক্ষণ পর মহম্মদ আলী এসে হাজির হলেন। ... কার্ফু জারী থাকা অবস্থায়ও এলোপাথারি গুলী চলে। এমন সময় একটি মাইকে কেউ বলে গেল, কিছুক্ষণের জন্যে কার্ফু তুলে নেয়া হয়েছে।

সে সময় একজন ছাত্র এ বাড়ীতে আসে। ... আমাদের প্রধান জিজ্ঞাস্য ছিল ৩২ নাম্বারে কি হয়েছে? ছাত্রটি সঠিক কিছু বলতে পারলোনা। তবে বংগবন্ধুর ব্যাপারে দু'ধরণের খবর শুনেছে। কেউ বলেছে বংগবন্ধু সরে গেছেন। আবার কেউ বলেছে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাইরে কার্ফু না থাকায় আমরা বাড়ী ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের দুজনের হাতে ১টি করে বাজারের থলি। ...ডানে মোড় নেব এ সময় তাজউদ্দিন ভাই থমকে দাঁড়ান। আর একটু এগুলেই ডান পাশে তার বাড়ী। তিনি তার বাড়ী যেতে চাইলেন। আমি জোর আপত্তি জানাই। ... বাড়ীতে আর যাওয়া হলো না। ... ডান দিকে মোড় নিয়ে আমরা রায়ের বাজার পৌছি। এখানে আওয়ামী লীগ কর্মীদের একটি শক্ত ঘাটি তখনো রয়েছে। নির্ভীক কর্মীরা সংগ্রাম কমিটির অফিস পাহারা দিচ্ছে। ... পাক বাহিনীর হামলা এখানে তখনো আসেনি। ... ৩২ নাম্বারের খোজ নিয়ে আমাদের প্রেরিত লোক ফিরে এসে জানায় বংগবন্ধুর বাড়ীর সামনে পুলিশ নিহত হয়ে পড়ে রয়েছে। বাড়ীতে কোন লোকজন নেই। পরস্পর জানতে পেরেছি বংগবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

... বিভিন্ন সূত্রে জানা গেল শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুল রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, প্রমুখ নদী পার হয়ে জিনজিরার দিকে চলে গেছেন। শেখ কামাল ও শেখ জামাল বাসা থেকে পালিয়ে গেছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কোন খোঁজ খবর জানতে পারলাম না। ... কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এ স্থান ত্যাগ করব। সেখানে জমায়েত নেতা-কর্মীদের বললাম, সংগ্রামকে বংগবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমরা বংগবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক বেরিয়েছি। তারা সময়ে সময়ে নির্দেশ পাবে। ... ২৭শে মার্চ রায়ের বাজারের কর্মীদের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। ... বিদায়ের সময় রায়ের বাজারের একজন কর্মী জিজ্ঞাসা করেন আমাদের পরিবারের জন্য কিছু বলার আছে কিনা। আমরা দু'জনে দুটুকরো কাগজ নিয়ে কিছু লিখে তাদের হাতে দিলাম। ... আমাদের বক্তব্যের সারমর্ম ছিল আমরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছি। কবে এর শেষ হবে জানি না। ... আমরা রায়ের বাজার থেকে নদী পার হয়ে নবাবগঞ্জ থানায় যাব। ... আমাদের গতি দ্রুত। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হাজার হাজার মানুষ উত্তপ্ত বালির ওপর দিয়ে চলছে। রাস্তার দুপাশের গ্রামের মানুষ মিছিলের মানুষকে উদার হস্তে খাওয়াচ্ছে, আশ্রয় দিচ্ছে।

... একজন আওয়ামী লীগ কর্মী আমাদের আপত্তি সত্বেও এক প্রকার জোর করে তার বাড়ী নিয়ে গেলেন। ... চা ও বিস্কুট খেলাম। কিছু বিস্কুট পকেটে নিয়ে আবার পথ চলা শুরু করি। ...যাবার আগে কর্মীদের উদ্দেশে বলে গেলাম, সংগ্রাম কমিটির আওতায় সব কিছু পরিচালনা করতে হবে। শত্রুদের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। শত্রুদের খবর পেলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ... নৌকাওয়ালা পয়সা নিতে রাজী হলোনা। ... ওপারে নেমেই দেখি একজন যুবক দাঁড়িয়ে। আমাদেরকে জড়িয়ে ধরল। ... যুবক মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছে। সে বলল, আপনাদের নেয়ার জন্যই আমি এখানে অপেক্ষা করছি। ... পরদিন (২৮ মার্চ) ভোরে আমাদের যাওয়ার জন্য ২টি মোটর সাইকেলের ব্যবস্থা করা হয়। ... মোটর সাইকেল যোগে রওয়ানা হয়ে রোদ উঠতে না উঠতে আমরা সুবেদ আলী এম, পি, এ'র বাড়ীতে পৌছি। ... এই বাড়ীতে আমরা আবার বৈঠকে বসি।

Scanned by CamScanner

...কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা অপর একজন এম, পি, এ, আশরাফ চৌধুরীর বাড়ীতে পৌছে যাই। পদ্মার তীরে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ... অগত্যা তীর থেকে আমরা আগারগাও নামক একটি গ্রামে ফিরে এলাম। আমাদের দলীয় একজন কর্মী-বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রি যাপন করি।

বাড়ীর লোকেরা তাঁতের কাজ করে খায়। স্নান করে খেতে যাব, হঠাৎ স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান কানে ভেসে আসলো। ঘোষক বেতারে বলছেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ... ঠাওর করে উঠতে পারলাম না, কারা কোত্থেকে এই বেতার চালাচ্ছে। পরে বেতারে মেজর জিয়ার কণ্ঠ শোনা গেল। তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার আহবান জানান। ... মেজর জিয়ার আহবান বেসামরিক, সামরিক তথা বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষকে সংগ্রামে উজ্জীবিত করে।

... আমরা দু'জন গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম যে অবিলম্বে একটি সরকার গঠন করা প্রয়োজন। পরদিন (২৯ মার্চ) ভোরবেলা আবার রওয়ানা হই। ...একটি নৌকা করে আমরা নদীর ওপারে যাই। ... আমরা এখান থেকে ফরিদপুর যাব। ... ঘোড়ায় চড়ে শহরের এক প্রান্তে নামি। সেখান থেকে রিক্সা যোগে আওয়ামী লীগ নেতা ও এম,পি ইমামউদ্দিনের বাড়িতে উপস্থিত হই।

... আমরা সবে মাত্র খেতে বসেছি। এমন সময় খবর এলো পাক সৈন্য এদিকে আসছে। ... মনে মনে ঠিক করলাম এখান থেকে মাগুরার পথে রওয়ানা হবো। ... একটা রিক্সা যোগে আমরা কামারখালীর পথে চলেছি। ... এমন সময় ফরিদপুরের দিকে একটি জীপ আসতে দেখি। ... কিছুক্ষণ পর বুঝলাম জীপটিতে অসামরিক লোক রয়েছেন। ... রাস্তায় এসে জীপটি থামাবার ইঙ্গিত দেই। পরিচয় নিয়ে জানলাম তিনি রাজবাড়ীর মহকুমা প্রশাসক। নাম শাহ ফরিদ। ... তিনি জানান, মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তওফিক ইলাহী চুয়াডাঙ্গার পুলিশ ও বি ডি আর এর সাথে যোগাযোগ করে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। ঝিনাইদহ, যশোর, রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়ার জনগণ পাক সৈন্যের বিরুদ্ধে অবরোধ সৃস্টি করছে। সেখানে চলছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। এসব খবর শুনে আমরা দু'জন আশান্বিত হই। ... আরো কিছুক্ষণ এগিয়ে রিক্সা ছেড়ে দেই। স্থানীয় একটি বাসে অন্যান্য কয়েকজন যাত্রীর সাথে আমরাও উঠি। কিছুদূর যেয়ে বাসটি আর যেতে পারলোনা। ... কামারখালি পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো।

... সন্ধ্যাবেলা কামারখালি ঘাটে রেডিও শুনি। রেডিওর কাছে বহু লোক ভিড় করে। ...রাত তখন অনেক। একটি রিক্সাওয়ালাকে বাড়ী থেকে ডেকে আনা হলো। ... অনেক রাতে আমরা আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাব হোসেনের বাড়ী পৌছি। ... খেতে খেতে ভোর হয়ে গেল (৩০ মার্চ)। ... চুয়াডাঙ্গা থেকে খবর পাই, কুষ্টিয়াতে আমরা জয়ী হয়েছি।

... ঢাকার অবস্থা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। চট্টগ্রামের খবর বিপ্লবী বেতার যোগে পেয়েছি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, সারা বাংলায় গণযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ... চুয়াডাংগায় তৌফিক, মাহবুব ও মেজর ওসমানের সাথে আবার বৈঠক করি।

... বেলা ৩টার দিকে (৩০ মার্চ) আমি ও তাজউদ্দিন ভাই সীমান্তের পথে রওয়ানা হই। তওফিক ও মাহবুব আমাদের সাথে ছিল। পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে সীমান্ত পার হবোনা বলে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ্য মর্যাদা নিয়েই আমরা ভারতে যাব। ... সীমান্ত থেকে কিছু দূরে একটি জঙ্গলের মাঝে ছোট্ট খালের ওপর একটি বৃটিশ যুগের তৈরী কালভার্ট। কালভার্টের ওপর তাজউদ্দিন ভাই ও আমি বসে আছি। আমাদের প্রতিনিধি

Scanned by CamScanner

হিসেবে তওফিক ও মাহবুবকে ওপারে পাঠাই। ... চারদিক আগাছায় ভরে গেছে। আরো কিছুক্ষণ পর অন্ধকারে মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তাজউদ্দিন ভাইকে ডেকে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াই। শব্দ ক্রমশঃ আমাদের দিকেই আসছে। আগন্তুকরা কাছে এসেই হাতের অস্ত্র উচু করে সামরিক কায়দায় আমাদের অভিবাদন জানান। অফিসারটি জানান, আমাদেরকে তিনি যথোপযুক্ত সম্মান দিয়ে ছাউনীতে নিয়ে যেতে এসেছেন। আগন্তুক অফিসারের সাথে আমরা ছাউনীতে চলে যাই। ছাউনীতে গিয়ে জানতে পারি যে, আমাদের আগমনের খবর ইতিমধ্যে কোলকাতায় পৌছে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বি এস এফ এর আঞ্চলিক প্রধান গোলক মজুমদার ছাউনীতে এসে পৌছলেন। রাত আনুমানিক আটটার কাছাকাছি। মিঃ মজুমদার জানান, তাদের হাই কমান্ডের নির্দেশেই তিনি এখানে এসেছেন। আমরা আমাদের সংগ্রামে ভারতের সর্বাত্মক সাহায্যের আবেদন জানাই। ... তিনি জানান, আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। ... তওফিক এলাহী ও মাহবুবকে বিদায় দিয়ে মজুমদারের জীপে করে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই কোলকাতা যাত্রা করি।

মজুমদার নিজে গাড়ী চালিয়ে আমাদের দমদম বিমান বন্দরে নিয়ে আসেন। ... জীপ থেকে নামিয়ে আমাদের অপেক্ষাকৃত বড় কালো রং এর একটি গাড়ীতে তোলা হলো। বিমান থেকে ছ'ফুটেরও বেশী লম্বা একজন লোক নেমে সোজা আমাদের গাড়ীতে উঠলেন। ... তিনি হলেন বি এস এফ এর প্রধান রুস্তমজী।

... গাড়ীতেই শুরু হয় আলোচনা। রুস্তমজীর প্রথম প্রশ্ন ছিল বংগবন্ধু কোথায়? মজুমদারের প্রথম প্রশ্নও ছিল এটাই। এর পরেও আরো অনেকের সাথে দেখা হয়েছে। সকলেরই প্রথম প্রশ্ন ছিল বংগবন্ধু কেমন আছেন? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা তৈরী ছিলাম। দলীয় নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা সহ সকলের সাথে বংগবন্ধুর অবস্থানের ব্যাপারে আমরা একই উত্তর দিয়েছি। আমরা যা বলতে চেয়েছি তা হলো বংগবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাচ্ছি। তিনি জানেন, আমরা কোতায় আছি। তিনি আমাদের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। সময় হলে বা প্রয়োজন দেখা দিলে, তিনি উপযুক্ত স্থানে আমাদের সাথে দেখা করবেন। ... তখন প্রায় মধ্যরাত। ... খাওয়ার পর টেবিলের ওপর রাখা একটি মানচিত্রের দিকে আমরা চোখ রাখি। কোনদিন যুদ্ধ করিনি বা এর কথা ভাবিনি। অথচ আজ যুদ্ধের পরিকল্পনায় অংশ নিতে হচ্ছে।

... আমাদের প্রথম কাজ হলো দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা রাজনৈতিক নেতাদের একত্রিত করে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা। আর দ্বিতীয় কাজ হলো। মুক্তিযুদ্ধকে সংঘবদ্ধ ও সুসংহত করা। বি এস এফ এর বিভিন্ন প্রধানদের এই গভীর রাতে ডাকা হয়। ... আওয়ামী লীগের এম এল এ, এম পি এ সহ নেতাদের একটি তালিকা তৈরী করে এতে তাদের সম্ভাব্য অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়। এ সব নেতার সাথে যোগাযোগের জন্যে এই তালিকা বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়িতে প্রেরণ করা হয়। ... যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের যথাসম্ভব সাহায্য দিতে বি এস এফ রাজী হলো। পরামর্শ করতে রাত প্রায় শেষ হয়ে গেল।

... আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হলো। যে সব স্থানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। কিছুক্ষণ পর চুয়াডাঙ্গার সাথে যোগাযোগ হলো। চুয়াডাঙ্গাকে আমা বিপ্লবী সরকারের রাজধানী করার পরিকল্পনা মনে মনে ঠিক করেছি।

... সেদিন (৩১শে মার্চ) ছিল কোলকাতায় 'বন্দ'। বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থনে এই বন্দ ডাকা হয়। ... কোলকাতাস্থ পাক সরকারের কার্যালয়ের চারদিকে হাজার হাজার জনতা বিক্ষোভ

Scanned by CamScanner

প্রকাশ করেছে। ... পাকিস্তান কনস্যুলেট এর কাছে আমাদের জন্য একটি বাড়ী নির্বাচিত করা হলো। ... পরদিন আমাদের দিল্লী যাওয়ার কথা। বি এস এফ ও অন্যেরা খুবই সাবধানতা অবলম্বন করছে আমাদের অবস্থান গোপন রাখার জন্য। পরদিন সকালে সীমান্তের দিকে যাই। খবর অনুযায়ী মেজর ওসমান অস্ত্রশস্ত্রের একটা তালিকা তৈরী করে নিয়ে আসেন। মেজর ওসমানকে কিছু অস্ত্র দেয়া হলো। এর মধ্যে এল এম জিও ছিল।

... ১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল। আজ আমরা দিল্লী যাচ্ছি। গোলক মজুমদার আমাদের সাথে আছেন। ... সাংবাদিক ও অন্যান্য যাত্রীর দৃষ্টি এড়িয়ে আমাদের যেতে হবে। ইতিমধ্যেই চট্টপাধ্যায় আমাদের দুজনের জন্য একটি স্যুটকেস ও একটি ব্যাগ নিয়ে এসেছেন। হাত ব্যাগে কাগজ পত্র, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি রয়েছে। স্যুটকেসে আমাদের পরিধেয় কাপড়, তোয়ালে ও সাবান। রাত ১০ টার দিকে জীপে করে একটি মিলিটারী মালবাহী বিমানের কাছে আমাদের নিয়ে আসা হল। মই দিয়ে আমরা বিমানের কক পিটে উঠি। পাইলট ও তার সহকারীদের ছাড়া বিমানে বসার অন্য কোন আসন নেই। শুধুমাত্র কেনভাসের বেল্ট দিয়ে আমাদের চারজনের বসার একটি ব্যবস্থা করা হল। ...এই মালবাহী সামরিক বিমানে নেয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সকল এজেন্সী থেকে আমাদের যাত্রা গোপন রাখা। ... দিল্লী পৌছতে রাত শেষ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর একটা কেনভাস বিছিয়ে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই মেঝেতে শুয়ে পড়ি। ... এমনি করে আধা ঘুমে আধা জেগে ভোরের (২ এপ্রিল) দিকে আমরা দিল্লী পৌছি। সেখানে মিলিটারী বিমান বন্দরে আমাদের জন্য একটি গাড়ী প্রস্তুত ছিল ... প্রতিরক্ষা কলোনীর একটি বাড়ীতে আমাদের রাখা হলো। পরে জেনেছি বাড়ীটি ছিল বি এস এফ এর একটি অতিথিশালা।

... ভারতের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার আচরণে কখনো অবাক হয়েছি আবার কখনো ভীত হয়েছি। তবে 'র' RAW নামক একটি গোয়েন্দা সংস্থা মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় খুবই ব্যস্ত ছিল। এই সংস্থাটির কার্যকলাপে কখনই আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন আমাদের সাথে আলাপ করে। তারা নিশ্চিত হতে চায় আসলেই আমরা আওয়ামী লীগের লোক কিনা। তাদের আলোচনার পর সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার মিঃ কাউলের কিছুটা বিশ্বাস জন্মে যে সত্যিই আমরা আওয়ামী লীগের লোক।

... ইতিমধ্যে আমরা খবর পেলাম, রেহমান সোবহান ও ডঃ আনিসুর রহমান দিল্লীতে পৌছেছেন। তাছাড়া এম আর সিদ্দিকী, সিরাজুল হক বাচ্চু মিয়া ও যুবনেতা আবদুর রউফ তখন দিল্লীতে ছিলেন। ... এমনিভাবে দিল্লী আসার পর ২ দিন কেটে গেল।

... ৪ঠা এপ্রিল তাজউদ্দিন ভাই ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তাদের কোন সহযোগী ছিল না। বৈঠকে উপস্থিত না থাকলেও পূর্বাপর আলোচনার বিষয় আমার জানা ছিল। ... মিসেস গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর তাজউদ্দিন ভাই আমাকে সব কিছু জানান। ... স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী প্রথম প্রশ্ন করেন, "হাউ ইজ, শেখ মুজিব, ইজ হি অল রাইট?" এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। কেননা এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদেরকে আরো অনেক বার হতে হয়েছে। মিসেস গান্ধীর প্রশ্নের জবাবে তাজউদ্দিন ভাই বলেন, "বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর স্থান থেকে আমাদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের বিশ্বাস, তিনি আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ২৫শে মার্চের পর তাঁর সাথে আমাদের আর যোগাযোগ হয়নি।" সাক্ষাতে তাজউদ্দিন ভাই আরো বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যে কোন মূল্যে এই

Scanned by CamScanner

স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করতে হবে। ... তাজউদ্দিন ভাই বলেন, আমাদের অস্ত্র ও যুক্তি যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন হবে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য আশ্রয় ও খাদ্য। মাতৃভূমির স্বাধীনতা যুদ্ধে তাজউদ্দিন ভাই ভারত সরকারের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। বাংলাদেশের নেতা জানান, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হবে জোট নিরপেক্ষ, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব কারো প্রতি শত্রুতা নয়।

... আমরা একটি সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। কেননা ভারত সরকারের সাথে একটি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কথা বলা উচিত। এদিকে সরকার গঠনের জন্যে বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে চাপ আসা অব্যাহত রয়েছে। সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাইকে খুবই চিন্তিত মনে হয়। অস্ফুটস্বরে তিনি বলে ফেলেন বংগবন্ধু আমাকে কি বিপদে ফেলে গেলেন। আমি বিরক্তির সাথে জানতে চাইলাম সরকার গঠনের ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাই দিধাগ্রস্থ কেন? জবাবে তাজউদ্দিন ভাই বলেন, আপনি আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি জানেন না। সরকার গঠন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝি। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তা প্রয়োজন। কিন্তু বংগবন্ধু ও অন্যান্য নেতাদের অনুপস্থিতিতে সরকার গঠন করে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

... তাজউদ্দিন ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কাকে নিয়ে সরকার গঠন করা হবে? আমি স্বাভাবিক উত্তর দিলাম। বংগবন্ধু সরকার গঠন করে যেতে গেছেন। আমি বললাম, যে ৫ জন নিয়ে বংগবন্ধু হাই কম্যান্ড গঠন করেছিলেন, এই ৫ জনকে নিয়েই সরকার গঠন করা হবে। দলীয় প্রধান বংগবন্ধু, সাধারণ সম্পাদক ও তিনজন সহ সভাপতি নিয়ে এই হাই কম্যান্ড পূর্বেই গঠিত হয়েছিল। তাজউদ্দিন ভাই পুনরায় প্রশ্ন করেন, প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? দ্বিধা না করে এবারও জবাব দিলাম, ২৫শে মার্চের পর থেকে আজ পর্যন্ত যিনি প্রধান দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনিই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের দায়িত্ব পালন করবেন। তাজউদ্দিন ভাই অনেকক্ষণ ভাবলেন। ... সকল কৃতিত্ব বংগবন্ধুকে দিয়ে তিনি নিজেকে সর্বদাই দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন। তাই আমি যখন বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার নেয়ার জন্যে তার নাম প্রস্তাব করি তখন এই প্রস্তাব মেনে নিতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল।

... আমাদের আর একটি চিন্তা হলো বংগবন্ধুকে সরকারের প্রধান করা হলে আমাদের আন্দোলনের ব্যাপারে কি প্রতিক্রিয়া হবে। ... শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, ফলাফল যাই হোক, বংগবন্ধুকে সরকারের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করতে হবে।

... তারপর কথা উঠলো দেশের নাম কি হবে? আমি বললাম, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। তাজউদ্দিন ভাই এর পছন্দ হলো। নামটি ঠিক করার সময় আমাদের মাথায় গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কথা মনে হচ্ছিল।

... এই দিন সন্ধ্যার পর রেহমান সোবহান ও ডঃ আনিসুর রহমান আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। রেহমান সোবহান এর আগে একবার দেখা করে গেছেন। ... সারাদিন আমি তাজউদ্দিন ভাইএর বক্তৃতা তৈরী করছি। রেহমান সোবহান বক্তৃতার খসড়া রচনায় আমাকে সহায়তা করেন। সেইদিনই তার কাছে জানতে পারি যে, ডঃ কামাল হোসেন গ্রেফতার হয়েছেন। রেহমান সোবহান জানান, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করবেন। ... এক সময় চোখের জলে বক্তৃতার খসড়ার এক অংশ ভিজে গেল। চোখ মুছে আবার লিখতে শুরু করি। লেখা শেষ হলে সমস্ত বক্তৃতাটা তাজউদ্দিন ভাইকে শোনাই।

Scanned by CamScanner

রাজনৈতিক খসড়া প্রণয়নে তাজউদ্দিন ভাই খুবই দক্ষ। ... প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতেন। এমনিভাবে চূড়ান্ত বক্তৃতা তৈরী হতো। ... আমার হাতের লেখা খুব ভাল নয়। তাজউদ্দিন ভাইয়ের বক্তৃতা টেপ করতে হবে। আমি একটি টেপ রেকর্ডারের ব্যবস্থা করি। তিনি সমস্ত বক্তৃতা নিজের হাতে লিখে নিলেন। চট্টোপাধ্যায় তার নিজের হাতে আরো একটা কপি করে নেন।

... পরদিন তাজউদ্দিন ভাই দ্বিতীয়বারের মত ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেন। ইন্দিরা গান্ধী জানান, বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ... ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাজউদ্দিন ভাই বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন। সিদ্ধান্ত হয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ভারতের মাটিতে অবস্থান করতে পারবে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, তাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ এবং শরণার্থীদের আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর প্রচারের জন্য একটি বেতার ষ্টেশন স্থাপনের বিষয়ও আলোচনা হয়।

... স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য ভারত সরকার একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলকে আমাদের সাথে দেন। ঐ জেনারেলের নাম নগেন্দ্র সিং।

... দিল্লীতে বসেই তাজউদ্দিন ভাইয়ের বক্তৃতা টেপ করা হয়। বক্তৃতার পূর্বে আমার কণ্ঠ থেকে ঘোষণা প্রচারিত হয় এখন তাজউদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশে বক্তৃতা দেবেন। এরপর তাজউদ্দিন ভাই বক্তৃতা শুরু করেন।

... আমরা বিমানে করে আবার কলকাতা ফিরে এলাম। এখানে এসে জানলাম মনসুর ভাই ও কামরুজ্জামান (হেনা ভাই) এসেছেন। ... শেখ ফজলুল হক মনি ঐ বাড়ীতে আছেন। পরে আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও সিরাজুল ইসলাম খান (সম্ভবত সিরাজুল আলম খান হবে-লেখক) এই বাড়ীতে ঘাঁটি করেন। .. আমি ও তাজউদ্দিন ভাই কামরুজ্জামান ভাইয়ের কাছে দেখা করতে গেলাম। ... কামরুজ্জামান ভাইয়ের মনে একটা জিনিস ঢুকানো হয়েছে যে আমরা তাড়াহুড়া করে দিল্লী গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেছি। নেতাদের জন্য অপেক্ষা করা আমাদের উচিত ছিল। শেখ মনি আমাকে অন্য একটি ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। ... তিনি বুঝাতে চাইলেন তাঁরা একটি শক্তিশালী গ্রুপ এবং তাঁদের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর পূর্ব থেকেই যোগাযোগ রয়েছে।

আমাদের সরকার গঠনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন এমন অনেক এম পি এ, এম এন এ ও আওয়ামী লীগ নেতা কলকাতায় এসেছেন। ... একটা জিনিস বুঝতে পারলাম আমাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। ... আর এতে ভালভাবে সুর মিলিয়েছেন মিজানুর রহমান চৌধুরী। তাজউদ্দিন ভাই আমাকে ডেকে বললেন, আপনাকে আগেই বলেছিলাম। এই দল দিয়ে কি স্বাধীনতা যুদ্ধ হবে?

... আমাদের নেতাদের বিভিন্নমুখী বৈঠকে তাজউদ্দিন ভাই ও আমি বিশেষভাবে বিব্রতবোধ করছি। ...রাতের বেলা লর্ড সিনহা রোডে আমাদের বৈঠক বসল। উপস্থিত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন কামরুজ্জামান, মিজান চৌধুরী, শেখ মনি, তোফায়েল আহমদ ও আরও অনেকে। শেখ মনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শত্রু শিবিরে বন্দী, বাংলার যুবকরা বুকের তাজা রক্ত দিচ্ছে, এখন কোন মন্ত্রীসভা গঠন করা চলবে না। মন্ত্রী-মন্ত্রী খেলা এখন সাজে না। এখন যুদ্ধের সময়। সকলকে রণক্ষেত্রে যেতে হবে। রণক্ষেত্রে গড়ে উঠবে আসল নেতৃত্ব। এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করতে হবে। ... তাজউদ্দিন ভাই ও আমি ছাড়া বৈঠকে

Scanned by CamScanner

উপস্থিত প্রায় সকলে শেখ মনির বক্তব্য সমর্থন করেন। ... উপস্থিত প্রায় সকলেরই ধারণা ছিল আমি ও তাজউদ্দিন ভাই আগে ভাগে দিল্লী গিয়েছি ক্ষমতা কুক্ষীগত করার জন্য।

... আমি আরও বললাম, বাংলাদেশ বার ভূঁইয়ার দেশ। বারটি বিপ্লবী কাউন্সিল গড়ে ওঠা বিচিত্র কিছু নয়। আমাদের অবশ্যই আইনগত সরকার দরকার। কেননা, আইনগত সরকার ছাড়া কোন বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের সাহায্য করবে না। ... যে কোন জনগোষ্ঠীর তাদের নির্বাচিত সরকার দ্বারা শাসিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষের সে গণতান্ত্রিক অধিকারের অবমাননা করেছে। তাই আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার হরণই হচ্ছে জনগণের অধিকার হরণ। আমার বক্তব্যের পর মিজান চৌধুরী ও শেখ মনি ছাড়া উপস্থিত প্রায় সকলে তাদের পূর্বের মনোভাব পরিবর্তন করেন।

কামরুজ্জামান ভাই আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, শেখ মনির কথানুযায়ী বিপ্লবী পরিষদ গঠন করা যায় কিনা। আমি তাকে বললাম, তা করা হলে যুদ্ধ বিপন্ন হবে। তিনি আমার কথার আর কোন প্রতিবাদ করলেন না। ... সভার শেষ পর্যায়ে তাজউদ্দিন ভাই বক্তৃতা দেন। উপস্থিত সকলে সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য মেনে নিলেন।

১০ই এপ্রিল বিভিন্ন অঞ্চল সফরের জন্য আমাদের বের হবার কথা রয়েছে। ... বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমাদের দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করাই এই সফরের উদ্দেশ্য। ... পরদিন খুব ভোরে গাজা পার্কের বাড়ীতে কামরুজ্জামান ভাই এর সাথে দেখা করে তাকে বিস্তারিত সব কিছু অবহিত করি। ... তাজউদ্দিন ভাই এর অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে তার আর কোন আপত্তি রইলোনা।

... ১০ই এপ্রিল। বিমানে আমাদের আগরতলা রওয়ানা হওয়ার কথা। তাজউদ্দিন ভাই, মনসুর ভাই, শেখ মনি, তোফায়েল আহমদ ও আমি লর্ড সিনহা রোড থেকে সোজা বিমান বন্দরে যাই। ... খুব নীচু দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে। ... উত্তর বঙ্গ তথা রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা অঞ্চলের কোন নেতা খুঁজে পাওয়া গেল না। এদের বেশীরভাগ কোলকাতা এসে গেছেন।

... মনসুর ভাই এর জ্বর এসে গেছে। তিনি শুয়ে আছেন। ... তিনি মত দিলেন তাজউদ্দিন ভাই প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি কোন আপত্তি করবেন না। ... পাঁচজন নেতার মধ্যে তিন জনের সাথে আলাপের পর আমার খুব বিশ্বাস হয়েছিল যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন ভাই এর প্রধানমন্ত্রীত্বে কোন আপত্তি করবেন না। তাছাড়া তাকে উপরাষ্ট্রপতি করা হয়েছে। বংগবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এখন বাকী রইলো খন্দকার মোশতাক আহমদ। শুধু তিনি আপত্তি করতে পারেন। ... তবুও চারজন এক থাকলে মোশতাক ভাইকেও রাজী করানো যাবে। এখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন ভাই এর প্রথম বক্তৃতা প্রচার করার পালা। তাজউদ্দিন ভাই প্রচারের জন্য চোখে অনুমতি দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ড করা বক্তৃতার ক্যাসেট গোলক মজুমদারের কাছে দেয়া হলো।

... শেখ মনির সাথে কথাবার্তা শেষে তাজউদ্দিন ভাই আমাকে ডাকেন। তিনি জানান, শেখ মনি এখন সরকার গঠনের ব্যাপারে রাজী নন। আগরতলা গিয়ে দলীয় এম পি, এম এন এ ও নেতা-কর্মীদের সাথে বৈঠক শেষে শেখ মনি সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছেন। আর এটা করা না হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

Scanned by CamScanner

আমি সরকার গঠনের পক্ষে পুনরায় যুক্তি দিলাম। ... ইতিমধ্যে বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে আমাদের কিছুটা রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সরকার গঠনে বিলম্ব হলে তাও নস্যাৎ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ... ভারত সরকারও জানেন, আমাদের বক্তৃতা শিলিগুড়ির এই জঙ্গল থেকে আজ প্রচারিত হবে। ... বেশী করে বুঝাতে চাইলে শেখ মনি জানান, তারা বংগবন্ধু থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অতএব তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কারো প্রশ্ন তোলা উচিৎ নয়। এ সময় তাজউদ্দিন ভাই আমাকে বলেন, আমি যেন গোলক মজুমদারকে জানিয়ে দেই যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা আজ প্রচার করা হবে না।

... গোলক মজুমদারকে ফোন করে জানাই যে আজ বক্তৃতা প্রচার করা হবে না। ... তিনি বলেন, যে মুহূর্তে সব কিছু ঠিকঠাক সে মুহূর্তে তা স্থগিত রাখলে সব মহলে যে প্রশ্ন দেখা দেবে, তা আমরা ভেবে দেখছি কিনা। ইতিমধ্যে রেকর্ড করা ক্যাসেট নির্ধারিত স্থানে (জঙ্গলে) পৌছে গেছে।

আমি গোলক মজুমদারকে বললাম ক্যাসেট যদি পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে প্রচার করে দিন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই একটি মাত্র সিদ্ধান্ত এককভাবে নিয়েছিলাম। এই দিন ছিল দশই এপ্রিল। রেডিও অন করে রেখে খেতে বসেছি। খাওয়ার টেবিলে তাজউদ্দিন ভাই ও শেখ মনি আছেন। রাত তখন সাড়ে নটা। সেই আকাংখিত মুহূর্ত আসলো। প্রথমে আমার কণ্ঠ ভেসে আসল। ঘোষণায় আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এখন বক্তৃতা দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা প্রচারিত হল। সারা বিশ্ববাসী শুনলো স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা।

... শেখ মনি তাজউদ্দিন ভাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাকে প্রধানমন্ত্রী করার ব্যাপারে তিনি আগরতলা গিয়ে সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। কিন্তু আগরতলা গিয়ে শেখ মনি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি কসবাতে সংসদ সদস্যা মমতাজ বেগমের বাড়ীতে চলে যান। তাজউদ্দিন ভাই এর বক্তৃতা প্রচারের পর অনেক রাতে কর্নেল (অবঃ) নুরুজ্জামান (সেকটর কমান্ডার) ও আবদুর রউফ (রংপুর) আসেন। গভীর রাত পর্যন্ত তাদের সাথে আলোচনা করি।

... আমি অবাংগালীদের ওপর হামলা না করার পরামর্শ দিলাম। অবাংগালী বিহারীদের ওপর জনগণ ক্ষুব্ধ। রংপুর ও সৈয়দপুরে বেশ কিছু বিহারী রয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যে কোন কোন স্থানে এদের ওপর বিচ্ছিন্ন হামলা হয়ে গেছে। ... আলোচনা করতে করতে রাত প্রায় ভোর হয়ে গেল।

... পরদিন ১১ই এপ্রিল সকালে নাশতা করে আমরা বিমানে উঠি। আগের রাতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পর থেকেই শেখ মনি চুপচাপ রয়েছেন। বক্তৃতার কথা শুনে মনসুর ভাই উৎফুল্ল। রাতের বিশ্রামের পর মনসুর ভাই কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ... পরে বি এস এফ এর স্থানীয় অফিসার জানান, ঢালু পাহাড়ের নীচে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আবদুল মান্নান রয়েছেন। ...প্রায় আড়াই ঘন্টা পরে তাঁরা দু'জন আসলেন।

... সৈয়দ নজরুল ইসলাম তার গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন। আমাদের খবর পেয়ে নজরুল ভাই ও তার ভাই যথেষ্ট উৎসাহিত হন। নজরুল ভাইকে তাজউদ্দিন ভাই ডেকে নিয়ে একান্তে কথা বলেন। গত কয়েক দিনের ঘটনাবলী তাকে অবহিত করা হয়। আমরা বাইরে বসে আছি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন ভাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোবারকবাদ জানান। ...আমাদের আগরতলা পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

... ইতিমধ্যে আগরতলায় অনেক নেতা এসে পৌছেছেন। কর্নেল ওসমানীর সাথে দেখা হলো। ... আগের রাতে খন্দকার মোশতাক এসেছেন। ... এম আর সিদ্দিকী কয়েক দিন পূর্বে

আগরতলা এসেছেন। চট্টগ্রাম থেকে জহুর আহমদ চৌধুরী এবং সিলেট থেকে আব্দুস সামাদও এসে গেছেন। তাছাড়া সেখানে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও মাহবুব আলী চাষী ছিলেন। ... ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনী প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হলো। তিনি এর পূর্বশর্ত হিসেবে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামের কথা উল্লেখ করেন।

... শেষ পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক মন্ত্রী সভায় থাকতে রাজী হলেন। তবে একটা শর্ত হলো, তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিতে হবে। ... সবাই এতে রাজী হলেন। ... উপস্থিত সকলে এক বাক্যে আলহামদু লিল্লাহ পড়লেন। সকলে জহুর ভাইকে মোনাজাত করতে অনুরোধ করলেন। তিনি কয়েকদিন পূর্বে পবিত্র হজ ব্রত পালন করে এসেছেন। তার মাথায় তখনো মক্কা শরীফের টুপি। তিনি আধ ঘন্টা ধরে আবেগ প্রবণভাবে মোনাজাত পরিচালনা করেন। তার মোনাজাতে বঙ্গবন্ধুর কথা, পাক দস্যুদের অত্যাচার, স্বজন হারানো, দেশবাসীসহ শরণার্থীদের কথা এলো। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। অনেকের চোখে পানি এসে গেল। এই মোনাজাতের মাধ্যমে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিলাম।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আগরতলায় অনুষ্ঠিত বৈঠককে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের প্রথমে বৈঠক বলা যেতে পারে। তাজউদ্দিন ভাই ও আমার প্রচেষ্টায় যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল বৈঠকে সবগুলোর অনুমোদন দেয়া হয়। ... ১৩ই এপ্রিল ছোট বিমানে কলকাতা ফিরে গেলাম।

... মন্ত্রীসভার আনুষ্ঠানিক শপথের জন্যে ১৪ই এপ্রিল দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছিল। শপথের স্থানের জন্যে আমরা চুয়াডাঙ্গার কথা প্রথমে চিন্তা করি। কিন্তু ১৩ই এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী চুয়াডাঙ্গা দখল করে নেয়। ... শেষ পর্যন্ত মানচিত্র দেখে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলাকে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ... ১০ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী প্রথম যে ভাষণ দেন, তার কপি ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় করা হয়েছিল। ইংরেজী কপি বিদেশী সাংবাদিকদের দেয়া হয়। সবচেয়ে বড় কাজ হলো স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করা।

... স্বাধীরতার ঘোষণা পত্রের খসড়া রচনার পর তাজউদ্দিন ভাইকে দেখালাম। তিনি পছন্দ করলেন। ... ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীরা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের স্বপক্ষে সমর্থন দিয়েছেন। এদের মধ্যে সুব্রত রায় চৌধুরীর নাম আমি শুনেছি। ... সুব্রত রায় চৌধুরীর বাসায় পৌছে তাকে আমার প্রণীত ঘোষণাপত্রের খসড়াটি দেখালাম। খসড়াটি দেখে তিনি আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন। এই খসড়া আমি করেছি কি-না জিজ্ঞাসা করলেন। আমি হাঁ সূচক জবাব দেই। তিনি বলেন, একটা কমা বা সেমিকোলন বদলাবার কোন প্রয়োজন নেই।

... শপথ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের হাজির করার ভার ছিল আমার ও আব্দুল মান্নানের ওপর। ১৬ই এপ্রিল আমরা দু'জনে কলকাতা প্রেস ক্লাবে যাই। ... সমবেত সাংবাদিকদের পরদিন ১৭ই এপ্রিল কাক ডাকা ভোরে এই প্রেস ক্লাবে হাজির হতে অনুরোধ জানাই।

... আওয়ামী লীগের এম পি এ, এম এন এ এবং নেতাদের খবর পাঠিয়ে দেই রাত বারোটার মধ্যে লর্ড সিনহা রোডে সমবেত হওয়ার জন্যে।

বি এস এফ এর চট্টপাধ্যায়কে বলি আমাদের জন্যে ১০০টি গাড়ীর ব্যবস্থা করতে। এর ৫০টা থাকবে প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের বহন করার জন্যে। অবশিষ্ট ৫০টার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতাদের বাংলাদেশ সীমান্তে পৌছানো হবে।

Scanned by CamScanner

... ১৭ই এপ্রিল জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের দিন। ... আমি ও আব্দুল মান্নান ভোরের দিকে পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী কলকাতা প্রেসক্লাবে যাই। সেই ভোরেও ক্লাবে লোক ধরেনি। ক্লাবের বাইরেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে বিনীতভাবে বললাম, আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আপনাদের জন্য একটা বার্তা নিয়ে এসেছি। তাদের জানালাম স্বাধীন বাংলার মাটিতে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করবেন। আপনারা সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত। ... উৎসাহিত সাংবাদিকরা গাড়ীতে ওঠেন। তাদের অনেকের কাঁধে ক্যামেরা। ... শপথ অনুষ্ঠানের নির্ধারিত স্থান আম্রকাননে পৌছতে ১১টা বেজে গেল।

... মাহবুব ও তওফিক এলাহী আস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। আগেই ঠিক করা হয়েছিল যে চীপ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার সনদ পাঠ করবেন।

... কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো। একটি ছোট্ট মঞ্চে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ, ওসমানী, আবদুল মান্নান ও আমি। আবদুল মান্নান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এই স্থানের নাম 'মুজিব নগর' নামকরণ করেন। ১৬ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত মুজিব নগর ছিল অস্থায়ী সরকারের রাজধানী।

সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রধান প্রশ্ন সরকারের প্রধান বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়? জবাবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা বংগবন্ধুর নির্দেশেই মন্ত্রিসভা গঠন করেছি।"

ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম-এর উল্লিখিত বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমিত হবে যে আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম করার কোনোরূপ পূর্ব পরিকল্পনা তো ছিলোই না, এমনকি বিরূপ বা উদ্ভূত পরিস্থিতির বিপরীতে কি করতে হবে তেমন কোনোরূপ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও ছিল না, শেখ মুজিবের অবর্তমানে কাকে-কাকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে তারও কোনোরূপ দিক নির্দেশনা ছিল না। এমনকি দেশের নাম কি হবে তাও ছিল অজানা।

উপরে উল্লিখিত বক্তব্যগুলো থেকে সহজেই অনুমেয় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের কোনোরূপ পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। চট্টগ্রামের সর্বজনাব এম,আর, সিদ্দিকী এবং জহুর আহমদ চৌধুরী সেখানে সেদিন কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রেরিত কোনোরূপ স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। অথচ ১০ই এপ্রিল জনাব তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে অযথার্থ বক্তব্যের আশ্রয় নিয়ে শেখ মুজিবের পক্ষে যেমন বললেন, ২৫শে মার্চ মাঝরাতে ইয়াহিয়া খান তার রক্তলোলুপ সাঁজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের উপর লেলিয়ে দিয়ে যে গণহত্যা যজ্ঞের সুরু করেন "তা প্রতিরোধ করবার আহবান জানিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন", ঠিক তেমনই ১৭ই এপ্রিল চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলীও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে অযথার্থ বক্তব্যের

Scanned by CamScanner

আশ্রয় নিয়ে শেখ মুজিবের পক্ষে বললেন, যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান "বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখন্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান"।

উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই চট্টগ্রামের জনাব এম.এ, হান্নান এবং নোয়াখালীর জনাব আব্দুল মালেক উকিলের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট থেকে তাঁদের নিকট স্বাধীনতা ঘোষণা সংক্রান্ত বার্তা প্রাপ্তি বা শেখ মুজিবের পক্ষে সে বক্তব্য বেতারে পাঠ করা সংক্রান্ত কোন বিষয়ের উল্লেখ ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম তাঁর সুদীর্ঘ বক্তব্যে উল্লেখ করেননি।

কর্নেল শাফায়াত জামিল তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন, "২ এপ্রিলের পর কোনো এক সময় কর্নেল (অব) ওসমানী ঢাকা থেকে পালিয়ে কুমিল্লার মতিনগর সীমান্ত পার হন। বি এস এফ-এর বিগ্রেডিয়ার পান্ডে তাঁকে আমাদের তেলিয়াপাড়া হেড কোয়ার্টারে নিয়ে আসেন। কর্নেল ওসমানীকে তো প্রথমে চেনাই যচ্ছিল না। তাঁর সুপরিচিত গোঁপ উধাও! প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা বললেন না ওসমানী।"

এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের কথিত স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে এবং করণীয় সম্পর্কে কর্নেল এম,এ,জি, ওসমানীও কিছুই জানতেন না। এককথায় দিকনির্দেশনা নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের কোন ভাবনাই ছিল না।

জনাব অলি আহাদ তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন, "যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত বাংলা জাতীয় লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এম, এম, আনোয়ারের উদ্যোগে আগরতলা এসেমব্লি মেম্বার রেস্ট হাউসে আমার ও আওয়ামী লীগ নেতা এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য আবদুল মালেক উকিলের মধ্যে সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর এক দীর্ঘ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্ত অবধি কোন নির্দেশ দান করেন নাই। এইদিকে মুজিব-ইয়াহিয়ার মার্চ-এর আলোচনার সূত্র ধরিয়া কনফেডারেশন প্রস্তাবের ভিত্তিতে সমঝোতার আলোচনা চলিতেছে। জনাব মালেক উকিল আমাকে ইহাও জানান যে, তিনি এই আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে আশাবাদী। প্রসংগত ইহাও উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে আমি সর্বজনাব আবদুল মালেক উকিল, জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল হান্নান চৌধুরী, আলী আজম, খালেদ মোহাম্মদ আলী, লুৎফুল হাই সাচ্চু প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতার সহিত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে আলোচনাকালে নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বা লক্ষ্য সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিয়াছিলেন কি না, জানিতে চাহিয়াছিলাম। তাহারা সবাই স্পষ্ট ভাষায় ও নিঃসংকোচে জবাব দিলেন যে, ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর আকস্মিক অতর্কিত হামলার ফলে কোন নির্দেশ দান কিংবা পরামর্শ দান নেতার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।"

আসলে ১৯৭১ খ্রী ২৫ মার্চ দিনগত রাতে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর যখন 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে নৃশংস আক্রমণ শুরু করে, তাদের নির্মম হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যখন হতবিহবল হয়ে পড়ে, জনগণের জন্য সেদিন কোন দিক নির্দেশনা দিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সহ গোটা পার্টিই ব্যর্থ হয়েছে। এমন কি

Scanned by CamScanner

শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মসমর্পণের পরে তাঁদের মধ্য থেকে ঢাকার জনগণকে আহবান জানানোর মত তেমন উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বও খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ তাঁরাই জনগণকে আহবান জানিয়েছিলেন "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।" তবে, জনগণ তাঁদের প্রতিরোধ বন্ধ করেননি। কারণ, আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্ত না দিলেও ১লা থেকে ৭ই মার্চ ঘটমান ঘটনাবলীর পর থেকে ই পি আর সহ সশস্ত্র বাহিনীর বাঙ্গালী অফিসার ও সৈনিকদের প্রায় সকলে এবং জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে একটি নতুন রাষ্ট্র কায়েমের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে ফেলেছিলেন। পরবর্তীতে ২৫শে মার্চের ইয়াহিয়া-হামিদ-ভুট্টো-কাইয়ুমদের সুপরিকল্পিত আক্রমণের পর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্য থেকে গুটি কয়েক দালাল ও তাদের বংশবদ এবং ভারত থেকে এখানে এসে বসবাসকারীদের একটি অংশ ছাড়া আর কেউ পাকিস্তানী হয়ে বাঁচতে চাননি। যে কারণে সকল আওয়ামী লীগ নেতা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকলেও জনগণ থেমে থাকেননি, সমস্ত শক্তি দিয়ে তারা প্রতিরোধ চালিয়েছেন। তৎকালীন ঢাকার দিলকুশা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি (দিলকুশা ইউনিয়নের মধ্যে তখন পুরানা পল্টন, গভর্ণর হাউস, মতিঝিল ও দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ফকিরাপুল, আরামবাগ, কমলাপুর ও গোপীবাগের কিছু অংশ ছিলো), যিনি ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যও ছিলেন, তিনি ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকার দক্ষিণ কমলাপুরের বাড়িতে পৌছে সদর দরজার বাইরে তালা লাগিয়ে, টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে, ঘরের সব ইলেক্ট্রিক বাল্ব খুলে রেখে ঘরে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়ে যা শুনেছেন তার বর্ণনা তিনি নিজেই, অর্থাৎ, মুহাম্মদ নূরুল কাদির তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন, "২৬শে মার্চ দিনে চারিদিকে নিস্তব্ধতা বজায় রইল। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ করে কমলাপুর স্টেশন এবং রেল লাইন এর দিক থেকে বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছিল। রাতে মতিঝিল, গোপীবাগ, মানিকনগর ও কমলাপুর স্টেশনের দিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ বেশ বৃদ্ধি পেল। ... ২৭শে মার্চ দিন চলে গেল, এলো রাত। রাতে মুগদাপাড়া, ফকিরাপুল, পুরানাপল্টন ও কমলাপুর স্টেশনের দিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আরও বৃদ্ধি পেলো।"

এ প্রসঙ্গে সিদ্দিক সালিক তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন, "ঢাকাকে এক রাতেই অসাড় করে দেয়া হল। কিন্তু প্রদেশের বাকী অঞ্চলের অবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেল। বিশেষ করে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও পাবনার পরিস্থিতি আমাদেরকে বেশ কয়েকদিন ধরে উদ্বেগের মধ্যে রাখে।

চট্টগ্রামে বাঙ্গালী ও পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকের সংখ্যাছিল যথাক্রমে প্রায় ৫ হাজার ও ৬ শত। বাঙ্গালী সৈনিকদের মধ্যে ছিল ইস্ট বেঙ্গল সেন্টারে নবগঠিত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল-এর নতুন (২,৫০০) প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা। ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর উইং ও সেক্টর হেড কোর্যার্টার-এর রাইফেলসরা ও পুলিশ বাহিনী। আমাদের সৈনিকরা ছিল মূলতঃ ২০ বালুচ-এর সৈনিকরাই। এদের অগ্রগামী অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। চট্টগ্রামে অবাঙ্গালীদের মধ্যে সিনিয়র অফিসার ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমী। তাকে আদেশ দেয়া হল, কুমিল্লা থেকে অতিরিক্ত সৈনিক না পৌছানো পর্যন্ত তিনি যেন পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে ধরে রাখার চেষ্টা করেন।

প্রাথমিকভাবে বিদ্রোহীরা সব রকমের সাফল্য নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয়। (৭ই মার্চ বা তার আগে বা ২/৩ দিন পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে প্রায় সর্বত্র ঐ একই ঘটনা ঘটত এবং তখন কোন সেক্টরেই সাহায্যার্থে অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা ইয়াহিয়া খানদের পক্ষে সম্ভব হ'ত না—লেখক)। ফেনীর কাছাকাছি শুভপুর ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে কুমিল্লা থেকে আগমনকারী সেনাদলের

Scanned by CamScanner

পথ কার্যকরভাবে বন্ধ করে দেয়। চট্টগ্রাম শহর ও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের মূল অংশগুলি তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলে। ২০ বালুচের এলাকা ও নৌবাহিনীর ঘাঁটিই শুধু সরকারী কর্তৃত্বাধীনে ছিল। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল-এর দ্বিতীয় ব্যক্তি মেজর জিয়াউর রহমান ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের অনুপস্থিতিতে (যাকে কয়েকদিন আগে কৌশলে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল) চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রেডিও স্টেশন প্রহরারত সরকারী সৈন্যরা সেখানে শক্তভাবেই অবস্থান করছিল। কাপ্তাই রোডে ছিল আলাদা একটা ট্রান্সমিটার। মেজর জিয়া সেটা দখল করে নিলেন এবং বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' প্রচারের জন্যে প্রাপ্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার করলেন।"

সিদ্দিক সালিক আরো লিখেছেন, "২৬শে মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিলের মধ্যে অতিরিক্ত জনবল এবং সমরসম্ভার এসে গেল। এই সময়ের মধ্যে দু'টি ডিভিশনাল সদর দফতর (ডিভিশন-৯ ও ডিভিশন-১৬), পাঁচটি বিগেড হেড কোয়ার্টার, একটি কমান্ডো বাহিনী ও বারটি পদাতিক ব্যাটালিয়ান পৌছে গেল। ... এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখে এবং মে মাসের দুই তারিখে আরো দু'টি পদাতিক ব্যাটালিয়ান ও দু'টি মার্টার ইউনিট এসে গেল। ১০ই এপ্রিল থেকে ২১শে এপ্রিলের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে প্যারা মিলিটারী বাহিনী পাঠানো হলো। সঙ্গে আসা ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড বাহিনী (ই,পি,সি,এ,এফ) এবং পশ্চিম পাকিস্তান রেঞ্জারস্ (ডব্লিউ, পি, আর)। এ ছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্কাউটও আসে। তাদেরকে প্রধানতঃ স্বপক্ষত্যাগী রাইফেলস্ ও পুলিশ বাহিনীর লোকজনদের জায়গায় বসানো হলো।"

২৫ মার্চের কালোরাতে বর্বর দখলদার বাহিনী মধ্যরাত থেকে কুমিল্লা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনগণের উপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মর্টার, মেশিনগান, কামান এবং অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে গোলাগুলি শুরু করে। এভাবে বিভিন্ন এলাকায় এলোপাতাড়ি আক্রমণ চালিয়ে শিশু, কিশোর, যুবক, যুবতী এমনকি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও হত্যা করে। আহত করেছিল অনেককে।

সহজেই অনুমেয় যে, এ সকল সুযোগই দখলদার বাহিনীকে করে দেয়া হয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের সিদ্ধান্তহীনতার ফলে। মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে কয়েক লক্ষ মানুষ নিহত ও আহত হলেন তার জন্যেও সে সকল রাজনৈতিক নেতৃত্ব কোনরূপ দায়ি নন, তা বলা যাবে না। একদিকে উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ আর অন্য দিকে বহুজাতিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব-মন্ত্রিত্ব, এ রূপের দোলকের ন্যায় দোলাই ছিল আওয়ামী লীগের নেতাদের মূল সমস্যা।

জনগণের কর্তৃত্বে তথা নিয়ন্ত্রণে যাওয়া প্রধান প্রধান শহরসমূহ কোন্ কোন্ তারিখে দখলদার বাহিনীর দখলে আসে তারও একটি তালিকা সিদ্দিক সালিক দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া ও পাবনায় আমরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হই। হতাহতও হয় সবচেয়ে বেশী। চট্টগ্রাম পরিষ্কার করা হলো ৬ই এপ্রিল; কুষ্টিয়া ১৬ই এপ্রিলে এবং পাবনা ১০ই এপ্রিলে।" অন্যান্য শহরগুলো দখলদারদের দখলে আসে ঃ পাকশী ১০ই এপ্রিল, সিলেট ১০ই এপ্রিল, ঈশ্বরদী ১১ই এপ্রিল, নরসিংদী ১২ই এপ্রিল, চন্দ্রঘোনা ১৩ই এপ্রিল, রাজশাহী ১৫ই এপ্রিল, ঠাকুরগাঁও ১৫ই এপ্রিল, লাকসাম ১৬ই এপ্রিল, চুয়াডাঙ্গা ১৭ই এপ্রিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১৭ই এপ্রিল, দর্শনা ১৯শে এপ্রিল, হিলি ২১শে এপ্রিল, সাতক্ষীরা ২১শে এপ্রিল, গোয়ালন্দ ২১শে এপ্রিল, দোহাজারী ২২শে এপ্রিল, বগুড়া ২৩শে এপ্রিল, রংপুর ২৬শে এপ্রিল, নোয়াখালি ২৭শে এপ্রিল, শান্তাহার ২৭শে এপ্রিল, সিরাজগঞ্জ ২৭শে এপ্রিল, মৌলভীবাজার ২৭শে এপ্রিল, কক্সবাজার ১০ই মে ও হাতিয়া ১১ই মে।

Scanned by CamScanner

অপরিকল্পিত স্থানীয় উদ্যোগের ফলে যদি এ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে পরিকল্পিত উপায়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে স্বাধীনতা ঘোষণা করে অগ্রসর হলে অবস্থাটা কী দাঁড়াত সহজেই অনুমেয়। ৭ই মার্চ বা তার আগে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করলে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা করত আত্মসমর্পণ। দু'এক জায়গায় কোনোরূপ হঠকারিতা হলেও তা হ'ত ক্ষণস্থায়ী। আর ২৫শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করে আমরা যদি আক্রমণকারীর ভূমিকায় যেতাম তাহলে যুদ্ধ হ'ত সংক্ষিপ্ত। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানিদের অতিরিক্ত জনবল এবং সমরসম্ভার আনার কোন সুযোগই থাকত না। উপরন্তু, সে ক্ষেত্রে জনগণের সর্বব্যাপী অংশগ্রহণের ফলে এখানে রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস্ প্রভৃতি বাহিনী গঠনের কোন সুযোগই পেত না শত্রুপক্ষ। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়াটা ছিল সহজ বিষয়। তখন ভারতীয় বলয় বা সোভিয়েত ব্লক ইত্যাদি বলে অবজ্ঞার সুযোগ ছিল না। আর পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা হ'ত পাকিস্তানকে দুর্বল করার ভারতীয় আকাঙ্খার প্রতিফলন, ভারত পাকিস্তান ভাঙ্গার সে সুযোগ শুধু স্থানীয় ভাবেই নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও কাজে লাগাবার সমস্ত প্রয়াস চালাত নিজের গরজেই।

জিয়াউর রহমান তখন সেনাবাহিনীর একজন মেজর ছিলেন। সে সময়কালে কি দেখেছেন, কি করেছেন ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী পর্যায়ে "যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ জিয়াউর রহমান রচনা করেছিলেন। তাতে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ "১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ড। ...চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটেলিয়নকে গড়ে তোলার কাজে। এটা ছিল রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটেলিয়ন। এটার ঘাঁটি ছিল ষোলশহর বাজারে। ...আমাদের তখন যে সব অস্ত্র-শস্ত্র দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল ৩শ পুরনো ০০৩ রাইফেল, চারটা এলএমজি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগন্য। আমাদের এন্টিট্যাঙ্ক বা ভারি মেশিনগান ছিল না। ফেব্রুয়ারির শেষদিকে বাংলাদেশের যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরনোন্মুখ হয়ে উঠেছিল তখন আমি একদিন খবর পেলাম তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারী বাড়িগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারীদের ট্রেনিং দিচ্ছে, এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমি পেলাম।

... এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখার জন্যে লোক লাগায়। ... আমরা তখন আশংকা করছিলাম, আমাদের হয়তো নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাওয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালি হত্যা ও বাঙালি দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে। ... আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্নেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে, স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকল।

Scanned by CamScanner

... শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললাম। আশা করলাম, পাকিস্তানী নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানীদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিনদিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানি করা হলো। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো অস্ত্র-শস্ত্র আর গোলাবারুদ। ... চট্টগ্রামে নৌ-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হল।

...১৭ মার্চ স্টেডিয়ামে ই বি আর সির লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম,আর, চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লেঃ কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে।

দুদিন পর ইপিআর এর ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেবার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনাভুক্ত করলাম।

...২১ মার্চ জেনারেল আবদুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফলের উদ্দেশ্য। সেদিন রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজ সভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমীকে বললেন, 'ফাতমী, সংক্ষেপে, ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ করতে হবে।' আমি এ কথাগুলো শুনেছিলাম।

২৪ মার্চ বিগ্রেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। ' ধ্বায় পাকিস্তানী বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ 'সোয়াত' থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যেই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান। পথে জনতার সাথে ঘটলো তাদের কয়েকদফা সংঘাত। এতে নিহত হলো বিপুল সংখ্যক বাঙালি।

...তারপর এলো সেই কালোরাত। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালো রাত। রাত ১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারির কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌবাহিনীর (পাকিস্তানী) প্রহরী থাকবে তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটালিয়নের একজন পাকিস্তানী অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে, সে যাবে আমাকে গার্ড দিতে।

...আমরা বন্দরের পথে বেরোলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। সেই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন অলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা নিয়ে এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বললো 'তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে ওরা হত্যা করেছে।' এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম, 'আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলি আহমদকে বলো ব্যাটেলিয়ান তৈরি রাখতে আমি আসছি।'

...আমি কমান্ডিং অফিসারের জীপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। তার বাসায় পৌছে হাত রাখলাম কলিং বেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলা শুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম।

Scanned by CamScanner

দ্রুত গতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, 'বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষী সোনার মতো আমার সঙ্গে এসো।' সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটেলিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। জানালাম, আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো। ব্যাটেলিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম. আর, চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগে টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট, কমিশনার, ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা। এদের সাথে আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু কাউকে পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হলো। সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটেলিয়নের অফিসার, জেসিও আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্ট চিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।

তখন রাত ২টা বেজে ১৫মিনিট। ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সাল।"

এ বক্তব্য থেকে এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, ২৫শে মার্চ দিনগত ভোররাত্র ২টা ১৫ মিনিট (অর্থাৎ ২৬ মার্চ) পর্যন্ত মেজর জিয়াউর রহমান রেডিওতে কোনরূপ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নি। কাজেই যারা অতি উৎসাহী হয়ে মেজর জিয়া ২৫ মার্চ রেডিওতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বলেছেন, তা তারা বলছেন কোনরূপ বস্তুগত ভিত্তি ছাড়াই। ২৬শে মার্চ ভোররাত্র ২টা ১৫ মিনিটের পরে ২৬শে অথবা ২৭শে মার্চ কোন এক সময় জনগণের কাছে অজানা-অচেনা একজন, মেজর জিয়াউর রহমান "প্রিয় দেশবাসী, আমি মেজর জিয়া বলছি" বলে চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম নিজেকে বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার ও সাময়িক সরকার প্রধান ঘোষণা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি সে বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ডাক দেন এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা প্রচার করেন। মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ণ বয়ানটি সরকারীভাবে সংরক্ষিত না হওয়ার বিষয়টি জাতির জন্য দুঃখজনক। মেজর জিয়ার সে ঘোষণাটি ছিল প্রথমে ইংরেজীতে যার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ ছিল বলে জানা যায় ঃ

"I Major Zia, as supreme Commander of Bangladesh liberation forces and provisional Head of the Government do herely declare the independence of Bangladesh.

"I appeal to all government to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh."

বাংলায় প্রাপ্ত সে ভাষণটির অংশবিশেষ নিম্নরূপ ছিল বলে জানা যায় ঃ আমি মেজর জিয়া, বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার ও সাময়িক সরকার প্রধান হিসেবে এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। প্রিয় দেশবাসী, আপনারা যে যেখানে আছেন, বেসামরিক লোকজন,

Scanned by CamScanner

আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন। আমি বিশ্বের শান্তিকামী সকল দেশের সরকারকে বাংলাদেশের বর্বরোচিত গণহত্যার বিরুদ্ধে তাদের নিজ নিজ দেশের জনমত গড়ে তোলার জন্য সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি।

জে,এস, গুপ্তের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক একটি ঘোষণা আসে ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিটের সময়। সে ঘোষণায় তিনি বলেন,

"This is Swadhin Bangla Betar Kendra. I, Major Ziaur Rahman, at the direction of Bango Bondhu Mujibur Rahman, hereby declare that the independent People's Republic of Bangladesh has been established. At his direction, I have taken command as the temporary head of the republic. In the name of Shaikh Mujibur Rahman, I call upon all Bengalis to rise against the attack by the west Pakistani Army. We shall fight to the last to free our motherland. By the grace of Allah, Victory is ours. Joy Bangla."

জে,এস, গুপ্ত রচিত "The History of the Liberation Movement in Bangladesh" গ্রন্থে এই ঘোষণাটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, মেজর জিয়ার বাণীটি চট্টগ্রাম পোতাশ্রয়ের মধ্য-নদীতে নঙ্গর করা একটি জাপানী জাহাজে ধরা পড়ে, যা রেডিও অষ্ট্রেলিয়া থেকে প্রচারিত হলে বাকি বিশ্ব জানতে পারে। জে,এস, গুপ্ত এই ঘোষণাটির তারিখ ২৬শে মার্চ এবং সময় সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিঃ উল্লেখ করায় সঙ্গত কারণেই বলা যায় যে, রেডিও মারফত মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা ২৬ তারিখেই দেয়া। আবার মেজর জিয়ার ঘোষণা জনাব এম,এ, হান্নান-এর বক্তব্য/ঘোষণার আগেই, যেমন জে,এন, দিক্ষিত নিশ্চিতভাবেই উল্লেখ করেছেন তাঁর "Liberation And Beyond Indo-Bangladesh Relations" গ্রন্থে। সে হিসেবে মেজর জিয়ার ঘোষণা ২৬ মার্চ দুপুরের আগে হওয়ার কথা। ২৬শে মার্চ রাতে অষ্ট্রেলিয়া বেতার যে বাংলাদেশের উপর খবর পরিবেশন করেছিল তার স্বীকৃতি পাওয়া যায় ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম-এর বক্তব্যে। তবে, জে,এস, গুপ্তের উল্লিখিত ঘোষণার বাণীটি অন্য কোন সূত্র থেকে সমর্থিত হয়নি।

বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার ও সাময়িক সরকার প্রধান হিসেবে মেজর জিয়ার ঘোষণা ২৮শে মার্চ পর্যন্ত রেডিওতে প্রচারিত হতে থাকে। প্রথম ঘোষণাটির পাশাপাশি আরও কিছু কিছু ঘোষণা / আবেদন এসেছে সে কণ্ঠ থেকে। দুঃখজনক বিষয় হ'ল এই যে, মেজর জিয়ার সে সময়কার ভাষণ, অন্যান্য ঘোষণার কোন কিছুই সংরক্ষিত হয়নি বলে জানা যায়।

এদিকে জনাব মাসুদুল হক রচিত "স্বাধীনতার ঘোষণা মিথ ও দলিল" বইয়ে তিনি মার্চ '৭১-এ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদী পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক জনাব মাহবুবুল আলমের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছেন। সে সাক্ষাৎকারে জনাব মাহবুবুল আলম মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম বয়ানটি নিম্নরূপ বলে বলেছেন, "I Major Zia, Head of the Provisional Revolutionary Government of Bangladesh do hereby declare war of Independence against Pakistani army."

২৭শে মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক এবং চট্টগ্রামের শিল্পপতি প্রাক্তন মন্ত্রী এ,কে, খানের পরামর্শে মেজর জিয়াউর রহমান পরবর্তীতে আর

Scanned by CamScanner

একটি ঘোষণা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেন। চট্টগ্রামের তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম,এ, হান্নান এ বিষয়ে যা বলেছেন তা হ'ল, "সেদিন (২৭ মার্চ) রাত্রে আমি মীর্জা আবু মনসুর ও মোশারফ হোসেন ফটিকছড়িতে অবস্থানরত প্রাক্তন মন্ত্রী এ,কে,খাঁন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। পুনঃ ঘোষণার জন্য তিনি একটি খসড়া করে দেন। আমরা ফটিকছড়ি হতে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টারে উপস্থিত হই। সেখানে মেজর জিয়াউর রহমানের নিকট আমি এ,কে,খান কর্তৃক লিখিত খসড়াটি দেই। পুনরায় ২৮শে মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান সর্বাধিনায়ক হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।" সে ঘোষণাটিও যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। ঘোষণাটি ছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, তৃতীয় খন্ড অনুযায়ী এইরূপ ঃ

"I Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaims, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.

I also declare, we have already framed a sovereign, legal Government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution. The new democratic Government is committed to a policy of nonalignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all Government to mobilige public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.

The Government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world." (আমি মেজর জিয়া, বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজের অস্থায়ী প্রধান সেনাপতি, শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, আমরা ইতিমধ্যে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বৈধ সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠন করেছি, যা আইন এবং সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। নতুন গণতান্ত্রিক সরকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা সকল জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য কাজ করে যাব। আমি সকল দেশের সরকারকে বাংলাদেশে বর্বরোচিত গণহত্যার বিরুদ্ধে তাদের নিজ নিজ দেশে জনমত গড়ে তোলার জন্য সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি।

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সরকার সার্বভৌম ও বৈধ সরকার এবং তা বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকারী।)

উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার এ ঘোষণাটি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে হলেও, ঘোষক কিন্তু মেজর জিয়াউর রহমানই।

যদিও অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক এবং শিল্পপতি এ,কে, খানের পরামর্শে মেজর জিয়ার নতুন করে ঘোষণা প্রদান পরবর্তী পর্যায়ে অনেক গন্ডগোল পাকিয়েছে, আজও তার সমাধান হয়নি।

উল্লেখ্য যে, জনাব এম,আর, আখতার মুকুল তাঁর "আমি বিজয় দেখেছি" বইয়ে লিখেছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মেজর জিয়া কর্তৃক ইংরেজীতে প্রদত্ত ভাষণটি ছিলো নিম্নরূপ ঃ

Scanned by CamScanner

"The Government of the Sovereign State of Bangladesh on behalf of our great Leader, the Supreme Commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, we hereby proclaim the independence of Bangladesh. And that the Government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representative of Seventy Five Million People of Bangladesh, and the Government headed by him is the only legitimate government of the people of the Independent Sovereign State of Bangladesh, which is legally and constitutionally formed, and is worthy of being recognised by all the governments of the World. I, therefore, appeal on behalf of our Great Leader Sheikh Mujibur Rahman to the governments of all the democratic countries of the World, specially the Big Powers and the neighbouring countries to recognise the legal government of Bangladesh and take effective steps to stop immediately the aweful genocide that has been carried on by the army of occupation from Pakistan.

... The guiding principle of the new state will be first neutrality, second peace and third friendship to all and enmity to none. May Allah help us. Joy Bangla.'

জনাব এম,আর, আখতার মুকুল উপরি-উল্লিখিত ঘোষণাটি ২৭শে মার্চের বলে উল্লেখ করেছেন। তবে, তাঁর বইয়ে উল্লিখিত ঘোষণার বয়ানটির পক্ষে যথার্থ সমর্থন পাওয়া যায়নি। যেমন আওয়ামী লীগ নেতা এম,এ, হান্নান বলেছেন, "আমরা ফটিকছড়ি হতে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টারে উপস্থিত হই। সেখানে মেজর জিয়াউর রহমানের নিকট আমি এ,কে, খান কর্তৃক লিখিত খসড়াটি দেই। পুনরায় ২৮শে মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান সর্বাধিনায়ক হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।" অন্যান্যগণের প্রাপ্ত বক্তব্যও এইরূপ। ১৯৭১ সালে ছাত্রলীগের এক নিরলস কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধা, বর্তমানে (২০০২ খ্রীঃ ৪ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের শিক্ষক ও চট্টগ্রাম বিভাগ প্রজন্ম '৭১-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. গাজী সালেহউদ্দিন-এর সাক্ষাৎকার ছেপেছেন জনাব মাসুদুল হক পূর্বোক্ত বইয়ে। সে সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক ড. গাজী সালেহউদ্দিন বলেছেন যে, ২৭ তারিখে তিনি মেজর জিয়ার একটা ঘোষণা শুনেছেন—তিনি সেখানে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন এবং ২৮ তারিখ বা ২৯ তারিখে মেজর জিয়া অবশ্য আর একটি declaration দেন, 'I Major Zia on behalf of Sheikh Mujibur Rahman'। কিন্তু জনাব এম,আর,আখতার মুকুলের উল্লিখিত ঘোষণাটিতে মেজর জিয়াউর রহমান নিজে কি হিসেবে ঘোষণাটি দিয়েছেন তার কোন উল্লেখ নেই। উপরন্তু জনাব মুকুলের উল্লিখিত 'ঘোষণাটি' বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত মেজর জিয়াউর রহমানের মূল পাঠের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এমনকি জনাব মুকুলের উল্লিখিত বয়ানটিতে মেজর জিয়ার কোন নাম-নিশানাই নেই। কাজেই তাঁর এ দাবী যথার্থ কিনা সে প্রশ্ন উঠাই সাভাবিক।

Scanned by CamScanner

মেজর জিয়াউর রহমান ৩০ মার্চ, ১৯৭১ আরও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। তা হ'ল পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের গণহত্যা রোধে এগিয়ে আসার জন্য তিনি জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি একটি আহবান পাঠিয়েছিলেন।

এদিকে মেজর জিয়াউর রহমান যে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তার যথার্থ স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ-এর দেয়া বাংলাদেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রথম বেতার ভাষণে, যা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হ'তে ১০/০৪/১৯৭১ তারিখ ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ন'টায় প্রচারিত হয়। সে ভাষণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হ'তে ১১/০৪/৭১ তারিখে প্রচারিত বলে "বাংলাদেশবাসীর উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদের বেতার ভাষণ" শিরোনামে প্রচারপত্র আকারে বিলিও করা হয়। উল্লিখিত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বলেছেন, "এই প্রাথমিক বিজয়ের সাথে সাথে মেজর জিয়াউর রহমান একটি পরিচালনা কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর। এখানেই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।" জনাব তাজউদ্দিন আহমদ যখন এ ঘোষণা দিচ্ছেন, তখন আওয়ামী লীগের মূল মূল নেতারা সেখানে আগেই পৌঁছে গিয়েছেন। শুধু তাই-ই নয়, সে বক্তব্য প্রস্তুতির সময় জনাব এম, আর, সিদ্দিকীও দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন।

২৫শে মার্চ দিনগত রাতে দখলদার বাহিনী কর্তৃক ঢাকায় অঘোষিত আক্রমণ ও গণহত্যার বিপরীতে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সহ পাকিস্তান বিরোধী সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ, আনসার সহ জনগণ কোনোরূপ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, ঘোষণা, নির্দেশ ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে নিজেদের মত করে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠতে থাকে মুক্তিফৌজ। অনেকে তখনো কি করবেন ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না, অনেকেই তখন আশাহত। মেজর জিয়ার সে সময়কালে স্বাধীনতা ঘোষণা সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী মুক্তিকামী মানুষের কাছে স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছিল। অনেকেই ইদানিং মেজর জিয়ার ঘোষণাকে অতি মামুলি বিষয় হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করছেন, অনেকে আবার এও বলেন যে, জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করলেই বা কী যায়-আসে। আসলে সে সময়কার বস্তুগত অবস্থা ও বিষয়াবলীতে যারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ও উদাসীন, তাদের পক্ষেই এ ধরণের মন্তব্য সম্ভব। মেজর জিয়ার সে ঘোষণার প্রেক্ষিতে এখানে অল্প কয়েকজনের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরছি যাতে সে সময়কালে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার মূল্যায়ন ও বাস্তব অবস্থার অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছে।

তৎকালীন মেজর কে,এম,শফিউল্লাহ বলেছেন, "২৮শে মার্চ সকাল দশটার সময় উদ্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং যানবাহন নিয়ে আমি ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রা শুরু করি। ... টাঙ্গাইল যাবার পর কে একজন আমাকে বললেন যে মেজর জিয়া নামে একজন চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এ কথা শুনে আমার সাহস দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বেড়ে যায়। কারণ, তখন আমার মনে এ ধারনার সৃষ্টি হয় যে, এ কাজে আমি একা নই।"

ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম বলেছেন, "মেজর জিয়ার আহবান বেসামরিক, সামরিক তথা বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষকে সংগ্রামে উজ্জীবিত করে।"

তৎকালীন সময়ে নড়াইল মহকুমার এস,ডি,ও জনাব কামাল সিদ্দিকী বলেছেন, "২৭শে মার্চ নড়াইলে ফিরে এসে দেখি যে, অবস্থা বেশ খারাপ। নড়াইল কম বেশী জনশূন্য এবং লোকেরা

Scanned by CamScanner

অত্যন্ত ভীত। আমি একটি মাইক নিয়ে শহরের রাস্তায় নেমে পড়ি। এবং ৪টায় একটি সমাবেশের আহবান করি। এই সমাবেশে আমি ঘোষণা করি, নড়াইল স্বাধীন বাংলাদেশের অংশ এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। যেহেতু রেডিওতে শুনেছিলাম জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে সামরিক নেতৃত্ব দান করছেন আমরাও সৈনিক হিসেবে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি। এই সভাতে কয়েকজন সংসদ সদস্য নিয়ে একটি যুদ্ধ পরিচালনা কাউন্সিল গঠিত হয়। কয়েকজন আনসার এবং সাধারণ মানুষদের নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। মানুষের মাঝে যে কি বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল তা বর্ণনা করা যায় না।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষক জনাব সাঈদ-উর রহমান বলেছেন, "ছাব্বিশ তারিখের সকালে ইয়াহিয়ার বক্তৃতা বিমূঢ় করে দিল, সাহস ফিরে পেলাম পরদিন মেজর জিয়ার ঘোষণা শুনে।"

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, "কালুরঘাট ট্রান্সমিশন ষ্টেশন থেকে জিয়ার কণ্ঠে আমরা স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী শুনতে পেয়েছিলাম। সেই মুহূর্তটি আমাদের জীবনের আশা এবং উদ্দীপনার একটি তীব্রতম মুহূর্ত ছিল। যখন চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা এবং সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের অভাব ঠিক সেই মুহূর্তে জিয়ার কণ্ঠস্বরে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণার দাবী একটি বিস্ময়কর মানসিকতার সৃস্টি করেছিল। আমরা তখনই ভাবতে পেরেছিলাম যে, কোন কিছুই হারিয়ে যায়নি, আবার সবকিছু ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে।"

ঢাকার দিলকুশা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি এবং ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য জনাব মুহাম্মদ নূরুল কাদির লিখেছেন, "২৭শে মার্চ, ১৯৭১ শনিবার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় দিন। ... মেজর জিয়াকে তখন চিনতাম না। ঐ দিনের আগে তাঁর নামও কোনদিন শুনিনি। তবুও ঐ পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে মেজর জিয়ার কণ্ঠে ঐতিহাসিক সেই স্বাধীনতা ঘোষণা শুনে মনে উৎসাহের জোয়ার বয়ে গেল। তখন বন্দী জীবন যাপন করে কেমন যেন মনমরা ও হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, তাই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার পর যেন আশার আলো দেখতে পেলাম।

উক্ত স্বাধীনতা ঘোষণাটি খুবই সময়োচিত ছিল। ফলে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে দারুনভাবে উৎসাহিত, উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ঐ রকম পরিস্থিতিতে ঐ ধরনের একটা ঘোষণাই সমগ্র জাতি তখন আশা করেছিল।"

গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম এ কুদ্দুস পিএসপি (অবঃ) দৈনিক দিনকাল পত্রিকায় ২৬শে মার্চ ২০০১ প্রকাশিত তাঁর "বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জিয়াউর রহমান" প্রবন্ধে লিখেছেন, "২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণের ফলে বাংলাদেশের নিরস্ত্র ও নিরীহ জনগণ অত্যন্ত আতংকিত, অসহায় ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ গভীর সংকটাপন্ন মুহূর্তে দেশ ও জাতিকে বাঁচানোর জন্য কোনো রাজনৈতিক নেতা এগিয়ে আসতে সাহস পায়নি। ... মেজর জিয়া তার সহকর্মী অফিসার ও সৈনিকদের নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে পড়েন। তারপর তিনি ২৬ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তা চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়। বাংলার লাখ লাখ মানুষ তার স্বাধীনতা ঘোষণা শুনে স্বাধীনতার চেতনায় প্রচন্ডভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। মেজর জিয়ার দুঃসাহসিক ঘোষণার সাথে সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেনানিবাস, ইপিআর ক্যাম্প, পুলিশ লাইন, আনসার ক্যাম্প থেকে দেশপ্রেমিক বাঙালী অফিসার ও সৈনিকরা একে একে বিদ্রোহ

Scanned by CamScanner

করে বর্বর পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার খবর দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে বাংলার দুঃসাহসিক সন্তানেরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র হাতে তুলে নেয় এবং বিভিন্ন অস্ত্রাগার ভেঙ্গে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে। তারপর তারাও বর্বর পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে।"

"মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস" বইয়ে মেজর জেনারেল এম,এস,এ, ভূইয়া মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে লিখেছেন, বেতারকেন্দ্র থেকে যারা সেদিন মেজর জিয়ার ভাষণ শুনেছিলেন তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, মেজর জিয়া তাঁর প্রথম দিনের ভাষণে নিজেকে হেড অব দি স্টেট অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান রূপেই ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় দিনের ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন যে, এই মুক্তিসংগ্রাম তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। আজ একথা অনস্বীকার্য যে, বিপ্লবী বেতার থেকে মেজর জিয়ার ভাষণ বিশেষ করে শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ করে ভাষণ এবং অন্যান্য প্রচারের ফলে আমাদের সশস্ত্র লড়াইয়ে দ্রুতগতি সঞ্চারিত হয় এবং তা রাজনৈতিক চরিত্রের আকার নেয়।

এখানে লক্ষণীয় যে, মেজর জিয়া প্রথম দিন নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান রূপে ঘোষণা দেয়ার পরে শেখ মুজিবের পক্ষে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

মূল ধারা '৭১ বইয়ে মঈদুল হাসান লিখেছেন, "মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং বিদ্রোহী ইউনিটগুলোর মধ্যে বেতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হবার ফলে এইসব স্থানীয় ও খন্ড বিদ্রোহ দ্রুত সংহত হতে শুরু করে।"

জনাব অলি আহাদ লিখেছেন, "সেই অন্ধকার ও সংকটময় মুহূর্তে ২৭শে মার্চ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র হইতে ভাসিয়া আসিয়াছিল একটি নির্ভয় বীরদর্পী বিদ্রোহী কণ্ঠ। এই কণ্ঠই সেইদিন লক্ষ কোটি বাঙ্গালীকে দিয়াছিল অভয়বানী, ডাক দিয়াছিল মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতে। কণ্ঠটি বেংগল আর্মি মেজর জিয়াউর রহমানের। উক্ত ঘোষণার অংশ বিশেষ হইল ঃ

প্রিয় দেশবাসী, আমি মেজর জিয়া বলছি। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে আমি হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আপনারা দুশমনদের প্রতিহত করুন। দলে দলে এসে যোগদিন স্বাধীনতা যুদ্ধে। ইনশাল্লাহ বিজয় আমাদের অবধারিত।"

তিনি আরো লিখেছেন, "এই ভাবেই মেজর জিয়ার সেই ঘোষণা বাংগালী জাতির ধমনীতে সেই দিনের সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে জোগাইয়াছিল ঐশ্বরিক শক্তি; মনেপ্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়া ছিল দৃঢ় প্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ। ফলকথা, সেইদিন বাংগালীকে নিজস্ব সত্ত্বায় আত্মস্থ ও বলীয়ান করিবার জন্যই যেন মেজর জিয়ার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল"।

রাজশাহীর নওগাঁওয়ের ই,পি,আর-এর ৭নং উইংয়ের সহকারী উইং কমান্ডার তৎকালীন ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দীন চৌধুরী বলেছেন, "২৬শে মার্চ ভোর ছয়টায়...অয়ারলেসে কথা বলার সময় একজন বাঙালী ইপিআর সিগন্যালার আমাকে বলল যে ঢাকায় গত রাতে রাজারবাগে পশ্চিম পাকিস্তানীরা হামলা চালিয়েছে এবং পিলখানার ইপিআররা বিদ্রোহ করেছে এবং তারা অধিকাংশ ইপিআর ক্যাম্প দখল করে নিয়েছে, আপনারা যে যেখানে আছেন আপনাদের নিজেদের কাজ শুরু করুন। কিন্তু আমি তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে পরিচয় দিতে অসম্মতি জানায়।

Scanned by CamScanner

... বেশ কিছুক্ষণ পরে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে খবর শুনতে চাইলে কোন জবাব পাওয়া গেল না। বেশ কিছুক্ষণ পর বলা হল ইয়াহিয়া খান ভাষণ দেবেন। কিছুক্ষণ পর ইয়াহিয়ার ভাষণ শুনা গেল এবং সামরিক নির্দেশাবলীও প্রচার করা হল। ... ইয়াহিয়ার ভাষণ এবং সামরিক নির্দেশাবলী শুনে আমাদের সেদিন ক্ষোভ এবং ভীতির সঞ্চার হয়।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় যখন সন্ধ্যার সময় বেতার কেন্দ্র খুলি তখন হঠাৎ করে মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বেতারের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হল। মনে সাহস হল যে, অন্ততঃপক্ষে একজন অধিনায়ক হিসেবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব নিয়েছেন। সকলের মনে সাহসের সঞ্চার হল এবং আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরোপুরিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।"

ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দীন চৌধুরীর বক্তব্যে আরও একটি বিষয় জানা যাচ্ছে, তা হ'ল, তিনি মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা শুনেছেন ২৬শে মার্চ সন্ধ্যার সময়।

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান তাঁর "জিয়া রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেই ঘোষণা দেন" শিরোনামে ২৩ জানুয়ারী, ২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত লেখায় লিখেছেন, "আমি নিজ কানে শুনেছি মেজর জিয়াউর রহমান ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রভিশনাল কমান্ডার ইন চিফ ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। ... ২৬শে মার্চ আমার জন্মদিন। ... রশিদ চৌধুরী, তার স্ত্রী, দু'মেয়ে দেবদাস চক্রবর্তী এবং তার মুসলমান স্ত্রী আমার বাসায় আসেন। ... তখন বিদ্যুৎ, পানি ছিল না। অসহযোগ চলছিল। সন্ধ্যার সময় কিংবা বিকেল হতে পারে। আমরা ছোট রেডিও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শোনার চেষ্টা করছিলাম কোথাও কিছু শোনা যায় কিনা। তখন হঠাৎ একটি কণ্ঠস্বর শুনলাম, অচেনা-অজানা-কণ্ঠস্বর, বললেন, মেজর জিয়া বলছি। ২৬ মার্চ তিনি নিজেকে বাংলাদেশের প্রভিশনাল কমান্ডার ইন চিফ ও রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করে দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা বলেন এবং স্বাধীনতার ডাক দেন। ... স্বাধীনতার ঘোষক মেজর জিয়াউর রহমান। এ কথা আগেও আমি বলেছি। আমার বহু আগের বইতে আমি লিখেছি। তখন কেউ এর কোনো প্রতিবাদ করেনি। কারণ, এটা ধ্রুব সত্য, এর প্রতিবাদ হবে না।"

তিনি লিখেছেন, "স্বাধীনতার ঘোষণায় শেখ মুজিবের কোনো নির্দেশ ছিল না। আওয়ামী লীগের নেতাদেরও কোনো নির্দেশ ছিল না। তার কারণ, তখন শেখ মুজিব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানে স্বেচ্ছায় যান এবং স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায়।"

মোহাম্মদ আইউব ও কে, সুব্রামানিয়াম "The Liberation War" বইয়ে লিখেছেন, "মেজর জিয়ার কার্যক্রম এবং পরদিন ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ত্বরিত সাড়া দিয়ে চট্টগ্রাম শহর দখল এবং অস্থায়ী সরকারের ঘোষণাদান একজন মধ্যম পর্যায়ের সামরিক অফিসারের তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই কেবল বিধৃত করে না, তার দূরদর্শিতা ও পরিকল্পনাকেও বিশেষভাবে প্রতিভাত করে।"

যদিও কেউ কেউ মেজর জিয়া ২৬শে মার্চ এবং কেউ কেউ মেজর জিয়া ২৭শে মার্চ প্রথম নিজ পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন বলেছেন। আবার কেউ কেউ ২৬শে মার্চ এম,এ, হান্নান শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বলেছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মেজর জিয়া মুক্তিবাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার ও সরকার প্রধান হিসেবে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরে, দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি তখন এ কথা বলেননি যে, তাঁর ঘোষণার পরিবর্তন করা যাবে না। সেক্ষেত্রে

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন হচ্ছে, আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট নেতা যদি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই থেকে থাকেন, তাহলে মেজর জিয়া নতুন করে নিজ পক্ষ থেকে ঘোষণা দিতে যাবেন কেন?

তাছাড়াও, যেখানে একই কালুরঘাট ট্রান্সমিশন কেন্দ্রের কথা বলা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন কেন্দ্রের কর্মীরাইতো এ বিষয়ে মেজর জিয়াকে অবহিত করবেন—তাঁরা নিশ্চয়ই মেজর জিয়াকে জানাবেন যে জনাব এম,এ, হান্নান আগেই শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তেমন কোন ঘটনা ঘটল না কেন?

প্রথমেই দেখা যাক আওয়ামী লীগ নেতা এম,এ, হান্নান এ বিষয়ে কি বলেছেন। তিনি বলেছেন, "২৫শে মার্চ রাতে আবার আমরা এম,আর, সিদ্দিকী সাহেবের বাড়ীতে চট্টগ্রামের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিলিত হই। রাত ১০টার সময় শেখ মুজিবুর রহমান এম,আর, সিদ্দিকী সাহেবের নিকট একটি জরুরী সংবাদ দেন। সংবাদটির মূল বিষয়বস্তু ছিল পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা।" এখানে "দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা"র কথা আছে—স্বাধীনতা সংগ্রাম বা স্বাধীনতা ঘোষণার কথা নয়। এটা হয়ত ঢাকার মতই 'ব্যারিকেড যুদ্ধের' মাধ্যমে দুর্বার প্রতিরোধ হবে। স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠলে প্রতিরোধ হয় না—হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা। তিনি বলেছেন, "২৫শে মার্চ গভীর রাত্রে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট হতে টেলিফোনে আওয়ামী লীগ অফিসে বলা হয় সেনানিবাসের চার পাশে বেশ কিছু ছাত্র-যুবক ও উৎসাহী জনতাকে পাঠানোর জন্য। সংবাদ পাওয়া মাত্র মাইক যোগে সকলকে অবহিত করা হয়।" সহজেই বুঝা যাচ্ছে যে, ততক্ষণে মেজর জিয়ার নেতৃত্বে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ঘটে গেছে এবং সেখানে বাড়তি শক্তি সঞ্চয়ের জন্যেই "কিছু ছাত্র-যুবক ও উৎসাহী জনতাকে পাঠানোর জন্য" বলা হয়েছে। মেজর জিয়ার নির্দেশমত (মেজর জিয়ার ভাষায় অনুরোধ) বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটর যথাযথভাবে আওয়ামী লীগ অফিসে নেতাদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ পরিবেশন করেছেন। জনাব এম,এ, হান্নান বলেছেন, "২৬শে মার্চ খুব সকালে আমি আতাউর রহমান কায়সার ও এম,এ, মান্নান সহ সেনানিবাসের দিকে যাই। পথিমধ্যে পাঁচলাইশ থানার সম্মুখে বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানদিগকে দেখতে পাই। উক্ত রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান তার কোম্পানী নিয়ে কালুর ঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এখানে আমরা জানতে পারি যে, সেনানিবাসের E.B.R সেন্টারে প্রশিক্ষণরত বাঙ্গালী জোয়ানদিগকে রাত্রে পাক-বাহিনী হত্যা করেছে। আমরা কালুর ঘাটে যেয়ে জানতে পারলাম যে, জিয়াউর রহমান বোয়ালখালি থানার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।" এ বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, মেজর জিয়া তাঁদের আগেই কালুরঘাট পৌঁছেছেন তথা কালুরঘাট ট্রান্সমিশন কেন্দ্র সহ কালুরঘাট এলাকা নিরাপদ করে তথা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে পরবর্তীতে মেজর জিয়া বোয়ালখালি থানার দিকে অগ্রসর হয়েছেন।

এরপর জনাব এম,এ হান্নান বলেছেন, "কালুরঘাট হতে চলে আসার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে রেডিও মারফতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচার করতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬শে মার্চ কালুর ঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টার হতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করি। প্রচারে আমাকে সহযোগিতা করেন রেডিও অফিসের রাখাল চন্দ্র বণিক, মীর্জা আবু মনসুর, আতাউর রহমান কায়সার ও মোশাররফ হোসেন প্রমুখ এম,পি,এ ও এম,এন,এ গণ।" এ বক্তব্যটিকে একটু ভালভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করলেই বুঝা যাবে যে, কোন নির্দেশনার অর্থাৎ শেখ মুজিবের কোন নির্দেশনামার

Scanned by CamScanner

উপর ভিত্তি করে নয়, বরং তাঁরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেন যে "শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচার করতে হবে" এবং তা করেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাঁরা যদি কোনরূপ ঘোষণা দিয়েও থাকেন, তা হয়ত দিয়েছেন মেজর জিয়ার ঘোষণার পরে। এ বিষয়ে জে,এন,দিক্ষিত তাঁর "Liberation And Beyond Indo-Bangladesh Relations" বইয়ে লিখেছেন, "Simultaneously the battalion commander of the East Bengal Regiment at Chittagong, Major Ziaur Rahman (who became President of Bangladesh in 1976-77), briefly captured the Chittagong radio station and broadcast a declaration announcing the establishment of free Bangladesh and appealing to all Bengali military and para-military personnel to resist the Pakistan Army. In fact, Ziaur Rahman's broadcast came a little earlier than Mujib's broadcast." জে,এন, দিক্ষিত বলেছেন যে, মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশন দখল করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য সকল বাঙ্গালী সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যগণের প্রতি আহবান জানান। জে,এন, দিক্ষিত লিখেছেন, সত্য-সত্যই, জিয়াউর রহমানের বেতার ঘোষণা এসেছিল মুজিবের বেতার ঘোষণার অল্প কিছু পূর্বে।

মেজর এম,এস,এ, ভূঁইয়া (১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত) বলেছেন, "২৬শে মার্চ দুপুরে ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে আলাপের সময় আমি জানতে পারি যে, একটি বেতার কেন্দ্র আমাদের দখলে রয়েছে। ২৮শে মার্চের সন্ধ্যা থেকে ২৯শে মার্চের রাত পর্যন্ত আমি এই 'বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে' ছিলাম। ... বেতার-কেন্দ্রটি খোলা হয়েছিল চট্টগ্রামের কালুরঘাটে। ২৮শে মার্চ সকালে কালুরঘাটে মেজর জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে চট্টগ্রাম শহরে ফেরার পথে আমি প্রথমবারের মতো বেতার-কেন্দ্রটিতে প্রবেশ করি। ... লেফটেন্যান্ট শমশের সে সময়ে বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের লিখিত ভাষণ বার বার প্রচার করছিলেন।" তাঁর এ বক্তব্য থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার তা হ'ল ২৬শে মার্চ দুপুরের আগে থেকেই একটি বেতার কেন্দ্র বাঙালী সেনাদের দখলে আছে। আবার জনাব এম,এ, হান্নানের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, সেদিন খুব সকালে মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর কোম্পানী নিয়ে কালুরঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

জনাব মাসুদুল হক-এর "স্বাধীনতা ঘোষণা মিথ ও দলিল" গ্রন্থে সৈয়দ আব্দুস শুক্কুরের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণার সময় তিনি ছিলেন ট্রান্সমিশন সেন্টারে। ট্রান্সমিটার অন করেন তিনি।" তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ট্রান্সমিটার কক্ষে যখন মেজর জিয়া ঢোকেন তখন ওই কক্ষে ছিলেন বেলাল মোহাম্মদ ও আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। তিনি বলেছেন যে, মেজর জিয়ার ভাষণ তৈরী করতে সর্বোচ্চ দশ মিনিট সময় লেগেছিল এবং তাঁর ভাষণ প্রচারের সময় অন্য কেউ সে কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না। জনাব শুক্কুরের বক্তব্য অনুসারে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণার তারিখ ও সময় হ'ল ২৭শে মার্চ সকাল দশটা থেকে সাড়ে দশটা। উল্লেখ্য যে, জনাব এম,এ,হান্নান এ সময়টিকে বলছেন ২৭শে মার্চ বিকেলে। এদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ নবম খন্ডের ৪৪ পষ্ঠায় লেখা হয়েছে যে "তাই শহর ছেড়ে যাবার আগেই বিশ্ববাসীর কাছে কথা জানিয়ে যাবার জন্যে মেজর জিয়া ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে যান। বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা মেজর জিয়াকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। কিন্তু

Scanned by CamScanner

কি বলবেন তিনি? একটি করে বিবৃতি লেখেন আবার তা ছিঁড়ে ফেলেন। কি জানাবেন তিনি বিশ্ববাসী এবং দেশবাসীকে বেতার মারফৎ? এদিকে বেতার কর্মীরা বারবার ঘোষণা করছিলেন—আর পনের মিনিটের মধ্যে মেজর জিয়া ভাষণ দেবেন। কিন্তু পনের মিনিট পার হয়ে গেল। মেজর জিয়া মাত্র তিন লাইন লিখতে পেরেছেন। ... প্রায় দেড় ঘন্টা মোসাবিদার পর তিনি তৈরী করেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি।" জনাব মাসুদুল হক রচিত পূর্বোক্ত বইয়ে এ বিষয়ে সৈয়দ আব্দুল শুক্কুরের ভাষ্য হলো ঃ

"প্রশ্ন ঃ লিখতে কতো সময় লাগলো মনে করেন?

সৈয়দ আব্দুল শুক্কুর ঃ এই পাঁচ সাত মিনিট। দশ মিনিটের বেশী লাগেনি।

প্রশ্ন ঃ জিয়াউর রহমান কটার সময় ঘোষণাটি দিলেন?

সৈয়দ আব্দুল শুক্কুর ঃ তখন দশটা সাড়ে দশটা, সকাল।

প্রশ্ন ঃ প্রথম ভাষণটা দিলেন ২৭ তারিখে?

সৈয়দ আব্দুল শুক্কুর ঃ ২৭ তারিখ।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : তৃতীয় খন্ডের ৩য় পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের গণহত্যা রোধে ৩০ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচারের জন্য জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি মেজর জিয়ার স্বহস্ত লিখিত আবেদন পত্রের অনুলিপি থেকে জানা যায় যে, মূল কপিতে স্বাক্ষর প্রদান কালে তিনি ভুল ক্রমে ৩০শে মার্চের স্থলে ৩১শে মার্চ লিখেছিলেন। তারিখের ক্ষেত্রে এরূপের ভুল এর আগেও অর্থাৎ ২৬শে মার্চের ক্ষেত্রেও হয়েছে কিনা সেটাই প্রশ্ন! এ প্রশ্নটি উত্থাপনের মূল কারণ হ'ল, সামরিক ও বেসামরিক অনেকেই বলেছেন যে, তাঁরা ২৬শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা শুনেছেন।

এদিকে শেখ মুজিবের কাছ থেকে প্রেরিত বলে কথিত সুনির্দিষ্ট বয়ানটি এক-একজনের কাছ থেকে এক-এক রকম ভাবে উত্থাপনের কারণে নানাবিধ সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

জনাব এম,এ হান্নান আরো বলেছেন, "২৭শে মার্চ বিকালে মেজর জিয়াউর রহমানও রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর ঘোষণার বক্তব্য নিয়ে জনমনে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তাই সেদিন রাত্রে আমি মীর্জা আবু মনসুর ও মোশারফ হোসেন ফটিকছড়িতে অবস্থানরত প্রাক্তন মন্ত্রী এ,কে,খাঁন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। পুনঃ ঘোষণার জন্য তিনি একটি খসড়া করে দেন। আমরা ফটিকছড়ি হতে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টারে উপস্থিত হই। সেখানে মেজর জিয়াউর রহমানের নিকট আমি এ,কে, খাঁন কর্তৃক লিখিত খসড়াটি দেই। পুনরায় ২৮শে মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান সর্বাধিনায়ক হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।" এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় তা হ'ল, তাঁরা কিন্তু জিয়াউর রহমানকে একথা বললেন না যে, তাঁরা ইতিধ্যেই শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। শেখ মুজিব এ বিষয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন বলে যে দাবী করা হচ্ছে, তাও তাঁরা মেজর জিয়াকে অবহিত করছেন না। কাজেই শেখ মুজিবের পক্ষে তাঁদের স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীটি প্রশ্নবাণে জর্জরিতই থেকে যাচ্ছে। উপরন্তু, একজন অজানা-অচেনা মেজরের দ্বারা ঘোষণার চাইতে জনাব এম,এ হান্নান, এম,আর, সিদ্দিকী বা জহুর আহমেদ চৌধুরী প্রমুখগণের মত আওয়ামী লীগ নেতা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সে সময় দেশবাসীর কাছে বিশেষত আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে

Scanned by CamScanner

অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এ প্রসঙ্গে অনেক লেখক ও রাজনীতিবিদ এমনকি শেখ মুজিব কর্তৃক উল্লিখিত জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরীর কোন নাম জনাব এম,এ হান্নান একবারও উচ্চারণ করেননি।

এবার দেখা যাক জনাব এম,এ হান্নান কর্তৃক উল্লিখিত তৎকালীন নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব মোশাররফ হোসেন কি বলেছেন। তিনি বলেছেন, "২৫শে মার্চ রাত্রিতে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে গোলাগুলি বিনিময় হয়। ... ইতিমধ্যে আমি ও আমার সংগীরা শুভপুর শ্রীজটির আংশিকভাবে ক্ষতিসাধন করি। অন্যদিকে চট্টগ্রামের দিকে আসার সময় লোকদিগকে রাস্তায় গাছপালা, ইটপাটকেল ইত্যাদি দিয়ে নানাভাবে প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য পরামর্শ দেই। ২৬ তারিখে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসরমান পাক সেনাদের সংগে কুমিরায় ক্যাপ্টেন রফিকের দলের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ যুদ্ধে একজন ক্যাপ্টেন সহ অনেক পাকিস্তানী সৈন্য মারা যায়। পরে মেজর জিয়াউর রহমানের অধীনে আর একদল বাংগালী সৈন্য কালুরঘাটের দিকে যাত্রা করে।

এদিকে সমস্ত চট্টগ্রাম আমাদের অধীনে চলে আসে। হান্নান সাহেব সহ আমি অনতিবিলম্বে কালুরঘাটস্থ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত হই এবং আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করি। হান্নান সাহেবই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম বক্তা এবং তিনি বেলা দেড় ঘটিকার সময় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

২৬ তারিখ রাত্রে 'সোয়াত' জাহাজ হতে সমগ্র চট্টগ্রাম শহরে অবিরাম গুলি বর্ষিত হয়। আমরা চট্টগ্রাম শহরে ক্যান্টনমেন্টের ঘেরাওকৃত বাঙ্গালী সৈন্যদিগকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার প্রচেষ্টা চালাই। তখন সমস্ত যুদ্ধব্যবস্থা মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীনে চলতে থাকে। ২৯শে মার্চ তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে "Head of the State" এবং নিজেকে "Supreme Commander of the Bangladesh Armed Forces" হিসেবে ঘোষণা করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন।"

একই সঙ্গের দুইজন আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রভাবশালী নেতার বক্তব্যে কত গড়মিল তা লক্ষণীয়। জনাব মোশাররফ হোসেন "মেজর জিয়াউর রহমানের অধীনে আর এক দল বাংগালী সৈন্য কালুরঘাটের দিকে যাত্রা করে" বলেছেন। যার অর্থ হ'ল, জনাব মোশাররফ হোসেন, এম,এ, হান্নান ২৬ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার আগেই মেজর জিয়াউর রহমান সেখানে পৌছে গিয়েছিলেন। তৎকালীন ক্যাপ্টেন এম,এস,এ ভূঁইয়া পরিষ্কার করেই বলেছেন, "২৬শে মার্চ দুপুরে ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে আলাপের সময় আমি জানতে পারি যে, একটি বেতার কেন্দ্র আমাদের দখলে রয়েছে।" অর্থাৎ জনাব এম,এ, হান্নান, মোশাররফ হোসেন প্রমুখদের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে পৌছবার আগে মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে পৌছেছেন এবং স্বাধীনতার ঘোষণাও দিয়ে থাকতে পারেন! উল্লিখিত বক্তব্যে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় তা হ'ল, জনাব মোশাররফ হোসেনও জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরীর নাম তথা তাঁর মাধ্যমে শেখ মুজিবের কথিত নির্দেশ প্রাপ্তীর কোন উল্লেখ করেন নি। অথচ অতি উৎসাহী কিছু রাজনীতিবিদ, ইতিহাসবেত্তা এবং বুদ্ধিজীবী বলে থাকেন যে, জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে শেখ মুজিব তাঁর কথিত বার্তা প্রেরণ করেছিলেন যা জনাব এম,এ, হান্নান পাঠ করেছেন।

জনাব মোশাররফ হোসেনের বক্তব্য থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, তিনি শেখ মুজিবের কাছ থেকে পাওয়া কোন ঘোষণা পাঠের কথা উল্লেখ করেননি। তিনি যা বলেছেন তা থেকে সহজেই অনুমেয় হয় যে, তিনি এবং জনাব এম,এ, হান্নান নিজেদের উদ্যোগেই কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে যেয়ে

Scanned by CamScanner

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং শেখ মুজিবের পক্ষে জনাব এম,এ, হান্নান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এখানে শেখ মুজিবের নিকট থেকে কিছু প্রাপ্তি বা শেখ মুজিবের ঘোষণা পাঠের কোন উল্লেখ দু'জনের কারো বক্তব্যেই নেই। জনাব এম,এ, হান্নান এবং জনাব মোশাররফ হোসেনের বক্তব্যে যা প্রতীয়মান হয় তা হ'ল, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের মত সিদ্ধান্ত নিয়ে শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক বলেছেন, "২৫শে মার্চ রাত দশটার পরে আমার বাসায় টেলিফোন করে কেউ ঢাকা থেকে খবর দেন যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ট্যাংক ঢাকার পথে বেরিয়ে গেছে, সম্ভবতঃ সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে এবং শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

"ঢাকায় 'পূর্বদেশ' ও 'ইত্তেফাক' অফিসে এবং আমার আত্মীয় ঢাকাস্থ নরউইচ ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স এর তৎকালীন প্রধান কর্মকর্তা জনাব আব্দুল মান্নান খানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। কেউ কেউ সেখান থেকে বললেন যে, একটা কিছু ঘটেছে, কেউ কেউ বললেন কোন মারাত্মক ঘটনার খবর তাঁদের জানা নেই। তবে শহরে কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে এবং ট্যাংক ও সিপাহীরা রাস্তায় টহল দিচ্ছে। ... আমরা যখন ঢাকায় কথা বলছি, তখন ঢাকার সঙ্গে টেলিফোন সংযোগ হঠাৎ ছিন্ন হয়ে যায় অনুমান রাত সাড়ে এগারটার দিকে। ... সারা রাত অফিসে কাটিয়ে ভোর সাড়ে চারটায় বাসায় ফিরে এসে সবে মাত্র গোছল করতে বাথরুমে গিয়েছি তখন চট্টগ্রাম শহর থেকে কোষাধ্যক্ষ সিদ্দিকী সাহেবের ফোন পাই। তিনি জানান যে, তাঁর বাড়ীতে কয়েকজন তদানিন্তন ই বি আর-এর যুবক অস্ত্র সহ উপস্থিত হয়েছে। তারা এই বাড়ীতে ঘাঁটি স্থাপন করবে শত্রু পক্ষের মোকাবেলার জন্য।

... ২৬শে মার্চ সকালে এখবর আসার পর আওয়ামী লীগের জনাব এম,আর, সিদ্দিকী ও জনাব এম,এ, হান্নানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আরও খবর জানতে পারি। ... চট্টগ্রাম ডাকবাংলোতে অথবা রেলওয়ে রেষ্ট হাউসে সংগ্রাম পরিষদের একটি অফিস কাজ করছিল। সেখান থেকে একজন টেলিফোন করে আনিসুজ্জামানকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে শোনান এবং লিখে নিয়ে সবাইকে জানাতে বলেন। এরপর চট্টগ্রামের বেতার তরঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা শুনতে পাই। জনাব এম,এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা পাঠ করেন এবং পরে সকলকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লালদিঘি ময়দানে জামায়েত হতে নির্দেশ দেন।

... ২৭শে মার্চ বেতারে মেজর জিয়ার প্রথম ঘোষণা প্রচারিত হয়। তা শুনেই আমি হান্নান সাহেবকে টেলিফোনে বলি যে, ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর নাম যোগ করা আবশ্যক। নইলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয় বিবেচিত হবে না। মেজর জিয়া পরবর্তী ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধুর নাম করে, তাঁর পক্ষ থেকে।"

উল্লেখ্য যে অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিকের উল্লিখিত আনিসুজ্জামান-এর নামের কোনোরূপ উল্লেখ জনাব এম,এ, হান্নান এবং মোশাররফ হোসেনের বক্তব্যে নেই। এমনকি লিখিতভাবে "বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা" বার্তা প্রাপ্তির কথাও তাঁরা কোনোভাবে উল্লেখ করেননি।

এ প্রসঙ্গে জনাব এম, আর, সিদ্দিকী কী বলেছেন দেখা যাক। তিনি বলেছেন, ২৬শে মার্চ সকাল ৬-৩০ মিনিটের সময় তাঁর স্ত্রী লতিফা চট্টগ্রামের ইত্তেফাক সংবাদদাতা জনাব মইনুল আলমের কাছ থেকে একটি ফোন কল পান এবং তিনি চট্টগ্রামের ওয়ারলেস অপারেটরের মাধ্যমে প্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর একটি বার্তা প্রদান করেন। বার্তায় বলা হয়, "বাংলাদেশের জনগণ এবং বিশ্ববাসীর প্রতি এ বার্তা।

Scanned by CamScanner

রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প এবং পিলখানা ইপিআর-এর ওপর পাক সেনাবাহিনী ২৪-০০ ঘটিকার সময়ে অকস্মাৎ আক্রমণ করেছে। হাজার হাজার মানুষ হত্যা করা হয়েছে। প্রচন্ড লড়াই চলছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের জন্য বিশ্বের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। আপনাদের যা আছে তা-ই নিয়ে প্রতিরোধ করুন। আল্লাহ আপনাদের সহায় হউন। জয় বাংলা। শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে বার্তা।" এখানেও অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিকের উল্লিখিত জনাব আনিসুজ্জামানের নাম নেই। জনাব এম, আর, সিদ্দিকী আরো বলেছেন যে, তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৬শে মার্চ অপরাহ্ন ২-৩০ মিনিটের সময় চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, হান্নান শেখ মুজিবের নামে (The historical announcement) ঐতিহাসিক ঘোষণাটি পাঠ করেন যা স্বাধীনতার ঘোষণা বলে পরিচিত। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, দেশের সে সময়কালের কঠিন বাস্তবতায় ঘোষণাটি প্রাপ্তির পর তা পাঠে সুদীর্ঘ আট ঘন্টা সময় লাগল কেন? তিনি আরো বলেছেন, "মেজর জিয়া এবং তাঁর সৈন্যদের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র পাহারায় নিয়োজিত করা হয়।" অথচ এ কথাটি জনাব এম,এ, হান্নান এবং জনাব মোশাররফ হোসেন কেউই বলেন নি। উপরন্তু, জনাব মোশারফ হোসেন বলেছেন যে, "তখন সমস্ত যুদ্ধ ব্যবস্থা মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীনে চলতে থাকে।" জনাব এম,এ, হান্নান বলেছেন, "আমরা কালুর ঘাটে যেয়ে জানতে পারলাম যে, জিয়াউর রহমান বোয়ালখালী থানার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আমরা মেজর জিয়াউর রহমানকে বোয়ালখালী থানার কুসুমডাঙ্গা পাহাড়ের নিকট তাঁর জোয়ানদের সহ দেখতে পাই। তাঁকে শহরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানাই এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় শিবির স্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানাই। তবে ২৭শে মার্চ তিনি কালুরঘাট আসবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাপ্তাই হতে আগত ক্যাপ্টেন হারুন ও ১৫০ জন ই,পি,আর মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে একত্রিত হন।

কালুরঘাট হতে চলে আসার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে রেডিও মারফতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচার করতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬শে মার্চ কালুর ঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টার হতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করি।"

জনাব এম,আর, সিদ্দিকী উপরে উল্লিখিত তাঁর বক্তব্যের পরেই বলেছেন যে, "পরের দিন ২৭শে মার্চ জিয়া রেডিও মারফত নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে স্বাধীনতা যুদ্ধের আহবান জানাল।" প্রশ্ন হচ্ছে, জনাব এম, আর, সিদ্দিকীর ভাষায় "কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র পাহারায় নিয়োজিত" একজন মেজর কী ক'রে নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে স্বাধীনতা যুদ্ধের আহবান জানাল? তাহলে কী তখনই একটা কূদেতা (Coup d'etat) অর্থাৎ ক্ষমতায় (শাসনব্যবস্থায়) অন্যায় পরিবর্তন ঘটে গেল? সেক্ষেত্রে তাঁদের সেভাবেই বলা উচিত ছিল। অথচ আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্য থেকে অন্য কেউই তেমন কিছু বলেন নি।

এখানে উল্লেখ করতেই হচ্ছে যে, ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তা কত অসার, হাস্যকর, অসত্য এবং বিচারবুদ্ধিহীন। তিনি বলেছেন, "এম,আর, সিদ্দিকীর কাছে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলের মোটামুটি কিছু খবর পাই। তার কাছে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের কাহিনীও শুনি। তিনি জানান, মেজর জিয়া একটা জীপে করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতারা এক প্রকার জোর করে জিয়াকে দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করান।"

Scanned by CamScanner

আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে, 'বাঙ্গালী জাতির' প্রতি সে সময়কালে যথাযথ কর্তব্যপালনে আওয়ামী লীগের নেতাদের চরম ব্যর্থতা, সিদ্ধান্তহীনতা এবং আনাড়ীপনা প্রশমনের উদ্দেশ্যেই অন্যের যথার্থ কৃতিত্বকে হেয় করার এক অপকৌশল হিসেবেই এক ধরনের আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এ রূপের বালখিল্যের অবতারণা করে চলেছেন।

তদুপরি আমাদের বলতেই হচ্ছে যে, ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলামের কথিত ভাষ্য অনুযায়ী "চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতারা এক প্রকার জোর করে জিয়াকে দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করান"—এ ক্ষেত্রেও স্বাধীনতার ঘোষক কিন্তু জিয়াউর রহমান, অন্য কেউ নন।

শেখ হাসিনা কর্তৃক লিখিত "স্মৃতি বড় মধুর স্মৃতি বড় বেদনার" শিরোনামে দৈনিক জনকণ্ঠে ১৪-৮-১৯৯৪ তারিখে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়েছিল এই বাড়িটি। রাত ১২-৩০ মিঃ আব্বা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিলেন। আর সেই খবর ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পৌছে দেয়া হলো পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী। এই খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতারা তা প্রচার শুরু করলেন। যে মুহূর্তে এই খবর পাকিস্তানী সেনাদের হাতে পৌছল তারা আক্রমণ করল এই বাড়িটিকে। রাত ১-৩০মিঃ অব্বাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। আজও মনে পড়ে সে স্মৃতি।" তিনি লিখেছেন,"২৬ মার্চ পুনরায় এই বাড়ি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে। মা, রাসেল, জামাল ও কামাল কোন মতে দেয়াল টপকিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেয়।"

শেখ হাসিনার বক্তব্যের মধ্যে তিনি বলেছেন রাত ১২-৩০ মিঃ শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং এ খবর ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পৌছে দেয়া হয় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী। প্রথমেই যে প্রশ্নটি আসে তা হ'ল, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি হয়, তাহলে শেখ মুজিবের বাসায় উপস্থিত নেতারা তা জানলেন না কেন? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হ'ল রাত ১২-৩০ মিঃ বেগম মুজিব সে বাড়িতে উপস্থিত থাকা সত্বেও স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি তিনি জানলেন না, তা কেমন করে হয়? তৃতীয়ত, ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলামের বক্তব্য পরিষ্কারভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের কোনরূপ পরিকল্পিত কিছুই ছিল না। শেখ হাসিনা লিখেছেন, "আজও মনে পড়ে সে স্মৃতি"। এটা কি করে স্মৃতি হওয়া সম্ভব? যেখানে তাঁর মা বেগম ফজিলাতুন্নেসা বলেছেন, "রাত প্রায় ১০টার কাছাকাছি কলাবাগান থেকে এক ভদ্রলোক এসে শেখ সাহেবের সামনে একেবারে আছড়ে পড়লেন। তাঁর মুখে শুধু এ কথা—আপনি পালান। বঙ্গবন্ধু পালান। ভেতর থেকে তাঁর কথা শুনে শংকিত হয়ে উঠলো আমার মন। বড় মেয়েকে তার ছোট বোনসহ তার স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম।" অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো ঘটনা স্মৃতি হ'তে পারে না। আর শেখ মুজিব রাত ১২-৩০ মিনিটে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন সেটা বেগম মুজিবের স্মৃতিতে থাকবে না, বা তেমন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বেগম মুজিব তাঁর সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করবেন না, তা হ'তে পারে না। উপরন্তু বেগম মুজিব বলেছেন যে রাত সাড়ে বারোটার দিকে শেখ মুজিবকে পাক সেনারা নিয়ে যায়। সে কারণে শেখ হাসিনার বক্তব্য "রাত ১-৩০মিঃ আব্বাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল" যথার্থ বলে বিবেচিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়াও, রাত ১২-৩০ মিঃ শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টিও অবান্তর।

শেখ হাসিনার অন্যান্য বক্তব্যের বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে কথিত ওয়ারলেস মারফত বার্তা প্রাপক জনাব আব্দুল মালেক উকিল-এর বক্তব্যটির উল্লেখ আবশ্যক। তিনি বলেছেন, "কিন্তু ২৪শে

Scanned by CamScanner

মার্চ বঙ্গবন্ধু হঠাৎ আমাদেরকে অবিলম্বে ঢাকা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী আমি ২৪শে মার্চ নোয়াখালীতে (মাইজাদী) চলে যাই। ... ২৫ মার্চ রাত ১১টা। আমার মাইজদীস্থ বাসভবনে আমার নিজস্ব টেলিফোনে আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর ৩২ নম্বর বাড়ীর বিখ্যাত ৪২৫১ টেলিফোনে যোগাযোগ করি। একবার ঐ বাড়ীতে অবস্থানরত হাজী গোলাম মোর্শেদ (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী) টেলিফোনে আমার সাথে কথা বলেন এবং তিনিও সতর্ক করে দেন যে, "যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে।" বঙ্গবন্ধু শুধু চীৎকার করে বলেছিলেন, "এখনও বসে আছ? সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।" আসলে এসব বলে তিনি যে কী বুঝাতে চেয়েছেন তা ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। তাঁর এ বক্তব্যের সত্যতার প্রশ্ন না তুলেও, আমরা বলতে পারি যে, তিনি যদি শেখ মুজিবুর রহমানের "সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে" এই বক্তব্যের উপর জোর দিতে চেয়ে থাকেন, তাতেও বড় জোর আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ বা প্রতিরোধ বুঝায়, স্বাধীনতা ঘোষণা বুঝায় না। এর পরই তিনি বলেছেন, "২৬ মার্চ সকালেও আমরা বিভিন্ন সূত্রে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা এবং হানাদার বাহিনীর গণহত্যার কথা অবহিত হই।" তাঁর এ সকল বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমেয় যে, শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তুতি বা ঘোষণার বিষয়ে তাঁকেও কিছুই বলেন নি। তিনি "বিভিন্ন সূত্রে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা" অবহিত হন—অথচ এখানে কোনো সূত্রের উল্লেখ নেই। উক্ত বক্তব্যের পরই তিনি বলেছেন, "এসময় নোয়াখালি জেলার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন জনাব মনযুর উল করীম (বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব)। আমি তাঁর মারফতে জেলা ও দায়রা জজ গাজী শামসুর রহমান (বর্তমানে প্রেস কাউন্সিলের সভাপতি) এবং পুলিশ সুপার শহীদ আব্দুল হাকিম সহ মহকুমা প্রশাসক ও সকল সরকারী কর্মচারী, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারকে নোয়াখালি সার্কিট হাউসে ২৬ তারিখে ১০টার মধ্যে সমবেত হওয়ার জন্য আহবান জানাই। আওয়ামী লীগের সমস্ত এম পি এ, এম এন এ ও বিশিষ্ট নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও ঐ সমাবেশে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করি।" লক্ষণীয় যে, ২৬ তারিখ সকালে যখন জনাব আব্দুল মালেক উকিল নোয়াখালির ডেপুটি কমিশনারকে এ সকল নির্দেশ দিচ্ছিলেন তখন ডেপুটি কমিশনার কোনরূপ ওয়ারলেস বার্তার কথা বলেন নি। অথচ আমরা আগেই দেখেছি যে চট্টগ্রামের জনাব এম,আর,সিদ্দিকী দাবী করেছেন তাঁর স্ত্রী সকাল ৬-৩০ মিনিটের সময় জনাব মইনুল আলমের কাছ থেকে ওয়ারলেস বার্তা পেয়েছেন। অন্যদিকে অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক-এর বক্তব্য হ'ল "চট্টগ্রাম ডাকবাংলোতে অথবা রেলওয়ে রেষ্ট হাউসে সংগ্রাম পরিষদের একটি অফিস কাজ করছিল। সেখান থেকে একজন টেলিফোন করে আনিসুজ্জামানকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে শোনান এবং তা লিখে নিয়ে সবাইকে জানাতে বলেন।" এ সকল বক্তব্যগুলোই জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে।

এবার দেখা যাক জনাব আব্দুল মালেক উকিল উপরে উল্লিখিত বক্তব্যের পরেই কি বলেছেন। তিনি বলেছেন, "নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সমস্ত সার্কিট হাউজ এবং সম্মুখের ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হয়। উক্ত সমাবেশে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হিসেবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করার জন্য দলমত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আহবান জানাই। উপস্থিত সর্বস্তরের জনগণ এবং জিলা ও দায়রা জজ সহ সকল স্তরের কর্মচারী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর আহবানে স্বাধীন বাংলার পক্ষে সংগ্রাম করার শপথ গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে আকস্মিকভাবে ডেপুটি কমিশনার জনাব মনযুর উল করিম বঙ্গবন্ধু মুজিব কর্তৃক ঘোষিত একটি ইংরেজীতে টাইপ করা স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র আমার হাতে দেন। সেটি ছিল ঃ

Scanned by CamScanner

'বাংলাদেশের জনগণ এবং বিশ্ববাসীর প্রতি ঃ

২৬/৩/৭১ তারিখ শূন্য ঘটিকায় পিলখানা ই পি আর লেইস এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ করেছে, প্রচুর সংখ্যক মানুষ হত্যা করেছে। ই পি আর ও পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে ঢাকার রাস্তায় প্রচন্ড লড়াই চলছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণ বিরত্বের সাথে যুদ্ধ করছে। বাংলাদেশের সকল সেক্টরকে সমস্ত শক্তি দিয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র শত্রু বাহিনীকে প্রতিরোধ করার অনুরোধ করা হল।

স্বাধীনতা সংগ্রামে আল্লাহ আপনাদের সহায় হউন এবং সাহায্য করুন। "জয় বাংলা"।
শেখ মুজিবুর রহমান।'

এটি হুবহু বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চের রাতে অয়ারলেস মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন।"

এখানে লক্ষণীয় যে, চট্টগ্রামে প্রাপ্ত বলে কথিত জনাব এম,আর, সিদ্দিকীর উল্লিখিত বার্তা আর এ বার্তায় পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি আরো লিখেছেন, "ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম থেকে আমার নিকট কয়েকটি জরুরী টেলিগ্রাম আসে। জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী ও জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলা, দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি) টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে নিশ্চয়তার জন্য। যেহেতু ই,পি,আর-এর ওয়ারলেস-এর মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণার কপি ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সাথে সরাসরি আলোচনা করেছি এবং যেহেতু সে সময় ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর ও অন্যান্য জরুরী টেলিফোন যোগাযোগ চট্টগ্রামের সাথে বিচ্ছিন্ন ছিল, সেজন্য আমাকে টেলিফোনে বারবার নিশ্চয়তা দিতে হয়েছিল।" শেখ হাসিনার বক্তব্য অনুযায়ী "পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী" যদি সব হয়ে থাকে, তাহলে আওয়ামী লীগ নেতাদের "স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে" বারবার নিশ্চয়তা দিতে হবে কেন? দ্বিতীয়ত, জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর নিকটই যদি শেখ মুজিবের বাণী পৌছে দেয়া হয়ে থেকে থাকে, তাহলে জনাব আব্দুল মালেক উকিলের এ কৃতিত্বপূর্ণ বক্তব্যের কী হবে?

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক বেতার বাংলা স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৫ মার্চ-১৩ এপ্রিল ১৯৯৮ দু'টি আলাদা আলাদা প্রবন্ধে ওয়ারলেস বার্তার উল্লেখ আছে। এর একটিতে জনাব তারেক মাহমুদ রচিত "জয় বাংলা বাংলার জয়" প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "শেখ মুজিবুর রহমানকে যখন বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় তার পূর্বক্ষণে তিনি তাঁর একটি লিখিত বাণী ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামের আঃ লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে পাঠান। শেখ মুজিবের সেদিনের সেই লিখিত ওয়ারলেস বাণীটি ছিলো ইংরেজীতে। সৈয়দ আনোয়ার আলীর অনুবাদে তার বাংলা দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ

"বাঙালি ভাইবোনদের কাছে এবং বিশ্ববাসীর কাছে আমার আবেদন, রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প ও পিলখানা ই পি আর ক্যাম্পে রাত ১২টায় পাকিস্তানী সৈন্যরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছে। হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে আমরা লড়ে যাচ্ছি। আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন এবং পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকেই হোক। এমতাবস্থায় আমি বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করছি। তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে মাতৃভূমিকে রক্ষা করো। আল্লাহ তোমাদের সহায় হউন।"

দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয়েছে "বঙ্গবন্ধু ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ" শিরোনামে মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া রচিত প্রবন্ধে। তাতে বলা হয়েছে, "২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ১-০১ মিনিটে বঙ্গবন্ধু

Scanned by CamScanner

আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তার অনুলিপি গণভবনে রক্ষিত দলিল থেকে নিম্নে দেয়া হল ঃ

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানার ই.পি.আর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরে লোকদের হত্যা করেছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বিরত্বের সাথে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ করে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ই.পি.আর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপস নাই। জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শত্রুদের বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও অন্যান্য দেশ প্রেমিক ও স্বাধীনতা প্রিয় লোকদের এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।—শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার এ ঘোষণাপত্রটি বলধা গার্ডেনে রক্ষিত ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বেতারে পাঠানো হয়। বার্তাটি পৌঁছে চট্টগ্রামের জহুর হোসেন চৌধুরীর কাছে। তাঁর কাছ থেকে এম.এ. হান্নান ও পরে আবুল কাশেম সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম বেতারে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।"

মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভুঁইয়া কর্তৃক উত্থাপিত বাণীটির কথা উল্লেখ করেছেন জনাব কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম তার রচিত "স্বাধীনতা '৭১" বইয়ে। তফাত এই যে, জনাব ভূঁইয়া বলেছেন যে বার্তাটি চট্টগ্রামের জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে পাঠান হয় বলধা গার্ডেন থেকে। অন্যদিকে জনাব কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, "এ পর্যায়ে কাগমারী বেতারে ২৫শে মার্চ '৭১ গভীর রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা ধরা পড়ে"।

এবার আরও একটি বক্তব্যের দিকে পাঠক বন্ধুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জনাব এম.আর.আখতার মুকুল "আমি বিজয় দেখেছি" বইয়ে "বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট" প্রসঙ্গে লিখতে যেয়ে রবার্ট পেইন-এর "ম্যাসাকার" (নির্দয় হত্যাকান্ড) পুস্তক থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা হ'ল, "সে রাতেই ২৬শে মার্চ তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। সর্বত্র বেতারযোগে পাঠাবার জন্য তিনি টেলিফোনে নিম্নোক্ত বাণীটি সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে জনৈক বন্ধুকে ডিক্টেশন দিলেন।" জনাব মুকুল লিখেছেন, "চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম এম এ হান্নানের কাছে এই বাণী যথাসময়ে পৌঁছেছিলো।

"The Pakistani Army has attacked police lines at Rajarbagh and East Pakistan Rifles headquarters at Pilkhana at midnight. Gather strength to resist and prepare for a war of independence," " (পাকিস্তান সামরিক বাহিনী মাঝ রাতে রাজারবাগে পুলিশ লাইন এবং পিলখানায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করেছে। প্রতিরোধ করবার জন্য এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন।) এই বক্তব্যটিকে জনাব মুকুল শেখ মুজিবুর রহমানের "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য আহবান", "বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরিত স্বাধীনতার বাণী" হিসেবে উল্লেখ করে লিখেছেন যে তা ২৬শে মার্চ প্রচারিত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

অথচ জনাব এম,এ, হান্নান ঐরূপ কোন বাণী প্রাপ্তির কথা উল্লেখই করেন নি। উপরন্তু, এ বক্তব্যটিকে ভালমত পাঠ করলে সহজেই অনুমিত হবে যে, স্বাধীনতা ঘোষণা বলতে যা বুঝায় তেমন কোন ঘোষণাও সে বাণীতে নেই। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য শক্তি সঞ্চয় করার কথা আছে।

এদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ তৃতীয় খন্ড-তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক ই পি আর-এর ট্রান্সমিটার থেকে ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে চট্টগ্রামে প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত বার্তা বলে প্রকাশিত বার্তায় বলা হয়েছে ঃ

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved." (এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহবান জানাচ্ছি, যে যেখানেই আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে। পাকিস্তানী দখলদার সেনাবাহিনীর শেষ সৈন্যটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে)।

এখানেও প্রথম সন্দেহ এসে যায় রাত বারটার পরে ইপিআর-এর ট্রান্সমিটার মারফত চট্টগ্রামে সংবাদ প্রেরণের বিষয়টিকে নিয়ে। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগ নেতাদের এ পর্যন্ত কথিত বক্তব্যগুলোর সঙ্গে এ বার্তাটির অমিলের কারণ কী?

পাঠকবন্ধুগণ, উপরে উল্লিখিত জনাব এম,আর, সিদ্দিকী, জনাব আব্দুল মালেক উকিল, জনাব তারেক মাহমুদ এবং মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া কর্তৃক উত্থাপিত ওয়ারলেস বার্তাগুলি এবং জনাব এম,আর, আখতার মুকুলের উদ্ধৃত বাণীটি একটু মনোযোগ সহকারে দেখুন। সে-সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রে উল্লিখিত শেখ মুজিবের বলে কথিত বার্তাটি। দেখবেন একটির সঙ্গে আর একটির মিল নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কি করে সম্ভব? একটিই মাত্র ঘোষণা বা বাণী কি করে আলাদা আলাদা হয়ে এতগুলো হয়ে গেল? সে সঙ্গে ঘোষণার সময়ের বিভিন্নতাও পর্যালোচনার দাবী রাখে। এর পরে যে প্রশ্নটি আসে তা হল, বলধা গার্ডেনে রক্ষিত ট্রান্সমিটারটি কার, আর কিভাবেই সেখানে তা এলো? দ্বিতীয়ত, ই,পি,আর-এর ওয়ারলেস-এ বার্তা পৌছল কী ভাবে? তৃতীয়ত, রবার্ট পেইন-এর বক্তব্য অনুসারে 'জনৈক বন্ধুকে' বলা হলেও, কোন সুনির্দিষ্ট নাম নেই কেন?

চতুর্থত, এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনার বক্তব্য হ'ল, "রাত ১২-৩০ মিঃ আব্বা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিলেন। আর সেই খবর ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পৌছে দেয়া হলো পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী।" শেখ হাসিনা এসব বললেন ১৯৯৪ খ্রীঃ জনাব এম,আর, আখতার মুকুলের উল্লিখিত বইটি বাংলা ১৩৯১ সনে প্রকাশের ১০ বছর পর। প্রশ্ন হচ্ছে, পাঠকগণ কোন্ বক্তব্যটি গ্রহণ করবেন?

এবার আমরা পর্যালোচনা করব সেই কথিত ই,পি,আর-এর ওয়ারলেস মারফত বার্তা প্রেরণের বক্তব্যটি। ২৫শে মার্চ পিলখানার ই,পি,আর হেড কোয়ার্টারে কর্মরত মোঃ আশরাফ আলী সরদার বলেছেন, "যখন শুনতে পারলাম যে নরঘাতক ইয়াহিয়া তার দলবল নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত

Scanned by CamScanner

ছাড়াই ঢাকা ত্যাগ করেছে, তখন আমি নায়েক সুবেদার শহীদ শামসুল হক সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি সেদিন কোয়ার্টার গার্ড ডিউটি অফিসার ছিলেন। তিনি আমাকে বাইরে গিয়ে সংবাদ নিতে নির্দেশ দিলেন। তখন রাত প্রায় আটটা। আমি সরাসরি ইকবাল হলে যাই। কিন্তু সেখানে কোন ছাত্র-নেতাকে পেলাম না। আমি সেখান থেকে সুবেদার শহীদ জহীরউদ্দীন মুন্সীর বাড়িতে যাই। তাঁকে সমস্ত বিষয় অবগত করাই। তিনি আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না করে নায়েক নূর হোসেনের সঙ্গে শেখ সাহেবের বাড়ির দিকে রওনা হন। তিনি আমাকে কি করতে হবে না হবে পরে জানাবেন বলে বললেন। আমি এবং হাবিলদার শহীদ বেলায়েত হোসেন রাত এগারটা পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষায় সিগনাল ওয়ার্কশপে বসে থাকি। আমরা দুজন আমাদের সিগনাল-এর লোকজনকে কিছু একটা খবর আসবে বলে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। এবং ১৫ শাখার জনৈক সিপাহীকে এ সংবাদ পৌছে দেই।" কিন্তু কোন খবর কোন যায়গা থেকেই আসেনি।

তিনি বলেছেন, "ঢাকায় অবস্থিত সিগনাল-এর প্রধান বেতার কেন্দ্র রাত বারটার সময় বন্ধ করে দেয়া হয়। বন্ধ করে দেয়ার আগে বাংলাদেশের সমস্ত ই-পি-আর বেতার কেন্দ্রে খবর পৌছে দেয়া হয় যে, উইং কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুর রহমান আওয়ান আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে সমস্ত বেতার যোগাযোগ বন্ধ রাখার জন্য।" "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে" গ্রন্থে (তৎকালীন ক্যাপ্টেন) মেজর (অবঃ) রফিক-উল-ইসলাম লিখেছেন, "২৫শে মার্চ সন্ধ্যায়ও এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রাম ই-পি-আর-এর দুটি অয়্যারলেস সেটই ঢাকার পিলখানার সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলো না। এমন কোন দিন ঘটেনি।" কাজেই ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে রাত সাড়ে বারটায় বা ১টা ০১ মিনিটে বা রাত ১টা ১০ মিনিটের সময় ই,পি,আর-এর ওয়ারলেস মারফত শেখ মুজিব কর্তৃক বার্তা প্রেরণের বক্তব্যগুলো অবান্তর বলেই প্রমাণিত হচ্ছে।

মোঃ আশরাফ আলী সরদার আরো বলেছেন, "আমাদের কর্তব্যরত অপারেটররা সংকেতের সাহায্যে এক ভায়বহ পরিস্থিতির কথা বাইরে কর্তব্যরত সেক্টর / উইং / বিওপি পর্যন্ত সমস্ত ই-পি-আর'কে জানিয়ে দেন। ২৬ শে মার্চ সকাল দশটা পর্যন্ত আমাদের এইচ-এফ (হাই ফ্রিকোয়েন্সি সেট) চালু থাকে, যার মাধ্যমে ২৫শে মার্চের ঘটনা নায়েক শহীদ বাশার বাইরের সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর শেষ সংবাদে চট্টগ্রামকে বলেছিলেন যে, আমাদের সবাই বন্দী হয়ে গেছে। হয়ত কিছুক্ষণ পর আমিও বন্দী হয়ে যাব এবং আর নির্দেশ দেবার সময় পাব না। তোমরা সমস্ত পশ্চিমাদের খতম কর। চট্টগ্রাম থেকে হাবিলদার বাহার উক্ত সংবাদ সীমান্তের চৌকি পর্যন্ত পৌছে দেয় এবং আমাদের লোকজনকে অনুপ্রাণিত করার জন্য সে বলেছে যে, 'আমি ঢাকা থেকে বলছি। সম্পূর্ণ ঢাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন চলে এসেছে এবং ই-পি-আর'এর ডাইরেক্টর জেনারেল ব্রিগেডিয়ার নেসার আহমদ বন্দী হয়েছেন। তোমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়। এবং সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানীদের বন্দী করে আমাকে রিপোর্ট দাও।" সহজেই অনুমেয় যে, সে সময়কালে ই-পি-আর-এর ওয়ারলেস থেকে শেখ মুজিবের কোন বার্তা কোথাও প্রেরণ করা হয়নি, বরং যেটুকু বার্তা ঢাকা থেকে প্রেরিত হয়েছে তার কৃতিত্ব অন্য কারো নয়, তা ছিল নায়েক শহীদ বাশারের। হাই ফ্রিকোয়েন্সির এ বক্তব্য হয়ত তরঙ্গায়িত হয়ে অন্য কোন হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে ঢুকে পড়েছিল যা পরবর্তীতে মিথ্ অর্থাৎ অতিকথায় রূপান্তরিত হয়েছে।

১৯৭১ খ্রীঃ ২৫শে মার্চের রাতে দখলদার বাহিনী কর্তৃক আক্রমণের সময় রাজারবাগ (রিজার্ভ) পুলিশ লাইনে ওয়ারলেস অপারেটর হিসেবে কর্মরত জনাব আঃ গণি তালুকদার বলেছেন,

Scanned by CamScanner

"রাত পৌনে এগারটার সময় ঢাকা পিলখানা ই-পি-আর হেড কোয়ার্টার থেকে টেলিফোনে পাক হানাদার কর্তৃক রাজারবাগ পুলিশ রিজার্ভ ও ই-পি-আর হেডকোয়ার্টার আক্রমণের সংবাদ পাই। টেলিফোনে ই-পি-আর হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদেরকে সশস্ত্রভাবে পাক হানাদারদের মোকাবেলা করার জন্য তৈরী থাকতে বলা হয়। ... এ সংবাদ দ্রুত রাজারবাগ রিজার্ভ পুলিশের আর-আই ও এস, পি হেডকোয়ার্টারকে জানানো হয়। ... পুলিশ সুপার ও আর-আই উভয়েই শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দান করে নিজ নিজ দায়িত্বে চলে যান। ... এরপর রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়। ... সবাই সশস্ত্রভাবে পজিশন নিয়ে হানাদার পাক বাহিনীর অপেক্ষা করতে থাকি। এ সময় ওয়ারলেস এবং টেলিফোন সবকিছু অচল করে দেয়া হয়েছিল।"

আসলে আক্রমণের প্রস্তুতি পর্বে আক্রমণকারীরা সর্বদাই প্রতিপক্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করেই আক্রমণ চালায়। সে কারণে ই,পি,আর হেডকোয়ার্টার, পুলিশ হেড কোয়ার্টার যখন আক্রমণের টার্গেট তখন তাদের ওয়ারলেসকে চালু রাখার কোনরূপ প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর তাই ই,পি,আর-এর ওয়ারলেস থেকে রাত সাড়ে বারোটা বা তার পর শেখ মুজিব কর্তৃক কোনোরূপ বার্তা প্রেরণ এককথায় কল্পিত বিষয়। তাছাড়া ই,পি,আর-এর তৎকালীন ক্যাপ্টেন রফিক-উল-ইসলাম খুব পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন, "২৫শে মার্চ সন্ধ্যায়ও এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রাম ই-পি-আর-এর দুটি ওয়ারলেস সেটই ঢাকার পিলখানার সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলো না। এমন কোন দিন ঘটেনি।"

২৫শে মার্চ পিলখানায় ই,পি,আর হেডকোয়ার্টারে কর্মরত মোঃ আশরাফ আলী সরদার এবং চট্টগ্রাম ই,পি,আর ক্যাপ্টেন রফিক-উল-ইসলামের বক্তব্য অনুসারে আওয়ামী লীগের ই,পি,আর-এর ওয়ারলেস মাধ্যমে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে শেখ মুজিবের বাণী প্রেরণের দাবী সম্পূর্ণরূপে খারিজ হয়ে যাচ্ছে।

শেখ মুজিবুর রহমান যে পাকিস্তানী দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কোনরূপ যুদ্ধ ঘোষণা করেননি তার নিদর্শন পাওয়া যায় ১৯৭২ খ্রীঃ গৃহীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর (PREAMBLE) প্রস্তাবনায়। প্রস্তাবনার প্রথম অংশে যা বলা হয়েছে তা হ'ল ঃ

"আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে (through a historic struggle) স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।"

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রস্তাবনায় "জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে"র কথা বলা হয়েছে। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের মাধ্যমের কথা বলা হয়নি। আওয়ামী লীগ প্রধান স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন—আবার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করলেন, প্রলয়ংকরী এক যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হ'ল—কিন্তু সংবিধানে যুদ্ধের কোন স্বীকৃতি থাকল না, বিষয়টি আশ্চর্যজনক নয় কী?

আর একটি নিদর্শনের উল্লেখ করছি। ১৯৭২ খ্রীঃ মার্চ মাসে আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ভারত কর্তৃক "বাংলা নামে দেশ" বইয়ের প্রকাশনার লক্ষ্যে দেয়া লিখিত বাণীতে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন ঃ

Scanned by CamScanner

"১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ্চ আমি ঘোষণা করেছিলাম "এই সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বহু নির্যাতন, বহু দুঃখভোগের পর আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে। সেই সংগ্রামের কাহিনী ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। পাকিস্তানী সমরনায়কদের নরমৃগয়ার শিকার হয়েছে ৩০ লক্ষ লোক, এককোটি লোক আশ্রয় নিয়েছিল ভারতে। জঙ্গী চক্র আঘাতের পর আঘাত হেনেছে, কিন্তু আমার সাড়ে সাতকোটি মানুষের মনোবল তাতে ভেঙ্গে পড়েনি, আমরা স্বাধীনতা আদায় করে নিয়েছি। 'বাংলা নামে দেশ' গ্রন্থে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, সংগ্রামের আগের এবং পরের ইতিহাস, ধারাবাহিক রচনা ও আলোকচিত্রমালায় চমৎকার সাজানো হয়েছে। বইটি নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান দলিল। জয় বাংলা।"

দস্তখত—

২৫শে মার্চ, ১৯৭২ শেখ মুজিবুর রহমান

সহজেই অনুমেয় যে, এ বাণীটিতেও স্বাধীনতার ঘোষণা বা স্বাধীনতা যুদ্ধের কোন উল্লেখ নেই। এ বইটির কোথাও শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বা বাণী প্রেরণের কোনো উল্লেখ নেই। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ৭ই মার্চের বক্তৃতার কথা, যেখানে আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, তাতে তাঁর চারদফা দাবী ছিল, তাঁর সে ভাষণ স্বাধীনতা ঘোষণার ভাষণ ছিল না। এই উল্লিখিত বাণীটিতেও দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধ নয়, "আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতা এনে দিয়েছে"। সকলকেই অনুধাবন করতে হবে যে সংগ্রাম আর যুদ্ধ এক বস্তু নয়। বইটির ৩৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে "একটি ট্যাংক, একটি সাঁজোয়া গাড়ি, এক লরি সৈন্য গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করতে যায়। তিনি ঝুলবারান্দায় বেরিয়ে এলেন, 'আমি তৈরি। গুলি ছোঁড়ার তো কোন দরকার ছিল না।' " একটি কথা সর্বদাই স্মরণে রাখতে হবে তা হ'ল, মানুষ যা করে এবং যা চায় তা তার কর্মকান্ড ও বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়।

জনাব অলি আহাদ পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন, "২৫ মার্চ পাক বাহিনীর আকস্মিক অতর্কিত হামলার ফলে কোন নির্দেশ দান কিংবা পরামর্শ দান নেতার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অথচ স্বাধীনতা উত্তরকালে বানোয়াটভাবে বলা হয় যে, তিনি পূর্বাহ্নেই নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, শেখ মুজিবুর রহমানও ১৯৭২ সালের ৭ই এপ্রিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, তিনি নির্দেশনামা জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে পাঠাইয়াছিলেন। কথিত সেই নির্দেশনামাটি নিম্নরূপ ঃ

পাক বাহিনীর আক্রমণের অব্যবহিত পর রাত্র সাড়ে ১১টায় (২৫শে মার্চ, ১৯৭১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর নিকট প্রেরিত একটি ঐতিহাসিক বাণী ঃ"। উল্লেখ্য যে, কথিত এ বাণীটি আমাদের পূর্বে উল্লিখিত মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া-র "মুক্তিযুদ্ধ ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ" প্রবন্ধের বাণীটির অনুরূপ। তফাত এখানে যে, শেখ হাসিনার বক্তব্য অনুযায়ী শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার সময়কালে রাত ১২-৩০, মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভূঁইয়ার বক্তব্য অনুযায়ী ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ১-০১ মিনিটে, তারেক মাহামুদের "জয় বাংলা বাংলার জয়" প্রবন্ধ অনুযায়ী রাত ১২টার পর শেখ মুজিবকে বন্দী করার পূর্বক্ষণে, আর এখানে উল্লিখিত হচ্ছে রাত ১১-৩০ মিনিট। সে কারণে বাণীটি আর পুনরুল্লেখ করলাম না।

এ প্রসঙ্গে নুতন কিছু বলার আছে বলে আমরা মনে করিনা। তবুও বলতে হচ্ছে যে, ডক্টর কামাল হোসেনের উপরে উল্লিখিত বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি শেখ মুজিবুর

Scanned by CamScanner

রহমানের বাড়ি ত্যাগ করেন রাত ১০-৩০ মিনিটের পরে। তিনি তাঁর নিজ বাড়িতে ফিরে যান। ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলামের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, সার্কিট হাউজ রোডের ৪ নম্বর বাড়িতে তিনি থাকেন এবং ড. কামাল হোসেন থাকেন ৩ নম্বর বাড়িতে। তিনি যখন বাড়িতে যাচ্ছিলেন তখন দেখেন ড. কামাল বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আহমেদুল কবীর ও তাঁর স্ত্রীকে বিদায় দিচ্ছেন। বিদায়ের সময় লম্বা হওয়ায় তিনি ড. কামালকে তাড়া দেন। তাঁদের বিদায়ের পর তিনি ড. কামালকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুত হতে বলে নিজ বাসায় যান। তিনি বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে দেয়াল টপকিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে কামাল হোসেনের বাসায় যান। এরপর তাঁরা রওয়ানা দেন এবং শেখ মুজিবের বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় বহু কষ্টে কর্মীদের সহযোগিতায় রাস্তায় ব্যারিকেড সরিয়ে শেখ মুজিবের বাড়িতে পৌছেন। ৩২ নম্বরের বাড়ীতে প্রবেশ করে দেখেন নীচের তলায় শেখ মুজিব খাবার শেষ করেছেন। এরপর তাঁরা সংক্ষেপে শহরের অবস্থা জানিয়ে শেখ মুজিবকে তাঁদের সাথে চলে যাবার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান। কিন্তু শেখ মুজিব তার পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। শেখ মুজিব তাঁদের দু'জনকে ঐ মুহূর্তে শেখ মুজিবের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেন। এর পরে তাঁরা জনাব তাজউদ্দিনের বাড়িতে যান এবং তাঁকে জানান যে, শেখ মুজিব সকলকে আত্মগোপনের নির্দেশ দিয়েছেন। পাঠকবন্ধুগণ, উল্লিখিত সময় রাত ১১-৩০মিঃ এবং যিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন তাঁর ঐ মুহূর্তে দলীয় নেতাদের উল্লেশ্যে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশটি মিলিয়ে দেখুন, নিজেরাই উত্তর পেয়ে যাবেন।

জনাব অলি আহাদ লিখেছেন, "সময়োপযোগী নেতৃত্বদানের ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্যই পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর রহমান অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্দেশ প্রদানের একটি ঘোষণা পত্র ছাপাইয়া সাধারণ্যে বিলি করিয়াছিলেন। ইহা না করিয়া তাঁহার উচিত ছিল সময়োপযোগী অবদানের জন্য মেজর জিয়াউর রহমানকে স্বীকৃতিদান, ইহা হইত নেতাসুলভ আচরণ। তাঁহার মানসিকতার কারণেই শেখ মুজিবুর রহমান স্বাভাবিকভাবেই তাহা করিতে ব্যর্থ হন। ইহা অতীব পরিতাপ ও দুঃখের বিষয়।"

এদিকে (তৎকালীন ক্যাপ্টেন) মেজর (অব) রফিক-উল-ইসলাম বীরবিক্রম তাঁর লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে—এ টেল অব মিলিয়নস বইয়ে ভিন্ন কিছু লিখেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"টেলিফোনে আমি সর্বজনাব হান্নান, জহুর আহমদ চৌধুরী এবং এম,আর, সিদ্দিকীর সঙ্গে আলোচনা করলাম। তাঁদেরকে এ কথাও বললাম যে, চট্টগ্রাম শহরে আমরা যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি, এ কথা রেডিওতে প্রচার করা দরকার। সেই অনুসারে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ একটি খসড়া ঘোষণা তৈরি করে দিলেন এবং সেটি চূড়ান্তভাবে সংশোধন করে দিলেন ডাঃ জাফর। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঙালীদের জীবন বাঁচানোর জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে আবেদনই ছিল ঘোষণাপত্রটির মূল বক্তব্য।

বাঙালীদের হাতে যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যও ঘোষণায় আহবান জানানো হয়। এই ঘোষণাটি চট্টগ্রাম রেডিও ট্রান্সমিটিং সেন্টার কালুরঘাটস্থ (স্বাধীন বাঙলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র) থেকে ২৬ মার্চ বেলা প্রায় আড়াইটায় জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব এম,এ, হান্নান পাঠ করে শোনান।"

Scanned by CamScanner

তাহলে বিষয়টি কী দাঁড়াচ্ছে? এখানে দেখা যাচ্ছে যে রেডিওতে ঘোষণা দিতে বলছেন ক্যাপ্টেন রফিক-উল-ইসলাম, শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট থেকে কোনোরূপ বার্তা প্রাপ্তির বিষয়টি ধোপে টিকছে না।

জনাব এম,এ, হান্নান বলেছেন যে, রাত ১০টার সময় শেখ মুজিবুর রহমান এম,আর, সিদ্দিকী সাহেবের নিকট যে জরুরী সংবাদ দেন তার "মূল বিষয়বস্তু ছিল পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা।" যার ভিত্তিতে তাঁরা ডেপুটি কমিশনার সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন। "কিন্তু ডেপুটি কমিশনার বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন।" এখানে তিনি বলেননি যে তাঁরা সে সময় কি পরিকল্পনা ডেপুটি কমিশনারকে দিয়েছিলেন। ডেপুটি কমিশনার হয়ত দেখেছেন যে, তাঁরা যা বলছেন বাস্তবে তার সঙ্গে মিল নেই। কারণ, রাত দশটার সময় শেখ মুজিবুর রহমানের বাসায় উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতারাই তো স্বাধীনতা বা অভ্যুত্থান পরিকল্পনার কোন কিছুই জানেন না। তখন পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিরোধ বলতে যা পরিলক্ষিত হয় তা মুহাম্মদ নূরুল কাদির তাঁর "দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা" বইয়ে দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "সন্ধ্যার কিছু আগে 'রাতে আর্মি মুভ করতে পারে' এমন একটা আভাস পাওয়ার পর, বঙ্গবন্ধু আমাকে আদেশ দিলেন—ঢাকার সব কয়টা ইউনিয়ন ঘুরে, ইউনিয়ন নেতাদের নিকট, সকল রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করার নির্দেশ, তখনই পৌছে দেয়ার জন্যে।" এর বাইরে কিছু হলে নিশ্চয়ই শেখ মুজিবের বাড়িতে উপস্থিত নেতারা সে-সঙ্গে প্রাদেশিক প্রশাসনে নিয়োজিত বাঙ্গালী অফিসাররা বিশেষত জেলা প্রশাসকরা নিশ্চয়ই জানতেন। কারণ, তখনও ঢাকা-চট্টগ্রামের টেলিফোন লাইন সচল ছিল এবং প্রাদেশিক সরকারের সিভিল প্রশাসন শেখ মুজিবের নির্দেশেই পরিচালিত হচ্ছিল।

জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক মার্চ মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে কোথাও ২৬ মার্চ শেখ মুজিবের নিকট থেকে বার্তা প্রাপ্তি বা জনাব এম,এ,হান্নান কর্তৃক কোনরূপ বেতার ঘোষণার কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন, "২৬ মার্চ সকালে রেডিও খুলতেই হঠাৎ অস্বাভাবিক অবস্থা মনে হলো। ভারী কণ্ঠ, যা কোন বাঙালীর বলে মনে হয়নি, ঘোষণা শুনতে পেলাম, ঢাকাতে কার্ফিউ জারি হয়েছে, পরবর্তী ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করুন। ...দ্বিপ্রহরের পর থেকে আকাশবাণীর খবরে ঢাকার কিছু কিছু সংবাদ পেলাম ইপিআর ও পুলিশ ক্যাম্প পাক সেনারা আক্রমণ করেছে, নিরীহ জনসাধারণের ওপরও তারা ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়েছে। ... ঠিক সেই মুহূর্তে চট্টগ্রামে আমরা কি করব তা স্থির করতে পারিনি।

২৬ মার্চ রাত বারটার দিকে উপাচার্য ডঃ এ,আর,মল্লিক আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন আরো যাকে পান সংগে নিয়ে আসবেন। গিয়ে দেখি অনেক ই পি আর (তদানীন্তন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) -এর লোকজন ও সন্নিহিত সীমান্ত এলাকায় তাদের স্থান ছেড়ে ক্যাম্পাসে এসে জড় হয়েছে। এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করাই ছিল সেই মুহূর্তের সবচে জরুরী কাজ। আমাকে সেই দায়িত্ব দেয়া হলো। ... চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করা যায় কিনা এবং কি উপায়ে তা করা যাবে এ ব্যাপারে অনেক কথাবার্তা হল। ...ডঃ মল্লিক বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

Scanned by CamScanner

... ২৭ তারিখ কালুরঘাট স্বাধীনবাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে মেজর জিয়া কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা শোনা যায়। ঐ ঘোষণায় প্রথমে তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে উল্লেখ করেছিলেন পরে তিনি তা সংশোধন করে শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্প্রচার করেন।"

লক্ষণীয় যে, উপাচার্য অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিকের নিকট থেকে তাঁর সহকর্মী অধ্যাপকও জানতে পারলেন না যে, জনাব এম,এ, হান্নান চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 'বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা পাঠ' করেছেন। ঐ রূপ পরিস্থিতিতে কী এটা সম্ভব, এটাই প্রশ্ন?

জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী রচিত "একাত্তরের রণাঙ্গন" গ্রন্থে প্রকাশিত মার্চ '৭১-এ চট্টগ্রামে কর্মরত মেজর মীর শওকত আলীর একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, মেজর মীর শওকত বলেছেন "২৭শে মার্চ '৭১ মনে হয় জেনারেল জিয়া (অর্থাৎ তৎকালীন মেজর জিয়া) বুঝতে শুরু করলেন যে, বেতারে একটা ঘোষণা প্রচার করা দরকার। ঐ তারিখেই সন্ধ্যায় কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে এটা করলেন তিনি। বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাও ঐ সময় খুব তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর নূরুল ইসলাম, আতাউর রহমান খান কায়সার, হান্নান ভাই এবং এম,আর, সিদ্দিকী। তাঁরাও সম্ভবতঃ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কিছু প্রচারিত হওয়া উচিত। অপরদিকে জেনারেল জিয়া কি বলবেন তার একটি খসড়াও প্রস্তুত করে নিলেন। ২৭ মার্চ '৭১ সন্ধ্যার পর চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত হ'ল জেনারেল জিয়ার (তৎকালীন মেজর) ভাষণ।" অথচ এ সাক্ষাৎকারে উল্লিখিত অংশের আগেই দেখানো হয়েছে যে মেজর মীর শওকত বলেছেন, "আমার জানা মতে সবচাইতে প্রথম বোধ হয় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে হান্নান ভাইয়ের কণ্ঠই লোকে প্রথম শুনেছিলেন। এটা ২৬শে মার্চ '৭১ অপরাহ্ন দু'টার দিকে হতে পারে।"

সংক্ষেপে, তার উল্লিখিত বক্তব্য থেকে যা অনুমেয় তা হ'ল হান্নান ভাই অর্থাৎ জনাব এম,এ, হান্নানের কণ্ঠই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে লোকে প্রথম শুনেছেন ২৬শে মার্চ অপরাহ্ন দু'টার দিকে। আবার ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের চার নেতা (এম,এ,হান্নান সহ) "সম্ভবতঃ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কিছু প্রচারিত হওয়া উচিত"—সঙ্গত কারণেই যে প্রশ্ন এসে যায় তা হল, ২৬ মার্চ জনাব এম,এ হান্নান (মীর শওকাতের ভাষায় হান্নান ভাই) চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে তাহলে কী ঘোষণা করেছিলেন? সেটা যদি শেখ মুজিবের পক্ষেই কোনরূপ ঘোষণা হয়ে থাকবে, তাহলে আবার পরের দিন শেখ মুজিবের পক্ষে কিছু প্রচারিত হওয়া উচিৎ বলে আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করবেন কেন? দ্বিতীয়ত, জনাব এম,এ,হান্নান যদি ২৬ তারিখে কোনোরূপ ঘোষণাই দেবেন, তা মেজর জিয়াকে ২৭ তারিখে ঘোষণা দেয়ার আগেই তো অবহিত করবেন, কিন্তু তা করা হল না কেন?

জনাব মাসুদুল হক তাঁর "স্বাধীনতার ঘোষণা মিথ ও দলিল" গ্রন্থে যা দেখিয়েছেন তা হ'ল, "২৬ মার্চের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে চট্টগ্রাম শহরবাসী নিক্ষিপ্ত হন প্রচন্ড রকমের বিভ্রান্তির মধ্যে দৈনিক আজাদী এবং ইংরেজি দৈনিক পিপলস্ ভিউ হকারের হাত থেকে নিয়ে। তাতে রয়েছে শেখ মুজিবের সাধারণ ধর্মঘটের আহবান এবং অন্যান্য নির্দেশনামা। পত্রিকার হকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা নেমে পড়ে রাস্তায়। মাইকে শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারে নেমে পড়ে। আসলে মাইকিংটা শুরু হয় মধ্যরাত থেকে। (অর্থাৎ, ততক্ষণে মেজর জিয়াউর রহমান

Scanned by CamScanner

বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং স্বাধীনতার জন্যে লড়াইয়ের কথা টেলিফোন অপারেটর-এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতারা জেনেছেন—লেখক)।

... ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা মাইকিংয়ের পাশাপাশি রাতারাতি স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত সাইক্লোস্টাইল করা কপি এবং হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেয় সারা শহরে। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলেও তা কাটতে সময় নেয় না। চট্টগ্রামের মানুষ প্রস্তুত হয়ে যায় স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়ার জন্য। কিন্তু নেতারা তখন অনেক পেছনে। ... শেখ মুজিবের পক্ষে এম,এ,হান্নানের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ নিয়ে কথা রয়েছে। কথা রয়েছে আগ্রাবাদ রেডিও কেন্দ্র থেকে ঘোষণা প্রচার না করে কালুরঘাটের ১০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হলো কেন?

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে কী বলেছিলেন এম.এ.হান্নান? 'বলেছিলেন',—চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ওই ছাত্রনেতার ভাষ্য অনুযায়ী—'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। যার যা আছে—মরিচের গুঁড়ো, লাঠিসোটা, তীর-ধনুক নিয়ে লালদিঘি ময়দানে হাজির হোন।' এই হলো তার স্বাধীনতার ঘোষণা। মরিচের গুঁড়ো, তীর-ধনুক নিয়ে লড়াইয়ে নামতে হবে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে! মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কাঁপছিলেন ভয়ে। বক্তব্য রাখার শুরুতে বা পরে নিজের নামটিও বলতে ভুলে গিয়েছিলেন।"

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, "জনাব এম,এ, হান্নান বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা পাঠ করেন এবং পরে সকলকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লালদিঘি ময়দানে জমায়েত হতে নির্দেশ দেন।" সে ঘোষণায় কি ছিল তা তিনি উল্লেখ করেন নি তবে লালদিঘি ময়দানে যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সকলকে জমায়েত হতে নির্দেশ দিয়েছেন তা তিনি উল্লেখ করেছেন। সঙ্গত কারণেই জনাব মাসুদুল হক-এর উপরে উল্লিখিত বক্তব্যটি যথার্থ বলে বিবেচ্য হচ্ছে। তাছাড়া একটি দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে একটি বিভাগীয় শহরের একটি সুনির্দিষ্ট ময়দানে সকলকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জমায়েত হওয়ার নির্দেশটি আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উপরে উল্লিখিত অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিকের বক্তব্যটির পরেই তিনি বলেছেন, "আমি টেলিফোন করে কালুরঘাটে এবং ডাকবাংলোতে বলি যে, এই ঘোষণা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা দরকার, কেননা, ওরকম জমায়েতের ওপর বিমান থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। পরে তাঁরা এই সমাবেশ বাতিল করার ঘোষণা দেন।"

আমরা আগেই দেখেছি যে, মেজর জিয়াউর রহমান ২৫ ও ২৬ মার্চের রাত ১টা থেকে রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিটের মধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন এবং চট্টগ্রাম সিভিল ও পুলিশ প্রশাসন সহ আওয়ামী লীগ নেতাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার বিষয়টি জানানোর বন্দোবস্ত করেছেন।

তৎকালীন লেফটেন্যান্ট শমসের মুবিন চৌধুরী বলেছেন, "এইট্থ বেঙ্গল-এ এসে শুনলাম যে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মেজর জিয়াউর রহমানের নির্দেশে এটা করা হয়েছে। মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি বললেন যে এখন থেকে তিনিই হচ্ছেন ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার। তিনি আরো বললেন যে গোলাগুলির খবর তিনি শুনেছেন। এ খবর শোনার পর তিনি ব্যাটালিয়ন-এর কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জানজুয়া সহ অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করেছেন। পরে ওদের সবাইকে মেরে ফেলা

Scanned by CamScanner

হয়েছিল। তারপর মেজর জিয়াউর রহমান আমাকে ব্যাটালিয়ন-এর সবাইকে এক জায়গায় একত্রিক করতে বললেন। সবাইকে এক জায়গায় একত্রিত করা হল। তারপর মেজর জিয়াউর রহমান টেবিলের উপর উঠে বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন, "আজ থেকে আমি অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সংকল্প ঘোষণা করলাম। এবং আমার নির্দেশেই সবকিছু চলবে। আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন। এখন এখানে থাকা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। আমরা সবাই কালুরঘাটের দিকে যাব, সেখানে গিয়ে আমরা সবকিছু রিঅর্গানাইজ করব এবং আমাদের পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করব"।

তিনি আরো বলেছেন, "২৬শে মার্চ ভোরে আমরা কালুরঘাটের আর একটু দূরে গিয়ে পৌছলাম। সেখানে আমরা বিশ্রাম নিলাম এবং রিঅর্গানাইজেশন করলাম। ২৬শে মার্চ এভাবে কেটে গেল।

২৭শে মার্চ সন্ধার সময় মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে গেলেন এবং ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন যে, আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত আছি। আপনারা যে যেখানে আছেন, সামরিক ও বেসামরিক লোকজন, যেন আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন। সবাইকে অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে বললেন। তিনি বিশ্বের শান্তিকামী দেশগুলোর সাহায্য এবং সহযোগিতা কামনা করলেন। দেশবাসীকে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে বললেন।"

এ পর্যন্ত উল্লিখিত বক্তব্যগুলো থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬শে মার্চ কোন এক সময় বা ২৭ মার্চ সকাল দশটা থেকে সাড়ে দশটায়, বিকেলে বা সন্ধ্যায় নিজ পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও, ২৬শে মার্চ সকাল হওয়ার আগেই অর্থাৎ, ২৫শে মার্চ দিনগত রাত ২টা ১৫ মিনিটের আগেই তিনি অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। এবং সে বিষয়টি চট্টগ্রামের বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সহ আওয়ামী লীগ নেতারাও অবগত হয়েছিলেন ২৫শে মার্চ গভীর রাতেই। যেমন জনাব এম,এ, হান্নান বলেছেন, "২৫শে মার্চ গভীর রাত্রে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট হতে টেলিফোনে আওয়ামী লীগ অফিসে বলা হয় সেনানিবাসের চারপাশে বেশ কিছু ছাত্র-যুবক ও উৎসাহী জনতাকে পাঠানোর জন্য। সংবাদ পাওয়া মাত্র মাইক যোগে সকলকে অবহিত করা হয়।" "৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট" অর্থই হ'ল সে সময়কালে মেজর জিয়ার নেতৃত্বে বিদ্রোহী এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাকারী বেঙ্গল রেজিমেন্ট। এরই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচার করা শুরু করেন তথা "ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা মাইকিংয়ের পাশাপাশি রাতারাতি স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত সাইক্লোস্টাইল করা কপি এবং হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেয় সারা শহরে।" তফাৎ এই যে, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মেজর জিয়ার নামের স্থলে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম জুড়ে দেয় এবং মেজর জিয়ার পক্ষে টেলিফোন অপারেটরের কাছ থেকে পাওয়া সংবাদকে 'শেখ মুজিবের ওয়্যারলেস মেসেজ' বলে চালিয়ে দেয়। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের পরবর্তী কার্যকলাপ ও কর্মপদ্ধতি প্রমাণ করে যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মীদের এ কাজের সঙ্গে তাঁরাও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মূলতঃ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব মেজর জিয়াউর রহমানের সময়োচিত ও যথাযথ সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপের

Scanned by CamScanner

কৃতিত্ব তাঁকে না দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের দিকে সে কৃতিত্ব তুলে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হন।

যার ফলে একটি অসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ে অনেক অসত্যের জন্ম দিতে হয়েছে। একটি নন-ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে গোটা জাতিকেই বিভক্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে, সরকারীতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মালিক শ্রেণীর শত্রুমনোভাবাপন্ন দু'টি বড় রাজনৈতিক দলের। আর সে সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা—সে সেই সম্পর্ককে আরো কাজে লাগাচ্ছে রাজনৈতিক বলে কথিত দুর্নীতি পরায়ণ 'রাজনীতিক ব্যবসায়ী' মহল, সন্ত্রাসী, কালোবাজারী, চোরাচালানী, ঋণখেলাপি সহ সকল দুর্বৃত্ত ব্যক্তিরা,— কাজে লাগাচ্ছে দুর্নীতিবাজ-ঘুষখোর আমলা-কর্মচারীরা, কাজে লাগাচ্ছে দুর্নীতিবাজ-ঘুষখোর ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা।

অথচ বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদ সবকিছু জেনেশুনে, তাঁর তৎকালীন দলীয় সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই বাংলাদেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণে পরিষ্কারভাবেই বলেছিলেন, "এই প্রাথমিক বিজয়ের সাথে সাথে মেজর জিয়াউর রহমান একটি পরিচালনা কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর। এখানেই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।" সেদিনের সে বক্তব্যের বিরোধীতাও করেননি কেউ।

দ্বিতীয়ত, ১৯৭১ খ্রীঃ যুদ্ধে ভারতের সহায়তাকে (যদিও ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজে নিঃস্বার্থ সহায়তা বলে কোন রাষ্ট্রের কিছু থাকতেই পারে না) নিশ্চয়ই আমরা অস্বীকার করব না। ১৯৭১ খ্রীঃ পূর্ব পাকিস্তান বিষয়ক ভারতের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বিভাগের পরিচালক ছিলেন মিঃ জে,এন,দিক্ষিত। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানী শত্রুমুক্ত বাংলাদেশে ভারতের প্রথম মিশন প্রধান হিসেবেও তিনি ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশে এসেছিলেন, এবং এদেশে ১৯৭৫ খ্রীঃ মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতের একজন কূটনীতিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনিও তাঁর লেখা Liberation And Beyond Indo-Bangladesh Relations বইয়ে পরিষ্কার ভাবেই লিখেছেন যে, মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম রেডিও ষ্টেশন দখল করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য সকল বাঙ্গালী সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যগণের প্রতি আহবান জানান। মিঃ জে,এন,দিক্ষিত লিখেছেন, সত্য-সত্যই জিয়াউর রহমানের বেতার ঘোষণা এসেছিল মুজিবের বেতার ঘোষণার অল্প কিছু পূর্বে। তাঁর এ বক্তব্যের অর্থ হল, শেখ মুজিবের পক্ষে বেতার ঘোষণার পূর্বেই মেজর জিয়ার বেতার ঘোষণা এসেছিল।

১৯৭১ খ্রীঃ ৬ নভেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র- শিক্ষকদের এক সমাবেশে বলেছেন, "স্বাধীনতার ডাক এসেছিল শেখ মুজিব গ্রেফতার হবার পরে, তার পূর্বে নয়। আমার জানা মতে এমনকি এখন পর্যন্ত তিনি নিজে স্বাধীনতার কথা বলেননি।" (The cry for independence arose after Sheikh Mujib was arrested and not before. He himself, so far as I know has not asked for independence even now.)

উপরন্তু, ১৯৭৭ খ্রীঃ ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়াউর রহমান ভারত সফরে গেলে তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় ভারতের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নীলম

সঞ্জীব রেড্ডি জিয়াউর রহমানের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেছিলেন, "একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা দানকারী হিসেবে আপনার মর্যাদা আপনার দেশের গৌরবময় ইতিহাসে এরই মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" (Your position is already assured in the annals of the history of your country as a brave fighter who was the first to declare the independence of Bangladesh.)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত উল্লিখিত বক্তব্যগুলো, সে-সঙ্গে সমগ্র ঘটনাপ্রবাহের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি তা হ'ল মেজর জিয়াউর রহমানই প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক।

দ্বিতীয়ত, কারো কারো বক্তব্য অনুযায়ী নিজেকে সুপ্রীম কমান্ডার ও সামরিক সরকার প্রধান হিসেবে বেতার মারফত মেজর জিয়া কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ২৬ মার্চ বলা হলেও, আওয়ামী লীগের চট্টগ্রামের সে সময়কালের নেতাগণের পাশাপাশি কেউ কেউ মেজর জিয়ার বেতার মারফত সে স্বাধীনতা ঘোষণা ২৭শে মার্চ বলেছেন, — তাতে মেজর জিয়া কর্তৃক বেতার মারফত প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি নাকচ হয় না। কারণ, প্রকৃত অর্থেই মেজর জিয়ার আগে অন্য কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নি। তাছাড়া, আওয়ামী লীগ নেতাদের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করার মত বস্তুগত ভিত্তি তখনও অনুপস্থিত। জনাব এম, এ, হান্নান "বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন" বলে বললেও, শেখ মুজিবের পক্ষে বা নিজ পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা বলতে যে রূপের বাণী বা বিবৃতি হওয়া উচিত তার কোনো কিছুই সে বক্তব্যে ছিল না।

যেহেতু মেজর জিয়া ইতিমধ্যেই ২৫শে মার্চ দিনগত রাতে (২৬শে মার্চ) বিদ্রোহ করে "বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ" করার ঘোষণা দিয়েছেন এবং আওয়ামী লীগ অফিস সহ চট্টগ্রামের প্রশাসন আধিকারিকদের বিষয়টি অবহিত করেছেন, সেহেতু মেজর জিয়ার সে ঘোষণাকে পাল্টা কিছু একটা দিয়ে নিজেদের (শেখ মুজিবের) পক্ষে কৃতিত্বের দাবী আদায়ের কৌশল হিসেবে শেখ মুজিবের পক্ষে কিছু একটা বলার বা করার ইচ্ছে থেকে এ পদক্ষেপ বলেই অনুমতি হচ্ছে। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয় নি। কারণ, জনাব এম, এ, হান্নান সে বক্তব্যে যা বললেন তাকে আর যাই বলা হোক না কেন, স্বাধীনতা ঘোষণা বলবার কোন সুযোগই নেই।

যে কারণে মেজর জিয়ার ঘোষণা ২৬শে মার্চ বা ২৭শে মার্চ যে তারিখেই হোক না কেন, আমাদের কাছে একই অর্থ বহন করে।

তবে, "২৭শে মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান নিজেকে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং মুক্তিবাহিনীর প্রধান রূপে ঘোষণা করে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা দেন এবং সকলকে যুদ্ধে যোগ দেয়ার আহবান জানান"—এ বক্তব্যের পরেই যখন বলা হচ্ছে (যেমন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৫ শিক্ষাবছর থেকে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত "পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ" বইয়ে) যে, "এরপর থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়"—এ কথাগুলো সঠিক নয়। কারণ, সশস্ত্র প্রতিরোধ তথা মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছিল। উপরন্তু, চট্টগ্রামে ই-পি-আর ক্যাপ্টেন রফিক-উল-ইসলামের নেতৃত্বে বিদ্রোহ হয়েছিল মেজর জিয়াউর রহমানের বিদ্রোগের আগেই, যা আমরা আমাদের এ বক্তব্যেও দেখিয়েছি। তাছাড়াও, মেজর জিয়াউর রহমান নিজেকে সরাসরি 'প্রেসিডেন্ট' হিসেবে

Scanned by CamScanner

ঘোষণা দেননি, তিনি নিজেকে "সাময়িক সরকার প্রধান" (Provisional Head of Government) হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

আমরা এতকিছু বলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে শেখ মুজিবুর রহমানের কোন ভূমিকা নেই তা বুঝাতে চাচ্ছি না। ক্ষেত্র প্রস্তুত না হলে, একজন মেজর জিয়া কেন, দশজন মেজর ঘোষণা দিলেও জনগণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন না। শেখ মুজিবুর রহমানের স্বায়ত্তশাসন তথা ৬-দফা আন্দোলনের কারণেই যে সে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, তা অস্বীকার করার অর্থই হল বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। শেখ মুজিব ছিলেন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী নেতা।

শেখ মুজিবুর রহমানের যে সমস্যা ছিল তা হল, তিনি ছিলেন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী নেতা এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ছিলেন একজন পেটি বুর্জোয়া। আর দলীয়ভাবেও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছিল মূলতঃ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী পেটি বুর্জোয়াদের পার্টি। আর একজন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী নেতা হওয়ার কারণে শেখ মুজিবের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালী মনোভাবও ব্যাপকভাবে কাজ করেছে। ফলে তিনি একটি অনুন্নত বহুজাতিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সীমা লঙ্ঘন করেও বহুজাতিক রাষ্ট্রের কর্ণধার হতে চেয়েছেন। অন্যদিকে, পেটি বুর্জোয়া অবস্থানের কারণে তিনি এবং তার দলের নেতারা ছিলেন দোদুল্যমান। কার্ল মার্কসের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, "উন্নত সমাজে পেটি বুর্জোয়ারা তাদের অবস্থানের কারণেই আবশ্যিকভাবে একদিকে সোশ্যালিস্ট, অন্যদিকে অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ বৃহৎ বুর্জোয়ার মহিমায় তাদের চোখে ধাঁধা লাগে এবং জনসাধারণের দুর্গতির প্রতি তাদের সহানুভূতিও থাকে। তারা হচ্ছে একাধারে বুর্জোয়া ও জনসাধারণের লোক।"

এ সকল কারণেই এঁরা (যেমন শেখ মুজিবুর রহমান) কখনো কখনো সমাজতন্ত্রী হয়ে ওঠেন, শোষণহীন সমাজের কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করতেও প্রয়াশ পান। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন-সংগ্রামকে প্রতিহত করাই হ'ল এঁদের উদ্দেশ্য। কারণ, সমাজতন্ত্র তথা শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যা দরকার তা হ'ল মালিক শ্রেণীগুলোর (অর্থাৎ বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া) বিপরীতে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব স্বাধীন পার্টি এবং বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়াদের বিপরীতে চাই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব তথা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, পেটি বুর্জোয়ারা "ভয় ও আশার মধ্যে দোদুল্যমান হয়ে তারা লড়াই-এর সময় নিজেদের গায়ের বহুমূল্য চামড়াটি বাঁচিয়ে চলবে, আর লড়াই শেষ হয়ে গেলে যোগ দেবে বিজয়ীদের দলে। তাদের স্বভাবই হল এই।"

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রশ্নে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমেয় হবে যে জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোকে সমর্থন করেননি। তাঁদের বিচারে যে কোন দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বিষয়গতভাবে শ্রেণী সংগ্রামে সহায়ক হলে সেটি অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। আবার এই আন্দোলনগুলোতে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রীয়াশীল উপাদানের উপস্থিতি সম্পর্কেও তাঁরা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এঙ্গেলস লিখেছেন যে, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করে তাদের নানা ধরনের ভ্রান্ত ধারণা, মোহ ও সংস্কারকেও সমর্থন করাটা হবে অত্যন্ত বড় ভুল। আর জাতীয়তাবাদ সর্বক্ষেত্রেই থাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে আবদ্ধ। এ কারণেই আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, জাতীয়তাবাদ তা সে সবচেয়ে 'ন্যায্য', সবচেয়ে 'বিশুদ্ধ' সবচেয়ে মার্জিত ও সুসভ্য হলেও, তার সঙ্গে মার্কসবাদের কোনো আপোস নেই। তুর্কী

Scanned by CamScanner

সাহিত্যিক ওরহান পামুক সঠিকভাবেই মূল্যায়ণ করেছেন যে, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও শান্তি; কিংবা জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র এক ছাদের নিচে ঘুমায় না।

অনেক অধ্যাপক, প্রগতিশীল বলে দাবিদার ব্যক্তি জাতীয়তাবাদীদের বিপ্লবী বলেও আখ্যায়িত করতে দ্বিধাবোধ করেন না। এসবই হয় অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক তাত্ত্বিক বিষয়াবলী ও ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাবের কারণে। এঁরা মূলতঃ সাংস্কৃতিক-স্বাধীনতার মধ্যেই সমস্ত সমস্যার সমাধানের কল্পনা করে থাকেন। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে জাতীয়তাবাদীদের পরিণতি হয় স্বৈরাচারী তথা একনায়কতন্ত্রী রূপে।

তাছাড়া, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ আর দেশপ্রেম এক জিনিস নয়। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ যখন কখনই সামগ্রিক স্বার্থের কথা বলে না, সীমিত গন্ডির মধ্যে স্বার্থ সীমিত করে রাখে তখন দেশপ্রেমের প্রথম কথাই হলো স্বার্থের সীমারেখা ভেঙ্গে ফেলা। সমগ্র সমাজের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে প্রকৃত দেশপ্রেমিকও হওয়া যায় না। তিনিই প্রকৃত দেশপ্রেমিক যিনি প্রকৃত বিপ্লবী, আবার তিনিই প্রকৃত বিপ্লবী যিনি যথার্থ দেশপ্রেমিক। আর বিপ্লব মানে সমগ্র জনগণের ঐক্য ও সমগ্র জাতি তথা প্রতিটি মানুষের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য স্বার্থপরতাশূন্য এক মানবিক প্রয়াস।

শেখ মুজিবুর রহমানের শ্রেণীগত অবস্থানই তাঁকে তাঁর গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলো। একই কারণে তিনি ছিলেন দোদুল্যমান। তিনি কেন যথাসময়ে যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি তার কারণও নিহীত তাঁর শ্রেণীগত তথা স্বভাবগত অবস্থানের মধ্যে। তখন তিনি ছিলেন একদিকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী, অন্যদিকে কিছু ঘটে গেলে পূর্ব পাকিস্তানের কর্ণধারও তিনিই। তিনি ছিলেন ভয় ও আশার মধ্যে দোদুল্যমান। সে-সময়কালে শেখ মুজিবুর রহমান একাধারে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের অবিসংবাদিত নেতা এবং বাঙ্গালী মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা। যে কারণে ১৯৭২ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী পাকিস্তানে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে, ১০ই জানুয়ারী বাংলাদেশে পদার্পণ করেই তাঁর প্রথম ভাষণে তিনি বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে (মুসলিম) যুদ্ধাপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, মাদ্রাসা বোর্ড গড়েছেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সৃষ্টি করেছেন এবং বাংলাদেশকে মুসলিম রাষ্ট্রের মর্যাদায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (O.I.C) সদস্য বানিয়েছেন। অথচ সমাজতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতার মৌলিক বিষয়াবলীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল ধর্মকে হতে হবে রাষ্ট্র থেকে আলাদা, রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মীয় সংগঠনকে জড়িত করা চলবে না, সরকারী নথিপত্রে কোন নাগরিকের ধর্মের উল্লেখমাত্রও প্রশ্নাতীতভাবে বর্জনীয়, ধর্ম হবে প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত বিষয়, কেউ কারো ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না, ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র ও প্রতিটি নাগরিক সম্পূর্ণভাবে থাকবেন নিরপেক্ষ, ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের অর্থও ব্যয় করা হবে নিষিদ্ধ। আবার জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র যে এক ছাদের নিচে ঘুমায় না তারও প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৭৫ খ্রীঃ ২৫ জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান যখন গণতন্ত্র হত্যা করে একদলীয় রাষ্ট্রপতিশাসিত একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র কায়েম করে দেশের রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হলেন। অথচ মূলতঃ যে কারণে জনগণ পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিল তার মূলে ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমস্যা, এক ব্যক্তির শাসন তথা সামরিক জংলী শাসনের ব্যাপারে জনগণের ছিল তীব্র রোষ, জীবনের সর্বস্তরে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বিস্তার—জনগণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা হরণ। এর অন্তর্নিহিত

Scanned by CamScanner

অর্থই হ'ল বুর্জোয়া বিপ্লব তথা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন না হওয়ার সমস্যা। জনগণ অগণতান্ত্রিক-স্বেচ্ছাচারী শাসনাধীন পাকিস্তানকে মেনে নেয়নি।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণ যেখানে কয়েক লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে, সেখানে আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি প্রতিক্রিয়াশীল ইসলামিক জঙ্গীবাদের ব্যাপক বিকাশ তথা বোমাবাজি ও হত্যাপরাধ। এরূপ জঙ্গীবাদের বিকাশ কিন্তু অল্প কিছুদিন বা কয়েক মাস—এমন কি মাত্র কয়েক বছরে ঘটেনি। এর মূল কারণ হ'ল বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যারাই যখন ক্ষমতায় এসেছেন এবং যারা বিরোধী দলে অবস্থান নিয়েছেন, তাদের কেউই প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্রের চর্চা করেননি,—এমন কি সে সব দলের কর্মপদ্ধতি ও তাদের দলীয় গঠনতন্ত্রের অনেক বিধানই আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। দ্বিতীয়তঃ, নিজ নিজ ক্ষমতা রক্ষার সার্থে এবং সংকীর্ণ ধর্মীয় অবস্থানের কারণে এখানে ক্ষমতাসীনদের সকল দলই ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের ব্যবহার করতে চেয়ে তাদের লালন-পালন করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন।

উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৭৫ চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানে স্বৈরাচারী একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলী সংযোজনের ফলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক তথা জাতীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ও বিচার বিভাগের যে সর্বনাশ করা হয়েছে তা আজও পুনরুদ্ধার হয়নি। শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক একতরফাভাবে যুদ্ধাপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, মাদ্রাসা বোর্ড সৃষ্টি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যপদ গ্রহণ; সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক ১৯৭৮ খ্রীঃ সামরিক আইন তথা অগণতান্ত্রিক জংলী আইনবলে সংবিধানে "বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম" সংযোজন, রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির ৮ অনুচ্ছেদ থেকে "ধর্মনিরপেক্ষতা" বিলুপ্তী, "সর্ব-শক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" সংযোজন ও সমাজতন্ত্র-কে "অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার" বলে আখ্যায়িত করা এবং সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্বলিত "সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে মর্যাদা দান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার এবং কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা হবে" ১২ অনুচ্ছেদটি নম্বরটি সহ সম্পূর্ণরূপে রদ করা, সে-সঙ্গে ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে যে বলা হয়েছিল যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ বা ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করা যাবে না—সে অংশটি সংবিধান থেকে সম্পূর্ণরূপে রদ করা, (পরবর্তীতে সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ দ্বারা অনুমোদিত); এবং অগণতান্ত্রিকভাবে সামরিক আইন তথা জংলী আইনবলে ক্ষমতা দখল করে সে ক্ষমতা সংহত করার পর জেনারেল এইচ,এম,এরশাদ কর্তৃক (সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৩০নং আইন)-এর ২ ধারাবলে সন্নিবেশিত) সংবিধানের প্রজাতন্ত্র অংশে ২ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" উল্লেখ করা—এসবই হ'ল এক ধারাবাহিকতা। এভাবেই বাংলাদেশকে পরিণত করা হয়েছে ইসলামী জঙ্গীবাদের লালনভূমিতে। ক্ষয়িষ্ণুতার দিকে এগিয়ে নেয়া হয়েছে গণতন্ত্রকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা বিতর্কের প্রসঙ্গে এত কিছু বলার উদ্দেশ্য হ'ল, আমরা চাই যে শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমান বিতর্কের অবসান হোক। কারণ, এ বিতর্কের সুযোগে সুযোগ-সন্ধানীরা জাতির যে সার্বিক অবক্ষয় ঘটিয়েছে—সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক অগ্রগতি অন্তত পঞ্চাশ বছর

Scanned by CamScanner

পিছিয়ে দিয়েছে। জাতির মঙ্গলের লক্ষ্যে এ অবস্থার দ্রুত অবসান অত্যন্ত জরুরী। যা সত্য তা হ'ল, শেখ মুজিবুর রহমান অবিসংবাদিত বাঙালী জাতীয়তাবাদী নেতা এবং জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক।

২৬ মার্চ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত People's View (পিপ্‌লস্‌) ভিউ) পত্রিকায় (Mujib Calls for General Strike Tomorrow) মুজিবের আগামীকাল সাধারণ ধর্মঘট আহবান শিরোনামে যে খবর পরিবেশিত হয় তাতে বলা হয়, ঢাকা, ২৫ মার্চ : সৈয়দপুর, রংপুর এবং জয়দেবপুরে অসামরিক জনতার উপর ব্যাপক গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে অদ্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ২৭ মার্চ সমগ্র বাংলাদেশে হরতাল পালনের অহবান জানিয়েছেন।

এ পত্রিকাটিতে সেদিন নগরীতে মধ্যরাতে মিছিল (Midnight Procession in City) শিরোনামে আরও একটি খবর পরিবেশিত হয়, তাতে বলা হয় ঃ

শান্তিপূর্ণ চট্টগ্রাম পোর্ট নগরী অকস্মাৎ গত মধ্যরাতে জেগে ওঠে এবং হাজার হাজার মানুষ প্রধান প্রধান সড়কে মিছিল করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে। লালদিঘি ময়দানে এক বিশাল জনতার সমাবেশ ঘটে। তারা বাংলাদেশের মুক্তির শ্লোগান দেয় এবং দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। গত রাত (অর্থাৎ, ২৫শে মার্চ দিনগত রাত) ১২টার পর ঢাকার সাথে কোন যোগাযোগ করা যায়নি এবং টেলিফোন লাইন অকেজো হয়ে যায়। সুতরাং গত রাত ৪টা পর্যন্ত ঢাকার সাথে যোগাযোগের আমাদের সব রকমের চেষ্টা সত্ত্বেও ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতির কোন খবর দেয়া গেল না। শেষরাত পর্যন্ত পিপল্‌স্‌ ভিউ অফিসে শত শত টেলিফোন আসে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার জন্য কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন কিছু দেয়া গেল না।

২৬শে মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় "শেখ মুজিব বলেন—এ গণহত্যা বন্ধ কর ২৭শে মার্চ সমগ্র বাংলাদেশে সর্বাত্মক ধর্মঘট" শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। দখলদার বাহিনীর আগের রাতে আক্রমণের এবং সান্ধ্য আইন জারীর সে-সঙ্গে ২৬শে মার্চ পত্রিকা অফিসটি জ্বালিয়ে দেয়ার কারণে যদিও সে পত্রিকাটি জনসমক্ষে পৌছতে পারেনি। পরবর্তীতে ১৯৭২ খ্রীঃ ২৬ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক সেদিনের সে খবরটি আবার প্রকাশ করে। ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ খবরটি ছিল নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকাল (শনিবার) সমগ্র বাংলাদেশে হরতাল পালনের আহবান জানাইয়াছেন। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় প্রদত্ত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, নিরস্ত্র জনগণকে এইভাবে অবাধে গুলি করিয়া হত্যা ও তাহাদের উপর নৃশংস নির্যাতন চালাইতে দেওয়া হইবে না। সৈয়দপুর, রংপুর, জয়দেবপুর এবং চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণের নিন্দা করিয়া বঙ্গবন্ধু বলেন, বেসামরিক জনগণের উপর বেপরোয়া গুলীবর্ষণ ও নৃশংস নির্যাতন চালান হইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। পুলিশের ভূমিকাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হইয়াছে এবং সেনাবাহিনী সর্বত্র সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছে।

তিনি বলেন যে, চট্টগ্রামে নিরস্ত্র জনগণের উপর প্রচন্ড গুলিবর্ষণের খবর পাওয়া গিয়াছে। এমন এক সময় এই সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে যখন প্রচন্ড রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের ঘোষিত উদ্দেশ্য লইয়া প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সেনাপতি স্বয়ং ঢাকায় অবস্থান করিতেছেন।

Scanned by CamScanner

আওয়ামী লীগ প্রধান অবিলম্বে সকল সামরিক তৎপরতা বন্ধের নির্দেশদানের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশের নির্ভিক জনগণ মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রস্তুত।

২৬ মার্চ বেলা দশটার দিকে দুইটি ট্যাঙ্ককে দৈনিক ইত্তেফাক অফিসের সম্মুখ দিয়ে মতিঝিলের দিকে অগ্রসর হতে দেখা যায়। বিকাল প্রায় ৫টার সময় ট্যাঙ্ক দু'টি আবার প্রত্যাবর্তন করে এবং ইত্তেফাক অফিসের পশ্চিম দিকের মোড়ে পার্ক করে। এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইত্তেফাক অফিসে বর্ষিত হয় ট্যাঙ্কের গোলা। এর আধঘন্টা পর সশস্ত্র দখলদাররা ইত্তেফাক ভবনে প্রবেশ করে নীচতলাস্থ মেশিন-পত্রে অগ্নিসংযোগ করে। এর কিছুক্ষণ পরেই ইত্তেফাক ভবনে ঘটে প্রচন্ড বিস্ফোরণ। জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায় সবকিছু।

এদিন ঢাকা থেকে সকল বিদেশী সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের বহিষ্কার করা হ'ল।

এদিন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণ প্রচারিত হল। সে ভাষণে অন্যান্যের মধ্যে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পার্টিকে পাকিস্তানের শত্রু বলে আখ্যায়িত করে শেখ মুজিবের কর্মতৎপরতাকে পাকিস্তানের ঐক্য ও অখন্ডতা বিরোধী ঘোষণা করে তিনি বললেন যে, এ অপরাধকে বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেয়া হবে না। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণকে বিদ্রুপ ও অপমান করার অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, সশস্ত্রবাহিনীকে পাকিস্তানের অখন্ডতা, ঐক্য ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তিনি সমগ্র পাকিস্তানে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করেন, সে-সঙ্গে আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত করেন।

এদিন শান্তাহারে বাঙ্গালীদের সঙ্গে অবাঙ্গালীদের ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। সুবেদার খোন্দকার মতিউর রহমান বীর বিক্রম বলেছেন, "বেলা বারটা-১টার সময় বিপুল জনতা অফিসের সামনে হাজির হয়। তারা ক্যাপ্টেন গিয়াসকে বলে যে, শান্তাহারের বিহারীরা অস্ত্র নিয়ে বোয়ালিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আপনারা এগিয়ে আসুন।

২৭শে মার্চ মেজর নজমুল হকের নির্দেশে তিনটি প্লাটুন তিনটি অয়ারলেস সেট সহ শান্ত াহার অভিমুখে আমার নেতৃত্বে রওয়ানা হয়। শান্তাহারে গিয়ে দেখি চারিদিকে শুধু ধোঁয়া আর আগুন, গোলাগুলির আওয়াজ। আমি অয়ারলেসে নওগাঁতে মেজর নজমুল হকের সাথে যোগাযোগ করি, বাঙ্গালী ও বিহারীর বহু মৃতদেহ উদ্ধার করি এবং পরিস্থিতি আমাদের আয়ত্তে নিয়ে আসি। মেজর নজমুল হক ১৪৪ ধারা জারী করেন।"

২৬শে মার্চ রেডিও মারফত দখলদার বাহিনী সকল ব্যক্তিমালিকানাধীন অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করে।

এদিন প্রায় দশটার দিকে দখলদার বাহিনীর জেনারেল টিক্কা খান সারা 'পূর্ব পাকিস্তানে' সামরিক আইন জারী করেন এবং ঐ জংলী আইনের নির্দেশাবলী রেডিওতে প্রচার করতে থাকে।

২৬শে মার্চ চুয়াডাঙ্গায় ই,পি,আর-এর উইং হাবিলদার-মেজর মজিবর রহমান তাঁর হেডকোয়ার্টারে একটি সফল অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ই,পি,আর, ৪র্থ-উইং কমান্ডার তৎকালীন মেজর এম,এ, ওসমান চৌধুরীর বক্তব্য হ'ল, "২৬শে মার্চ...আনুমানিক বেলা ১টায় চুয়াডাঙ্গা আমার সদর দপ্তরের সামনের রাস্তায় পৌছলাম। আমার গাড়ী দাঁড়াবার সাথে সাথেই আমার বাঙালী উইং হাবিলদার-মেজর মজিবর রহমান এসে অভিবাদন করে ঢাকার ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ

Scanned by CamScanner

দিল। আরও জানাল যে, ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরীর কোনরকম নির্দেশ ছাড়াই উইং হেডকোয়ার্টারের সমস্ত অবাঙ্গালী সেনাদের সে আটক করে রেখেছে এবং অস্ত্রাগার থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রেখেছে।"

২৬শে মার্চ দিনগত রাত ১২টার দিকে ময়মনসিংহে অবস্থিত ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানীর বাঙালী অফিসার ও সৈনিকরা পাকিস্তানী দখলদার সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে হানাদাররা পরাজিত হয়।

২৭ মার্চ দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকায় সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ২ ঘন্টার জন্য কারফিউ অর্থাৎ সান্ধ্যআইন শিথিল করে। কিন্তু নরহত্যাকারীরা সে দু'ঘন্টার মধ্যেও অনেককে হত্যা করেছে। ব্যাপক লোক ঢাকা শহর ত্যাগ করে।

ক্যাপ্টেন মোঃ মতিউর রহমান ২৫শে মার্চ যশোহর সেনানিবাসের ২৫ বেলুচ রেজিমেন্ট ছেড়ে ২৭শে মার্চ ময়মনসিংহ পৌছেন। ময়মনসিংহ ই,পি,আর-এর সাথে যোগ দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদের কমান্ডার নিযুক্ত হন।

২৭ মার্চ সকালে মেজর শাফায়াত জামিল বিদ্রোহ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে বিনা রক্তপাতে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় সব কয়টা কোম্পানী তার সম্পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, যানবাহন, রসদপত্র নিয়ে দখলদারদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। বেলা আড়াইটার সময় মেজর খালেদ মোশাররফ তাঁর কোম্পানী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌছেন। মেজর শাফায়াত জামিল-এর বক্তব্য অনুযায়ী মেজর খালেদ মোশাররফ "আসা মাত্রই আমি চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুক্ত এলাকা তাঁর কাছে হস্তান্তর করি এবং তাঁর নির্দেশে পরবর্তী পন্থা নির্ধারণ করা হয়।"

মেজর সাফায়াত জামিল সেদিনের অভ্যুত্থানের যে বিবরণ দিয়েছেন তার অংশবিশেষ হ'ল "আমার উদ্দেশ্য ছিল রক্তপাতহীন একটা এ্যাকশন পরিচালনা করা। ...একটা তাঁবুতে অফিস করা হয়েছিল। তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার তাঁবুতে ঢোকা মাত্রই লেঃ কবীর আর লেঃ হারুন তাঁবুর দুপাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং আমি আমাদের সকলের আনুগত্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ঘোষণা করি এবং বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে তাদেরকে বলি যে তারা আমাদের বন্দী। তদানুসারে তাদের জীবনের দায়িত্ব আমাদের এবং তারা যেন কেউ কোন বাঙালী অফিসার, জে-সি-ও, এন-সি-ও-এর সাথে কোন কথা না বলে। বাহুল্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানী ১২/১৫ জন সৈনিক যারা চতুর্থ বেঙ্গল-এর সাথে ছিল আমার নির্দেশের অপেক্ষা না করেই প্রায় একই সময়ে তাদেরকে বন্দী করে এক জায়গায় জমা করে রাখা হয়। বিনা রক্তপাতে আমাদের এ্যাকশন সম্পন্ন হয় এবং চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় সব কটা কোম্পানী তার সম্পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, যানবাহন, রসদপত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

ই,পি,আর-এর সি কোম্পানী সহ ২নং উইং হেডকোয়ার্টার ময়মনসিংহে অবাঙ্গালী অফিসার ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস ২৭ মার্চ বাঙ্গালী সৈনিকদের নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে তাদের বিশ্রামে যাওয়ার কথা বললে সুবেদার এ,কে,এম,ফরিদউদ্দিন আহমদ সন্দেহবশে তা মানতে অপারগতা প্রকাশ ক'রে বাঙ্গালী সৈনিকদের অস্ত্র সজ্জিত থাকতে বলেন। সেখানে বাঙ্গালীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২২০ জন আর অবাঙ্গালীরা ছিল ১৩৮ জন। ২৭ মার্চ রাত সাড়ে এগারোটার সময় অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালীদের উপর আক্রমণ শুরু করলে বাঙ্গালীরা পাল্টা ব্যবস্থা নেয়। তাতে দু'দিক হ'তে তুমুলভাবে আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন শুরু হয়। এ যুদ্ধ চলে ২৮ তারিখ বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। অবাঙ্গালীদের মধ্য হতে ১২১ জন মারা

Scanned by CamScanner

যায় এবং বাকী সতের জন সুবেদার এ,কে,এম,ফরিদউদ্দিন আহমদের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধে মোজাহিদ অস্ত্রাগার বাঙ্গালীদের দখলে আসে। কোতে থাকা ১৪৭২টা রাইফেল, ২৮টি এস এম জি, বেশ কিছু স্টেনগান, এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ৩০৩ গুলি, প্রায় ৩৬ হাজার ৯ এম এম গুলি এবং আরও যুদ্ধসরঞ্জাম তাঁরা দখল করে এবং ২টি রাইফেল ছাড়া সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ৩০ মার্চ তারিখে সকাল ৮ ঘটিকার সময় মেজর এ,কে,এম শফিউল্লাহর নিকট হস্তান্তর করে।

২৭ মার্চ সিলেটে সশস্ত্র প্রতিরোধ-এর যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত-এর বক্তব্য থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি, তিনি বলেছেন, "২৭শে মার্চ ১৯৭১ সন আমার বাড়িতে বসে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কয়েকজন মিলে নানা আলাপ-আলোচনা চলছে। তখন কয়েকজন ছাত্র এসে আমাকে বলল, "দাদা, পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।" বললাম "আমিও তা চাই।" অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রদের মতানুযায়ী চলা ঠিক নয়। তাই আমি ওদেরকে বললাম কর্নেল রব (এমসিএ)-এর কথা, যিনি বর্তমানে জেনারেল রব। কিছুদিন আগে তিনি ঢাকাতে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে যোগদান করে এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা জানা যাবে, এই ভেবে বললাম, কর্নেল রব যদি আমাকে বলেন তাহলে আমি এই মুহূর্তে প্রস্তুত।

২৭শে মার্চ শনিবার ১৯৭১ সন। বেলা প্রায় দুটায় জেনারেল রব তার বাড়ীতে আমাকে যাবার জন্য খবর পাঠালেন। গিয়ে দেখলাম কামরার ভেতরে বসে আছে আনসার মুজাহিদের কয়েকজন, সামরিক বাহিনীর কয়েকজন যারা ছুটি কাটাতে এসেছিলেন এবং কিছু সংখ্যক ছাত্র। বাড়ির বাইরের খোলা যায়গায় বিরাট ভীড়। আমাকে দেখেই সকলে "জয় বাংলা" "জয় বাংলা" বলে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। দেখলাম হাতিয়ার নিয়ে প্রায় ১৫০ জনের মত লোক যাবার জন্য তৈরি। কয়েকটি বাস ও ট্রাক একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। চারধারে শুধু ধ্বনিত হতে লাগল "জয় বাংলা"। আমি হাত উঠিয়ে সকলকে অভিবাদন করলাম।

ঘরের ভেতরে ঢুকতেই জেনারেল রব সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আজই পাঁচটায় যে লোকবল আছে তাদের নিয়ে সিলেটকে মুক্ত করবার জন্য যাত্রা করব। যুদ্ধ পরিচালনার ভার আমাকে দেয়া হল। আমি হাসিমুখে আমার সম্মতি জানিয়ে সকলকে অভিবাদন জানালাম এবং যাত্রাপথে গাড়ীতে আমাকে উঠিয়ে নিতে অনুরোধ করলাম।"

ঠাকুরগাঁ ই,পি,আর উইং সদরে অভ্যুত্থান প্রসঙ্গের বিবরণ দিয়েছেন সে অভ্যুত্থানের নেতা সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন। তিনি বলেছেন, "২৫শে মার্চের ... বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা, পিলখানা হইতে প্রেরিত বেতার সংকেত কিছুই আমাদের কানে পৌছে নাই। ... ২৭ তারিখ আবার ঠাকুরগাঁ টাউন রক্তে রঞ্জিত হইল আমাদের নির্মম গুলির আঘাতে।

... আমি সেই দিনই সুবেদার হাফিজ, সুবেদার আতাউল হক, নায়েক সুবেদার মতিউর রহমান, হাবিলদার আবু তালেব ও নায়েক আব্দুল হাকিমকে নিয়া এক গোপন আলোচনা সভায় বসিয়া সিদ্ধান্ত নিলাম পরদিন ভোর ৬টায় পশ্চিমাদের উপর আমাদের তরফ হইতে আক্রমণ চালানো হইবে। কিন্তু হায়, পরিকল্পনা অনুসারে সুবেদার হাফিজ যখন পশ্চিমানিধনে উদ্যত হইলেন তখন জনৈক বাঙ্গালী হাবিলদারের অসহযোগিতার দরুন তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সেই দিনকার মত আক্রমণ স্থগিত রহিল।

... ২৮শে মার্চ ভোরেও বিশেষ কারণে পরিকল্পনা মাফিক আমাদের পশ্চিমাদের উপর আক্রমণ চালানো সম্ভব হইল না। ... (২৯ মার্চ) সুবেদার হাফিজ ... পথিমধ্যে দিনাজপুর হইতে

Scanned by CamScanner

পলায়নপর বাঙ্গালী ইপিআর জোয়ানদের নিকট জানিতে পারেন সেই দিন দুপুরেই দিনাজপুর সেক্টর হেডকোয়ার্টার কুটিবাড়ীতে বাঙ্গালী ইপিআর লোকদের সঙ্গে আর্মি ও ইপিআরের পশ্চিমাদের তুমুল সংঘর্ষ শুরু হইয়া গিয়াছে। এক নিমেষে মনে মনে তিনি নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া সাত তাড়াতাড়ি উইং সদরে ফিরিয়া আসেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। আসিয়াই তিনি মাগরেবের নামাজের জন্য আমাকে মসজিদে উপস্থিত পান এবং উপরোক্ত বিষয় অবহিত করেন। অপরদিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিশ্চস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম রাত্রি পৌণে ১১টায় উইং-এর শেষ পেট্রল লাইনে ফিরে আসার পরই বাঙ্গালীদের উপর হামলা শুরু করার নির্দেশ এবং আমাকে গ্রেফতার করার আদেশ সৈয়দপুর আর্মি হেডকোয়ার্টার দিয়া দিয়াছে। অতএব আমার বাসায় সুবেদার হাফিজ, ৮ উইং-এর সুবেদার আতাউল হক, নায়েক সুবেদার মতিয়ুর রহমান ও আরও জন তিনেক জোয়ান একত্রিত হইয়া মিনিট কয়েকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিলাম বিপ্লব ঘটাইবার এবং সেই রাতেই। এমন সময় উইং কমান্ডার হইতে আদেশ আসিল সব হাতিয়ার ম্যাগাজিনে জমা দিতে হইবে। মুহূর্তে খানদের চক্রান্ত সম্বন্ধে আমার দ্বিধা দূর হইল। আমি আরও শক্ত হইয়া বাঙ্গালী সহকর্মীদিগকে অস্ত্র জমা না দিবার নির্দেশ দিলাম। পরম পরিতোষের বিষয় সকলেই একবাক্যে আমার আদেশ মান্য করিল এবং হাতিয়ার জমা দেওয়া হইল না একটিও। বিপ্লব করিতেই হইবে, অথচ এদিকে অসুবিধা ছিল ঢের।

... রাত ১০টা ১৮ মিনিট। চারিদিকে অন্ধকার, থমথমে ভাব। সুবেদার হাফিজের হস্তস্থিত ছোট্ট স্টেনগানটা হঠাৎ গর্জিয়া উঠিল। মেজর আর ক্যাপ্টেনের দেহরক্ষীদলের অধিনায়ক হাবিলদার মোহাম্মদ জামান বুকে গুলিবিদ্ধ হইয়া পরকালের যাত্রী হইল তাহারই গার্ড-রুমের বিছানায়। ইশারা বুঝিয়া পর মুহূর্তে আরও অনেক ক্ষুধার্ত হাতিয়ার গর্জিয়া উঠিল একসঙ্গে। বেশ কয়েকজন পশ্চিমা পরপারের যাত্রী হইল। ... শহরবাসীরা প্রথমে গোলাগুলির শব্দে ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেও অনতিবিলম্বে আমাদের বিজয় সংবাদ শ্রবণে হাজার হাজার মুক্তিপাগল মানুষ সমবেত কণ্ঠে 'জয় বাংলা' ধ্বনি সহ বিভিন্ন শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল এবং তাহারা বিভিন্ন প্রকারে আমাদের সাহায্য করিতে লাগিল। সেই দিন ভোররাত্রে বাঙ্গালী ক্যাপ্টেন নজীর আহমদ পলায়ন করিতে থাকেন। সম্ভবতঃ সৈয়দপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পদব্রজে সামান্য কিছু দূর যাওয়ার পরই ক্ষীপ্ত জনসাধারণের হাতে ধরা পড়িয়া নিহত হন এবং ক্যাপ্টেন নাবিদ সস্ত্রীক আমাদের লোকজনের হাতে মারা পড়েন। ওদিকে সেইদিন ভোররাত্রেই ৮-উইং হইতে আসা সুবেদার আতাউল হক শহীদ হন। এই বিপ্লবে তাহার ভূমিকা অতি প্রশংসনীয়। তাঁহারই যোগসূত্রক্রমে সেই রাত্রেই হাজার হাজার লোক টাউনে বাহির হইয়া পড়ে এবং তাহারা আমাদের সহযোগিতা পাইয়া আবার শতগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠে এবং আমাদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসে।

২৯শে পার হইয়া ৩০শে মার্চের সকাল। আমি নায়েক সুবেদার মতিউর রহমানকে এক প্লাটুন লোকসহ ঠাকুরগাঁ হেডকোয়ার্টারকে শত্রুমুক্ত করার জন্য নির্দেশ দিলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দলবল নিয়া অগ্রসর হইলেন কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টার পর খানদের ব্যূহ ভেদ করিতে না পারিয়া ফেরত চলিয়া আসিলেন। তখন সুবেদার হাফিজ তাহার কোম্পানীর কিঞ্চিদধিক এক প্লাটুন লোক নিয়া ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং বিকাল প্রায় তিনটা নাগাদ তেতালা দালানের শেষ দুশমনটি পর্যন্ত খতম করিয়া তাহা পরিষ্কার করেন। তাহারই আদেশে প্লাটুন কমান্ডার বজল আহমদ চৌধুরী একদল লোক নিয়া উইং অধিনায়কের বাসভবন মুক্ত করেন। মেজর হোসেন এই সময়ই নিজ বাসভবনে নিহত হন। এই সময় যুগপৎ আক্রমণ করিয়া নায়েক সুবেদার মতিউর রহমান পাক আর্মির গেরিলা সুবেদার ও

Scanned by CamScanner

তাহার সঙ্গীদের খতম করিয়া জেসিও মেস পরিষ্কার করেন। ... আর এদিকে দ্রুতগতিতে লাইনের ভিতরকার সবকিছু যথাসম্ভব গোছগাছ করিয়া নিয়া হেডকোয়ার্টারের চতুর্দিকে দৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করা হইল। সুবেদার হাফিজের নেতৃত্বে তাঁহার নিজস্ব ডি কোম্পানী ব্যতীত আরও কিছু আনসার-মুজাহিদ এই প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে মোতায়েন রহিল।

ওদিকে স্থানীয় এম-সি-এ জনাব ফজলুল করিমের নেতৃত্বে ঠাকুরগাঁ শহরে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হইল। তাহাদের কর্তব্য ছিল শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং প্রয়োজনমত যুদ্ধরত লোকদের নানা কাজে সাহায্য করা। ছাত্র-জনতা আমাদের পার্শ্বে থাকিয়া যে সাহায্য করিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। স্থানীয় নারী সমাজ পর্যন্ত এই সংগ্রামে প্রচুর সাহায্য ও সমর্থন দিয়াছে। ঐ দিন (৩০শে মার্চ) সন্ধ্যা পর্যন্ত সীমান্তস্থ কোম্পানীসমূহের লোকজন ঠাকুরগাঁয় আসিয়া সমবেত হয়। আমাদের জোয়ানরা ও স্থানীয় জনসাধারণ আমাকে মেজর পদে বরিত করিয়া যুদ্ধের পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করিলেন।"

দিনাজপুর ই,পি,আর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ঘটনাবলীর বিবরণে নায়েক সুবেদার মোহাম্মদ আনসার আলী বলেন, "২৫শে মার্চ থেকেই দিনাজপুর শহরে ছাত্র জনতার মিছিল বের হতে শুরু করে। ২৬শে মার্চ সকালেই আমরা সামরিক শাসন জারী করার কথা শুনি। এটা শুনে আমাদের সাথের পশ্চিম পাকিস্তানীরা আনন্দিত হয়েছিল এবং বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলছিল। ২৬শে মার্চ বেলা দশটার দিকে আমি ৩০/৪০ জন লোক নিয়ে নিউ টাউনে ডিউটি করতে যাই।

২৭শে মার্চ ১/২ টার দিকে বিহারীরা প্রায় ১২/১৩ জন বাঙ্গালীকে হত্যা করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

২৭শে মার্চ বেলা ১২/১টার সময় তিন জন মেজর, কর্নেল এবং দুই/তিন জন ক্যাপ্টেন সহ পশ্চিম পাকিস্তানীরা এক বৈঠক করে। বেলা সাড়ে তিনটার সময় বৈঠক শেষ হয়। শেষ হবার পর ঢাকার সাথে যোগাযোগকারী সিগন্যাল সেটের কমান্ডারকে জীপে উঠিয়ে নেয় এবং তার বাসার দিকে রওয়ানা হয়। সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ১৫/২০ জন বাঙ্গালী ছিল। কোয়ার্টার মাষ্টার আবু সাইদ খোন্দকার, হাবিলদার বুলু এবং প্লাটুন হাবিলদার নাজিমও ছিল। বাকি সবাইকে ডিউটিতে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা এক জায়গায় একত্রিত না থাকে। জীপটা যখন অফিস থেকে রওয়ানা হয় সেই সময় আমাদের ৬-পাউন্ডার প্লাটুন হাবিলদার নাজিম উদ্দিন ঐ জীপকে লক্ষ্য করে গোলা বর্ষণ করে। কিন্তু গুলীটা জীপে না লেগে অফিসের কর্নারে লেগে যায়। তখন চারিদিক থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। বিকেল পাঁচটার মধ্যে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানীদের হত্যা করা হয়। জনগণ হেডকোয়ার্টারে এসে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যায়। সেক্টর হেডকোয়ার্টারের একটু দূরে সার্কিট হাউসে ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের প্রায় ১৫০ জন সৈন্য রিজার্ভ ছিল।

কাঞ্চন নদীর ওপারে গিয়ে আমরা অবস্থান নিতে শুরু করি। অস্ত্রাগার থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নদীর ওপারে গিয়ে আমরা রিজার্ভ ১৫০ জনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই। এই সংঘর্ষ দুই-তিন দিন চলেছিল।

... ২৭শে মার্চ দিনাজপুরের সীমান্ত এলাকায় সমস্ত বিওপিতে সংবাদ পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানে যত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর ছিল সবাইকে হত্যা করা হয়।"

Scanned by CamScanner

সুবেদার আরব আলী যুদ্ধের বর্ণনায় বলেন, "২৫শে মার্চের পাকবাহিনীর পৈশাচিক ঘটনার কথা আমরা ২৬শে মার্চ সকাল বেলা জানতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই।

... ২৭শে মার্চ পাঞ্জাবী বাহিনী দিনাজপুর কুটিবাড়ী ইপিআর হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে এবং সমস্ত ইপিআরকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে। এই সময় ইপিআর-রা পাঞ্জাবীদের পাল্টা আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষ মর্টার ও কামান মারতে থাকে।

... ২৯শে মার্চ ভোরে ভাইগর বিওপিতে অবস্থানরত একজন পাঞ্জাবী ইপিআর হাবিলদার ও একজন নায়েককে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই দুইজনকে খতম করে আমি রুধরানী বিওপিতে চলে যাই। সেখানে অবস্থানরত একজন পাঞ্জাবী হাবিলদার ও একজন সিপাইকে জিন্দা বন্দী করি। এরপর আমি রাণীনগর প্লাটুন হেডকোয়ার্টারে চলে আসি। এখানে একজন পাঞ্জাবী ল্যান্স নায়েককে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং একজন সিপাইকে জিন্দা বন্দী করে তাকে পাবলিকের হাতে তুলে দিই। পরে জনসাধারণ তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

২৯শে মার্চ উপরোক্ত ঘটনার পর আমি আমার জওয়ানদেরকে একত্রিত করি। ফুলবাড়ী আসার দুই মাইল দূরে থাকতে খবর পাই যে পাঞ্জাবী সৈন্যরা দিনাজপুর থেকে ইপিআর-এর হাতে মার খেয়ে পার্বতীপুর যাবার জন্য ফুলবাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই কথা শোনার পরপরই ভীষণ গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাই। খবর নিয়ে জানতে পারি যে ফুলবাড়ী থেকে ইপিআর-রা পাকবাহিনীর গতিরোধ করেছে। এই খবর পাবার পর খুব তাড়াতাড়ি আমি আমার জওয়ানদেরকে নিয়ে ফুলবাড়ী যাবার পথে হাসপাতালের কাছে রোড ব্লক করলাম। আমরা পজিশন নেবার পর পরই পাঞ্জাবীরা অবস্থা বেগতিক দেখে পিছু হটতে আরম্ভ করে এবং কিছু সৈন্য গাড়ী ফেলে কোণাকুণি মাঠের মধ্য দিয়ে পার্বতীপুরের দিকে অগ্রসর হয়। আমরা তাদের পিছু নিই এবং আক্রমণ চালাই। এই যুদ্ধে ফুলবাড়ী বাজারের মোড়ে ৭ জন খান সেনার লাশ পাওয়া যায়। একজন সিগন্যালম্যানকে আহত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এর সঙ্গে ২টা চাইনিজ মেশিনগান ও ৫টা রাইফেল আমরা হস্তগত করি। এই সময় ১টা জীপ ও ২টা ডজ গাড়ী আমাদের হাতে আসে।"

তৎকালীন ক্যাপ্টেন (ব্রিগেডিয়ার) গিয়াসউদ্দীন চৌধুরী বলেছেন, "২৭শে মার্চ পর্যন্ত আমাদের প্রস্তুতি চলে এবং রাজশাহী সেক্টরের নওগাঁ এবং নবাবগঞ্জের সমস্ত ইপিআরকে এক জায়গায় নিজ নিজ হেডকোয়ার্টারে একত্রিত করা হয়। ... ২৮শে মার্চ বিকেলে আমি পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার লোকজন নিয়ে বগুড়ায় পৌছে গেলাম।

... পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৯/৩০শে মার্চ রাতে একটা এ্যামবুশ পার্টি পাঠালাম। এতে ছিল নওগাঁ থেকে আসা কয়েকজন ছাত্র ও ইপিআর ও পুলিশের লোকজন। তিনখানা ৩ টনী গাড়ীসহ সোনাবাহিনীর কয়েকজন কমপক্ষে এক প্লাটুন পেট্রলিংয়ে বের হয় এবং রাস্তার মধ্যে আমাদের লোকজন তাদেরকে এ্যামবুশ করে। তিনটা গাড়ী বিধ্বস্ত হয়। তিনটা অয়ারলেস সেট দখল করা হয়, এবং ২৩ জন নিহত হয়। বাকি লোক ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় রংপুরের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এই এ্যামবুশে আমাদের সৈনিকদের মনোবল অনেক বৃদ্ধি পায়।"

২৭শে মার্চ দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট রাজশাহী পুলিশ লাইনের সদস্যগণকে আত্মসমর্পণ করতে বলে অন্যথায় দখলদাররা পুলিশ লাইনের উপর আক্রমণ চালাবে

Scanned by CamScanner

বলে। কিন্তু পুলিশ সদস্যগণ আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানালে দখলদাররা ব্যাপক গুলীবর্ষণ করে। পুলিশও পাল্টা গুলী চালায়।

২৭শে মার্চ বিকেলে কারফিউ (সান্ধ্যআইন) ভঙ্গ করে হাজার হাজার জনতা মৌলভীবাজারের দিকে আসতে থাকে। দখলদার পাকিস্তানী বাহিনী জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। কারফিউ ভঙ্গের মিছিলে রোদন মিয়া, ছাওমনা ঠাকুর, তারা মিয়া ও অজ্ঞাতনামা ৫ জন শ্রমিক নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। বহু লোককে সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয়।

বগুড়ায় সশস্ত্র প্রতিরোধের সূচনার বর্ণনায় জনাব গাজীউল হক বলেছেন, ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার সময় এমদাদুল হকের নিকট থেকে খবর পেয়ে আধো আলো আধো অন্ধকারে বগুড়া কোতওয়ালী থানায় পৌছলে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসার মকবুল সাহেব জানালেন, অয়ারলেসে খবর এসেছে পাকসেনারা রাজারবাগ এবং পীলখানা আক্রমণ করেছে। রাজারবাগ এবং পীলখানায় প্রতিরোধ চলছে। এদিকে রংপুর থেকে পাকিস্তানী সৈন্য বগুড়ার দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি বলেছেন, "আমি নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলাম না। কোন রাজনৈতিক দলের নেতাও নই। ... ডাঃ জাহিদুর রহমানের অবস্থাও আমার চাইতে বিশেষ সুবিধের নয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি সম্পূর্ণ নতুন। '৭০ সালেই নির্বাচনের আগে সক্রিয় রাজনীতিতে এসেছেন এবং পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তবুও কর্তব্য সম্বন্ধে যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন, বললেন ঃ "এখন সকলকে ডেকে সিদ্ধান্ত নেবার সময় নেই। প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। সুতরাং আপনাকেই সিদ্ধান্ত দিতে হবে।

... ২৬শে মার্চের সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ পাক সেনা সুবিল পার হয়ে বগুড়া শহরে ঢুকলো। সুবিল পার হবার আগে মাটিডালি, বৃন্দাবনপাড়া এবং ফুলবাড়ী গ্রামের কিছু কিছু বাড়ী তারা আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিলো। শহরে ঢুকবার পর পাক সেনাদল রাস্তার দু'পাশ দিয়ে দুটো লাইনে এগুতে শুরু করল। সুবিল (করতোয়ার একটি খাল) পার হবার পর কোন প্রতিরোধ না পেয়ে বেশ নিশ্চিন্তেই তারা এগুচ্ছিলো। রাস্তা জনশূন্য, কোন বাধা নেই। কিন্তু কালীতলাহাট পার হবার পরপরই দেয়ালের আড়াল থেকে তপনের হাতের বন্দুক আচমকা আগুন ঝরালো। অর্থাৎ নিশানা। লুটিয়ে পড়লো একজন পাকসৈন্য।"

জনাব গাজীউল হক বলেছেন, "২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় বাদুড়তলার একটি বাড়ীতে যুদ্ধ পরামর্শ সভা বসলো। আলোচনা শেষে জনাব মোখলেসুর রহমানের প্রস্তাবক্রমে পাঁচ সদস্যের একটি হাই কমান্ড গঠন করা হলো ঃ

(১) গাজীউল হক (অদলীয়), সর্বাধিনায়ক, (যুদ্ধের দায়িত্ব)
(২) ডাঃ জাহিদুর রহমান (আওয়ামী লীগ), (খাদ্য এবং চিকিৎসার দায়িত্ব)
(৩) জনাব মাহমুদ হাসান খান (আওয়ামী লীগ), প্রশাসন
(৪) জনাব মোখলেসুর রহমান (মোজাফফর ন্যাপ), যোগাযোগ
(৫) জনাব আব্দুল লতিফ (কম্যুনিস্ট পার্টি), প্রচার। ২৬শে মার্চ রাতেই আমরা সুবিলের দক্ষিণ পাড়ে ঘাঁটি স্থাপন করলাম। ২৭শে মার্চ সকাল আটটা। সুবিলের উত্তর পাড় থেকে পাকসেনারা গুলী বর্ষণ শুরু করে। পাল্টা জবাব দেয় আমাদের ছেলেরা।" এভাবেই জনতা-পুলিশ সমন্বয়ে শুরু হয় প্রতিরোধ। পরে যোগ দিয়েছিল ইপিআর।

'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' গ্রন্থের 'পাবনার মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক অংশে বলা হয়েছে, ইয়াহিয়ার জঙ্গী বাহিনী ২৫শে মার্চ তারিখে পাবনা শহরে এসে ঢুকে পড়ল। সৈন্যরা শহরে এসে

Scanned by CamScanner

ট্রেজারী দখল করে নিল। তাছাড়া ২৭ জন সৈন্য টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কেন্দ্র দখল করে করল। হামলাকারী সৈন্যরা শহরে এসেই আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এম,এল,এ আমিনুদ্দীন সাহেব, ভাসানীপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ডাক্তার অমলেন্দু দাশী এবং আরও কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করল। যারা ওদের হাতে ধরা পড়ল, শেষ পর্যন্ত তাদের সবাইকে ওদের গুলির শিকার হয়ে মরতে হয়েছিল। এর কয়েকদিন আগেই শহরের ডি,সি, ও এস,পি স্থির করেছিলেন যে, শহর আক্রান্ত হোলে তাঁরা প্রতিরোধ দেবেন। তাঁদের কাছ থেকে প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়ে পুলিশ ব্যারাকের ১০০ জন সশস্ত্র পুলিশও মনে মনে প্রতিরোধের জন্য তৈরী হয়েছিল।

২৭শে মার্চ তারিখে সৈন্যরা পুলিশ ব্যারাকে যায়। এবং পুলিশের অস্ত্রাগার তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। পুলিশরা এতে অসামর্থ্য জানায় এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, ডি,সি,তাদের অস্ত্রাগার সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছেন। এই নিয়ে দু'পক্ষে প্রথমে বাক-বিতন্ডা এবং পরে গুলিবর্ষণ চলে। এই যুদ্ধে তিনজন সৈন্য মারা যায়। রাত যখন সাড়ে চারটা তখন ওরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে অতর্কিতে পুলিশ ব্যারাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্যরা যে আবার ফিরে এসে আক্রমণ করবে সে বিষয়ে তাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। ব্যারাক ছেড়ে নিকটবর্তী বাড়িগুলির ছাদে এবং পথের মোড়ে মোড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আড়াল নিয়ে হামলাকারী শত্রুদের জন্য বাঘের মত ওত পেতে বসে ছিল। জেলখানার পুলিশ ভাইয়েরাও তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। রাত সাড়ে চারটার সময় দু'পক্ষে সংঘর্ষ ঘটল। সৈন্যদের পরিবর্তে পুলিশরাই প্রথম আক্রমণ করল। এইভাবে অতর্কিতে চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে ইয়াহিয়ার সুশিক্ষিত সৈন্যরা হতভম্ব হয়ে গেল। এই সংঘর্ষে ২১ জন সৈন্য নিহত হবার পর বাকী সৈন্যরা ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণ নিয়ে পালাল। পুলিশের মধ্যে একজনও মারা যায় নি।

এভাবেই শুরু হয় পাবনার সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। ২৮শে মার্চ পুলিশ-জনতা সম্মিলিতভাবে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করেছিল যুদ্ধ করে এবং দখলদার বাহিনীর ২৭ জনই মারা যায়।

সিরাজগঞ্জ এলাকায় সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরুর বর্ণনায় জনাব মোজাফফর হোসেন বলেন, "২৫শে মার্চের ঘটনা। রাত ১টার দিকে মহকুমা প্রশাসক জনাব শামসুদ্দীন সিএসপি (শহীদ) আমাকে সংগ্রাম পরিষদ অফিসে জানালেন, পুলিশ, আনসার বাহিনীর যত অস্ত্র আছে সব তোমাদের দেব প্রতিরোধের জন্য।

২৬শে মার্চ বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। ছুটি ভোগরত পাক-বাহিনীর সেনা, আনসার, পুলিশ, ছাত্র, সাধারণ লোক, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক সব মিলে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় রাইফেল, বন্দুক, টু-টুবোর রাইফেল নিয়ে যুদ্ধে নামা হয়।

বগুড়ায় আড়িয়ার বাজারে আগে থেকেই পাক ঘাঁটি ছিল। মার্চ মাসের শেষের দিকে সাধারণ লোক সামান্য অস্ত্র নিয়ে পাক-বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৩০ জনের মত পাকসেনা ছিল। আকাশ থেকে বিমান আক্রমণ চালায় পাকবাহিনী। ওদের গুলি এসে লাগে গোলার ডাম্পে তাতে আগুন লেগে বিমান বাহিনীর গুলীতেই বেশ পাকসেনা খতম হয়। তারপর জনসাধারণ ঢুকে পড়ে অনেককে আত্মসমর্পণ করায়, অনেককে হত্যা করে পিটিয়ে।

আমি এবং এসডিও শামসুদ্দীন সাহেব এদিন বগুড়া গিয়ে সেখানকার মুক্তিবাহিনীর মধ্যে সমঝোতা করে কিছু অস্ত্র এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ২০ জন এবং ইপিআর-এর ৩০ জন নিয়ে

Scanned by CamScanner

সিরাজগঞ্জ চলে আসি। তখন আমাদের কাছে ছিল চাইনিজ রাইফেল ৭টি, মার্ক-৪৬টি, রাইফেল ৫/৬ টি।"

খুলনায় প্রতিরোধ শুরুর প্রসঙ্গে প্রাক্তন এম,পি,এ মোমিন উদ্দিন আহমেদ বলেন, "১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ তারিখে বয়রা গ্রামে তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা ই-পি-আর-রা ৩০৩ রাইফেল ও শর্টগান নিয়ে পাক-ফৌজের বিরুদ্ধে এক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধ হয় যশোর রোডে। যুদ্ধে ২টি ট্রাক ধ্বংস হয় এবং পাক-সৈন্যরা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

এর পরের সংঘর্ষ হয় দৌলতপুরের মিনাক্ষী সিনেমা হলের সম্মুখে ২৯শে মার্চ তারিখে। রাস্তার দু'পাশ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাক ফৌজের ওপর আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা তখন ট্রাকে করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। আক্রান্ত পাকসেনারা রিকয়েললেস গান দিয়ে রশীদ বিল্ডিং ধ্বংস করে। সে সময়ে ঐ ভবনের ৩ জন লোক নিহত হয়।"

২৮ মার্চ ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে। এ প্রসঙ্গে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎকালীন সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর কে,এম, সফিউল্লাহ বলেছেন, "২৭শে মার্চ সকাল পর্যন্ত ঢাকাতে কি ঘটেছিল তার কোন খবর পাইনি। বিকেলের দিকে আমাদের একজন ড্রাইভার ঢাকা থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। সে খবর দিল যে ঢাকাতে বেশ গোলাগুলি হয়েছে এবং বেশ কিছু লোক মারা গিয়েছে। সে আরো বললো যে বাঙালী সৈনিকদের বেঁধে নিয়ে কোথাও নিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। সে ব্যাটালিয়নে পৌছার সাথে সাথে এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তখন আমি ব্যাটালিয়ান কমান্ডারকে বলি যে, ঢাকা থেকে আপনি কোন নির্দেশ পাচ্ছেন না। ব্যাটালিয়নের পরিস্থিতিও খারাপ। আমরা যদি কোথাও কনসেনট্রেট না হই তা হলে পরিস্থিতি হয়ত আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। আমি তাকে আবার বললাম যে, আমরা আমাদের সৈনিকদের নিয়ে টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহে চলে যাই। তিনি উত্তরে বললেন যে, আমার ছেলে-পিলে আছে। বেলা প্রায় দু'টোর দিকে ঢাকা থেকে ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবার ব্যাটালিয়ন কমান্ডার-এর সাথে অয়ারলেসে কথা বললেন এবং বললেন "Our troops are facing some difficulties at Tongi. Send a company to do some shooting" ... আমি তখন বললাম, যে এখন এই কোম্পানীকে না পাঠিয়ে টঙ্গীর খবর নিন। ... বিকেলে টঙ্গী থেকে ফিরে আসার পর ঐ অফিসার কমান্ডিং অফিসারকে খবর দেয় সে সেখানে তেমন কিছু হয়নি।" টঙ্গীতে অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের সঙ্গে যে ভাল ব্যবহার করেনি তাও তারা জানায়। এ অবস্থায় মেজর শফিউল্লাহ ব্যাটালিয়ন কমান্ডারকে এ্যাকশন নিতে বলেন, অন্যথায় তিনি নিজেই কিছু এ্যাকশন নেবেন বলেন।

মেজর শফিউল্লাহ বলেন, "আমি উনাকে একটু চিন্তা করে দেখতে বললাম এবং বললাম আমি সমস্ত অফিসার জেসিও'দের এ ব্যাপারে ব্রিফ করছি। যে পাঞ্জাবী অফিসার টঙ্গীতে খবর নিতে গিয়েছিল সে গাজীপুর ফিরে না গিয়ে জয়দেবপুরে চলে আসে। জয়দেবপুরে আরো দুইজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার এবং কিছুসংখ্যক পাকিস্থানী সৈন্য ছিল। তাদের মধ্যে শলাপরামর্শ চলছিল। আমি এটা লক্ষ্য করেছিলাম। তাই ঐ অফিসারকে রীতিমত অর্ডার করে গাজীপুর পাঠিয়ে দিই।

... ২৮মার্চ সকালে ময়মনসিংহ থেকে মেজর নুরুল ইসলাম আমাকে খবর পাঠায় যে ২৭/২৮শে মার্চ রাতে তার সেনাবাহিনীর উপর পাকিস্তানী ইপিআররা হামলা চালিয়েছে। লড়াই এখনো চলছে। ... ময়মনসিংহে যে আমাদের সৈন্যরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এ কথা আমরা কাউকে বলিনি। আমাদের একথা গোপন রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে জয়দেবপুর

Scanned by CamScanner

থেকে সবাইকে এক সাথে নিয়ে যাওয়া এবং পথিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ও সৈনিকদের নিরস্ত্র করা। এ ব্যাপারে আমরা এক পরিকল্পনা তৈরী করি। রাতে যাবার পরিকল্পনা এ জন্য করা হয়েছিল যে গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুরে আমাদের যে সব সৈনিকরা আছে তাদেরকেও যদি সাথে নিয়ে না যাই তাহলে তারা হয়ত আটকা পড়বে। ... আরো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল যে, আমি সারপ্লাস অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং কিছুসংখ্যক সৈনিক নিয়ে সকাল দশটার দিকে ময়মনসিংহে যাত্রা করব। এবং লেঃ কর্নেল রকিব বাকী লোকদের নিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রওনা হবেন। ... গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুরে লোক পাঠিয়ে ওদেরকে ঐ সময়ের মধ্যে বের হবার খবর দেওয়া হয়েছিল।

২৮শে মার্চ সকাল দশটায় সমস্ত উদ্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং যানবাহন নিয়ে আমি ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রা করি। যাবার সময় লেঃ কর্নেল রকিব এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ব্যাটালিয়নের বাকী লোকদের নিয়ে তিনি সন্ধ্যার সময় রওনা হবেন।

... কিছুক্ষণ পর আমরা টাঙ্গাইল শহরে প্রবেশ করি। সেখানে ব্যান্ডপার্টি সহ এক উৎফুল্ল জনতা আমাদের অভ্যর্থনা করে। ... টাঙ্গাইল যাবার পর কে একজন আমাকে বললেন যে মেজর জিয়া নামে একজন চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এ কথা শুনে আমার সাহস দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বেড়ে যায়। কারণ, তখন আমার মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এ কাজে আমি একা নই।

... টাঙ্গাইলে আমাদের এক কোম্পানী সৈন্য ছিল, তার কমান্ডার ছিল একজন পাঞ্জাবী অফিসার। টাঙ্গাইল কোম্পানী হেডকোয়ার্টারে পৌছার সাথে সাথেই কোম্পানীর জেসিও আমাকে বলে যে, সে গত রাতে কোম্পানী কমান্ডারকে নিরস্ত্র করে রেখেছে।

... যেহেতু আমি ময়মনসিংহ যাবার জন্য তাড়াহুড়াতে ছিলাম সেহেতু বেলা দুটোর দিকে আমি ময়মনসিংহ অভিমুখে রওয়ানা হই। তাদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে আসি যে, জয়দেবপুর থেকে লোক না আসার আগে তারা যেন টাঙ্গাইল ত্যাগ না করে।

... রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা খুলে অগ্রসর হতে আমার বেশ সময় লেগে যায় এবং রাত প্রায় তিনটায় আমি মুক্তাগাছা পৌছি। মুক্তগাছায়ও টাঙ্গাইলের মত কিছু লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। তারা আমাদের উপর গুলি করার আগেই আমরা তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হই আমরা তাদের শত্রু নই। আমরা বাংলাদেশের সৈনিক। তখন বহু লোক বেরিয়ে আসে এবং রাস্তা দেখিয়ে দেয়। ঐ রাত আমরা মুক্তাগাছা কলেজে কাটাই। আমাদের সাথে খাবার ছিল না। জনসাধারণ আমাদের খাবার ব্যবস্থা করে।

ভোর হবার আগেই জয়দেবপুর এবং টাঙ্গাইলের লোকজন মুক্তাগাছায় পৌছে। মেজর মইন (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) আমাকে বলে যে সবাই এসে গেছে। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম ব্যাটালিয়ন কমান্ডার কোথায়। উত্তরে বলল সে আসে নাই।

... ২৯শে মার্চ সকালে মুক্তাগাছা থেকে ময়মনসিংহ যাত্রা করি। ...২৯শে মার্চ বিকেলে (ময়মনসিংহ) জেলা এডমিনিস্ট্রেশন-এর সমস্ত অফিসারবৃন্দ, জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত এম-এন-এ এবং এম-পি-এ'দেরকে নিয়ে এক বৈঠক করি। সেই বৈঠকে কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে তার পরিকল্পনা নিই।

Scanned by CamScanner

... ৩০শে মার্চ সকাল পর্যন্ত ইপিআর, পুলিশ, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং কিছু আংশিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেসামরিক লোকদের নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তুলি। যার লোকসংখ্যা ছিল তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার।"

যশোর-এ প্রতিরোধ শুরুর একটি বিবরণ দিয়েছেন জনাব আসাদুজ্জামান আসাদ তাঁর "মুক্তিযুদ্ধে যশোর" প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন, "২৫ মার্চ গভীর রাতে সেনাবাহিনীর একটি বিশাল বহর শহরের দিকে অগ্রসর হয়। শহরের উপকণ্ঠে খয়েরতলা ও আরিফপুরে মুক্তিবাহিনী প্রথম তাদের প্রতিরোধ করে। অসম সাহসী কিন্তু অপ্রতুল অস্ত্রে সজ্জিত মুক্তিযোদ্ধারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী হানাদার দস্যুবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পাকসেনারা বেপরোয়াভাবে গুলি ছুড়তে ছুড়তে শহরে প্রবেশ করে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বাড়ি এবং কলেজ ছাত্রাবাসগুলোতে প্রথম আঘাত হানে। শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করে ঘরে ঘরে তল্লাশি অভিযান চালায়। প্রথম রাতেই পাকবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন জনাব মশিউর রহমান, মইনুদ্দিন মিয়াজি, সুধীর ঘোষসহ অনেকে। ২৮ মার্চ জনতা পুনরায় আরেকটি প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেয়। এই যুদ্ধে সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও ইপিআর বাহিনী থেকে বেরিয়ে আসা সৈনিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

... ৩১ মার্চ যশোর সেনানিবাস দখলের জন্য নড়াইল থেকে প্রায় ২৫ হাজার জনতার এক বিশাল জঙ্গী মিছিল যশোর আসে। দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত এই বিশাল গণবাহিনী প্রথমেই শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ইপিআর ক্যাম্প আক্রমণ করে এবং ইপিআর বাহিনী পরাজিত হয়। এরপর তারা মুখোমুখি হয় ঝুমঝুমপুরস্থ বিহারীদের। এই ক্যাম্পে বসবাসরত কয়েক হাজার বিহারী সরাসরি মিছিলের মুখোমুখি হলে তা যুদ্ধের আকার ধারণ করে। সেনানিবাসমুখী জনসমুদ্র দ্বিতীয় দফায় জয়ী হয়। এখানে উভয় পক্ষের অসংখ্য মানুষ নিহত হয়। এরপর তৃতীয় আক্রমণ পরিচালিত হয় যশোর কারাগারে। এখানে জেলখানা ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্ত করা হয়। চতুর্থ পর্যায়ে জনতার ক্যান্টনমেন্ট প্রতিরোধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রবল প্রতিরোধ গড়ে জনতা ২ এপ্রিল পর্যন্ত টিকে থাকে। কিন্তু ৩ তারিখের মধ্যে সকল প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙ্গে পড়ে।"

২৮ মার্চ ঢাকায় সকাল ৭টা থেকে বৈকাল ৪টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন শিথিল করা হয়। দিনগত রাতে দখলদার বাহিনী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি তোপ দেগে গুড়িয়ে দেয়।

১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দীন আহমদ ২৫শে মার্চ যশোর ক্যান্টনমেন্টের বাইরে কোটচাঁদপুর ও জগদীশপুর এলাকায় কালেক্টিভ ট্রেনিংয়ে ছিলেন। তিনি বলেছেন, "২৯মে মার্চ ১২ টার সময় অয়ারলেস-এর মাধ্যমে পাকিস্তানী ১০৭ নং ব্রিগেডের বিগ্রেডিয়ার অবদুর রহিম দুররানী আমাদেরকে যশোরে পৌছতে বলায় আমরা সঙ্গে সঙ্গে জগদীশপুর থেকে যশোরের অভিমুখে রওনা দিই। যশোর ক্যান্টনমেন্টে রাত ১২টায় পৌছি। যদিও আমাদের ব্যাটালিয়নে মোট ৭৫০/৮০০ সৈন্য সাধারণত থাকে, কিন্তু অনেক সৈন্য ছুটিতে থাকায় আমাদের ব্যাটালিয়নের সৈন্যসংখ্যা তখন ছিল ৪০০ জন। ব্যাটালিয়নের পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার কথা ছিল এবং সে জন্যই প্রায় অর্ধেক ছুটিতে ছিল।

৩০শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে ব্রিগেডিয়ার দুররানী আমাদের ব্যাটালিয়নে যান এবং কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জলিলকে বলেন যে, আমাদের ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করা হলো এবং আমাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে বলেন। তারপর ব্রিগেডিয়ার দুররানী আমাদের ব্যাটালিয়ন অস্ত্রাগারে অস্ত্রশস্ত্র জমা

Scanned by CamScanner

করে চাবিগুলো নিজ হাতে নিয়ে নেন। মুহূর্তের মধ্যে এ খবর আমাদের ব্যাটালিয়নের সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

ব্রিগেডিয়ার দুররানী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতে দিতে অস্ত্রাগারের তালা ভেঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র যার যার হাতে নিয়ে নেয় এবং আমরা চতুর্দিকে আমাদের পজিশন নিই। আমাদের বিদ্রোহের খবর পাওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানী দুই ব্যাটালিয়ন (২৫-বেলুচ রেজিমেন্ট এবং ২২ তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) সৈন্য আমাদেরকে তিন দিক দিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের জোয়ারনা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সাথে তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। এ সময় কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জলিল আমাদের নেতৃত্ব দিতে অস্বীকার করেন এবং অফিসে বসে থাকেন। তখন আমি আমার ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব নিই এবং পাঞ্জাবীদের আক্রমণকে প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিই এবং সেভাবে সৈন্যদের পুনর্গঠিত করি। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেনও আমার সঙ্গে বিদ্রোহে যোগদান করে।

এভাবে সকাল আটটা থেকে বিকেল দুটা পর্যন্ত পাঞ্জাবীরা আমাদের উপর বার বার আক্রমণ করে, কিন্তু প্রত্যেক বারই আমরা তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করি এবং তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে সক্ষম হই। ... যেহেতু পূর্ব পরিকল্পনা নিয়ে পাকিস্তানীরা আমাদের উপর আক্রমণ করে, সেহেতু তাদের সঙ্গে আমরা বেশীক্ষণ যুদ্ধ চালাতে পারব না মনে করে আমি আমার ব্যাটালিয়ন নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদেরকে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়ে আক্রমণ করেছিল। পশ্চিম দিক দিয়ে আক্রমণ না করলেও পশ্চিমের খোলা মাঠে মাঝে মাঝে অবিরাম বৃষ্টির মত গুলি করছিল। আমরা পশ্চিম দিক দিয়েই ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হবার সিদ্ধান্ত নিলাম। পশ্চিম দিক দিয়ে কভারিং ফাইটের সাহায্যে বের হবার সময় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হই এবং চৌগাছায় একত্রিত হই। ...ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হবার সময় আমি আমার কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জলিলকে আমাদের সঙ্গে বিদ্রোহ করার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি মোটেই রাজী হননি।

যশোর ক্যান্টনমেন্টে যুদ্ধের সময় সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেন শহীদ হন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তার সাহসিকতার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে "বীর উত্তম" উপাধিতে ভূষিত করেন। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনোয়ারই প্রথম অফিসার যিনি যুদ্ধে শহীদ হন। তাছাড়া এ যুদ্ধে আমার ৪০ জন সৈন্য শহীদ হন। পাকিস্তানী সৈন্যও প্রায় ৪০ জন নিহত হয়।

চৌগাছায় একত্রিত হবার পর আমরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলি। এসময় আমি একমাত্র অফিসার ছিলাম। দশজন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারসহ আমার সাথে প্রায় ২২৫ জন সৈন্য ছিল।"

ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দীন চৌধুরী রাজশাহীতে মার্চ মাসে যুদ্ধের একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "নওগাঁতে মেজর নজমুল হক সহ আবার পরিকল্পনা শুরু করলাম। এদিকে খবর পাওয়া গেল যে, ইপিআর কোম্পানী রাজশাহীর পথে মর্টার এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাঠানো হয়েছে। সেটা রাজশাহীর নিকটবর্তী আরানী নামক রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ২৫ পাঞ্জাবের এক কোম্পানীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে—২৯/৩০ মার্চ রাতে। তাদের সাথে কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধা এবং গ্রামের লোক যোগ দিয়েছে। এই পাকিস্তানী কোম্পানীটি পাবনা থেকে পশ্চাদপসরণ করে তাদের নিজের ব্যাটালিয়ন-এর দিকে পদব্রজে রাজশাহী আসছিল। কোম্পানীটি সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও হয়ে যায় এবং ইপিআর কোম্পানী তাদের উপর ৩" ইঞ্চি মর্টার-এর গোলাবর্ষণ করতে শুরু

Scanned by CamScanner

করে। শত্রুবাহিনী দিশেহারা হয়ে গোলাগুলি শুরু করে এবং অনেকক্ষণ গোলাগুলী বিনিময় হয়। শেষ রাতের দিকে শত্রুবাহিনীর গোলাবারুদ শেষ হয়ে যায় এবং প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক সেদিক পালাতে শুরু করে। কিন্তু গ্রামের লোক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রায় সবাই ধরা পড়ে এবং তারা গ্রামবাসীদের হাতে নিহত হয়। মেজর আসলাম এবং ক্যাপ্টেন রেজা (উপ-অধিনায়ক) মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দী হয় এবং আরনী স্টেশনের কাছে নিহত হয়।"

মেজর শাকাওয়াত জামিল সে সময়কালে কুমিল্লার সেনানিবাস প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা পরে জানতে পেরেছি যে কুমিল্লা সেনানিবাসে আমাদের যে সমস্ত লোকজন ছিল তারা ২৯শে মার্চ আমাদের সংগ্রামের কথা জানতে পেরেছিল। কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে তারা কোন এ্যাকশন নিতে পারেনি। ৩১শে মার্চ বিকাল চারটার সময় সেনানিবাসে অবস্থিত চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৭০/৮০ জন সৈনিকদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীরা চারিদিক থেকে হামলা করে এবং প্রায় ছয় ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিট লাইন দখল করে। এই যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। চতুর্থ বেঙ্গলের ৮/১০ জন জোয়ান শহীদ হন। এই যুদ্ধে নায়েব সুবেদার এম,এ, সালাম অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

জাঙ্গালিয়াতে যে প্লাটুন ছিল সেটা ২৯শে মার্চ বের হয়ে মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেয় এবং কুমিল্লা-লাকসাম রোড়ে নায়েব সুবেদার এম,এ জলিলের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি সাফল্যজনক এ্যামবুশ করে।"

সিলেটের ইপিআর ল্যান্সনায়ক সোনামিয়া বলেন, "২৫শে মার্চ আমি সিলেটের ১২নং শাখা খাদিমনগরে ছিলাম। আমি ইনটেলিজেন্স ইনচার্জ ছিলাম। ১৮ই মার্চ আমাদের উইং ব্যারাকের ভিতর পাকিস্তানীরা বাংকার করে। ... ২২শে মার্চ আমাদের সম্পূর্ণ হাতিয়ার জমা নিয়ে নেয়। ... ২২ মার্চ তারিখে সকল অবাঙ্গালী ইপিআরকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসা হয়। আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে নিলেও অবাঙ্গালীদের চাইনিজ অস্ত্র ইস্যু করে। পাকিস্তানীরা গোপন বৈঠক করতো। এই অবস্থা দেখে আমরা ডায়রি কার্নে গোপন আলোচনা করি। উপস্থিত ছিল উইং হাবিলদার মেজর ওয়াহিদুল ইসলাম, নায়েক হাফিজুল্লাহ চৌধুরী এবং আমি। আমরা সিলেট ডিসি এবং এসপি'র সাথে যোগাযোগ করি। ৩নং শাখার সাথেও যোগাযোগ করি। সমস্ত বিষয় অবগত করাই। সেক্টরে গিয়ে ক্যাপ্টেন আলাউদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করি।

৩০শে মার্চ সকাল অনুমান ৬টার সময় ১১ পাঞ্জাবী আমাদের উইং ঘিরে ফেলে আক্রমণ করে। আমরা উইং থেকে পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিলাম। আক্রমণে হাবিলদার শরাফত ঘটনাস্থলেই নিহত হন। কোয়ার্টার গার্ড হাবিলদার মজিবুর রহমান শহীদ হন। গোয়াইন ঘাটে ৬০/৭০ জন ইপিআর আশ্রয় নেয়।"

সিপাই শফিক আহমেদ বলেন, "আমি ২৫শে মার্চের পূর্ব থেকেই সেক্টর হেডকোয়ার্টার সিলেটে ছিলাম। ... উল্লেখ্য যে, ভারতীয় বিমান হাইজ্যাকের পর থেকেই সিলেটের খাদিমনগরে একটি রেজিমেন্ট থাকতো। এখানে ৩১ পাঞ্জাব এবং ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একটি কোম্পানী থাকতো।

... ২৬শে মার্চ বিভিন্ন গ্রাম থেকে ঢাল, সড়কি, বল্লম নিয়ে হাজার হাজার জনতা সিলেট শহরে আসতে থাকে। পাক সেনারা তাদের উপর গুলি চালায়, বহু বেসামরিক নিরীহ লোক নিহত হয়। শহরে তখন কারফিউ চলছিল। ২৬ তারিখে যে সকল ইপিআর অফিসে অনুপস্থিত ছিল

Scanned by CamScanner

তাদেরকে কর্তৃপক্ষ ডেকে আনতে বললেন। ২৬শে মার্চ আমাদেরকে একটি করে লাঠি দেয় আকস্মিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

২৮শে মার্চ কিছু বাঙ্গালী ইপিআর অফিসে আসে। আমরা ঐ দিন অফিসে আসিনি। পরে আমাদের গাড়ীতে করে নিয়ে আসা হয়। ২৮ তারিখেই আলমারীর এবং অন্যান্য চাবি নিয়ে নেয়া হয় এবং বলা হয় 'তোমরা অফিসে এসো না, দরকার হলে আসতে বলবো'। ক্যাপ্টেন নসির নাজির (পাঞ্জাবী) এটা বলেন।

... উল্লেখ্য যে, ২৭শে মার্চ ক্যাপ্টেন গোলাম রসুল (১২নং শাখার সহকারী উইং কমান্ডার) বাঙ্গালী-পাঞ্জাবী মিশিয়ে একটি প্লাটুন শমসেরনগর বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে যায়। এই প্লাটুনের অগ্রবর্তী দলটি ১০/১২ জন ডজ গাড়ীতে করে শমসেরনগর ডাকবাংলোতে আসে। এই দলের ড্রাইভার অগ্রণী হয়ে বলে, দ্বিতীয় দলে ক্যাপ্টেন সাহেব আসলে আমাদের বন্দী করতে পারে। অতএব, এখনই ক্যাপ্টেনকে খতম করে দিই। সাথে সাথে বাঙ্গালী ইপিআররা ডাকবাংলোর ছাদের উপর উঠে যায় এবং লাইট মেশিনগান নিয়ে পজিশন নেয়। সাথের দু'জন পাঞ্জাবী সিপাই পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যাপ্টেন গোলাম রসুল দ্বিতীয় গাড়ীতে আসে। ইপিআর দলটি উপর থেকে ফায়ার ওপেন করে। সাথে সাথে ক্যাপ্টেনসহ প্রায় সবাই নিহত হয়। ২/১ জন আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়।"

খুলনার প্রতিরোধ যুদ্ধ প্রসঙ্গে 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' যে বর্ণনা দিয়েছে তাতে আছে ঃ

"২৫শে মার্চ। পরিস্থিতি গুরুতর, সেটা সবাই বুঝতে পারছে। ... খুলনার রাজনৈতিক নেতারা অবস্থাটা বুঝবার জন্য ঢাকার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করছিলেন। কিন্তু রাত্রি আটটার সময় ফোনের যোগাযোগ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। ... রাত্রি ১২ টার সময় ... সরকারী ঘোষণাকারীরা সারা শহরে ঘুরে ঘুরে মাইক-যোগে প্রচার করে ফিরছে যে, আগামী কাল ২৬শে মার্চ সকাল পাঁচটা থেকে সারা শহরে ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টা পর্যন্ত কারফিউ জারী করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে যদি কেউ ঘর ছেড়ে পথে বেরোয় তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হবে।

... ইতিমধ্যে সবার অগোচরে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। সেটা ঘটেছে কারফিউ জারী করার বেশ কিছু আগেই। ... আজই রাত্রিতে ইপিআর বাহিনীর জনৈক পাঞ্জাবী অফিসার তাঁর কয়েকটি প্রিয় পাত্রকে এই বলে হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন যে ইপিআর-এর লোকদের সামনে এক ভীষণ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও আর দেরী না করে এখনি পালিয়ে যাও। স্থানীয় ইপিআর বাহিনীতে প্রায় তিনশত জন লোক। খবরটা তাদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে ইপিআর লাইন খালি হয়ে গেল। তারা রাতের অন্ধকারে সেই স্থান ত্যাগ করে সু-শৃঙ্খল ভাবে দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নিল। অপরদিকে কারফিউ জারী হবার পর অবস্থা সঙ্গীন বুঝতে পেরে শহরের পুলিশরাও তাদের ব্যারাক ছেড়ে পালিয়েছে।

... ইপিআর আর পুলিশ মিলে এই বাহিনীতে শ'তিনেক লোক ছিল, তাছাড়া তাদের সঙ্গে কিছু-সংখ্যক সাধারণ লোকও ছিল। ... বেশ কিছুদূর এগিয়ে আসার পর তেলিগাতি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে শত্রুপক্ষের সঙ্গে প্রথম মোকাবিলা করল।

কলেজের কাছে পঁচিশ/ত্রিশ জন পাক-সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল। সে কথাটা এদের অজানা ছিল না। তারা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এভাবে আচম্‌কা আক্রান্ত হয়ে পাকসৈন্যদের সেই ছোট দলটি কিছুটা দিশাহারা হয়ে

Scanned by CamScanner

পড়েছিল। কিছুক্ষণের গুলিবর্ষণের পর তারা কুড়িটি মৃতদেহ ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। সেই সংঘর্ষে এ পক্ষের মাত্র দু'জন পুলিশ মারা গিয়েছিল।

এরা পালিয়ে যাওয়ার ফলে একটা ট্রাক ও গোটা কয়েক জীপ মুক্তিবাহিনীর দখলে এসে গেল।

... মুক্তিবাহিনীকে বাধা দেয়ার জন্য প্রায় আড়াই শ' পাক-সৈন্য দৌলতপুরস্থ 'বৈকালী' সিনেমার কাছে অপেক্ষা করছিল। ... এবার দু'পক্ষের মধ্যে দ্বিতীয় বারের মত সংঘর্ষ ঘটল। ... হঠাৎ এভাবে দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পাক-সৈন্যরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাঁদের ঘাঁটি ছেড়ে দ্রুত পশ্চাৎপসরণ করল। এই সংঘর্ষের ফলে তাদের বেশ কিছু লোক মারা গিয়েছিল।

... যশোরের সৈন্যদল এসে পৌছবার পর পাক-সৈন্যবাহিনীর শক্তি বহু পরিমাণে বেড়ে গেল। ... যখন দু'পক্ষের প্রবল হানাহানি চলছে, তখন হঠাৎ দেখা গেল পাক-সৈন্যবাহিনী একটু পেছনে চলে গিয়ে শ্বেত পতাকা তুলে ধরেছে। তার মানে এরা আত্মসমর্পণ করতে চাইছে। মুক্তিবাহিনীর লোকেরা জয়োল্লাসে মেতে উঠল। ... ওরা অপ্রস্তুত অবস্থায় কাছে এগিয়ে আসতেই জঙ্গীবাহিনীর মেশিনগানগুলি তাদের লক্ষ্য করে একসঙ্গে গর্জে উঠল। ফলে মুক্তিবাহিনীর বহু লোক হতাহত হল। ওদের মর্টারগুলি একসঙ্গে অনর্গল অগ্নি-গোলক উদ্গীরণ করে চলেছে। এর প্রত্যুত্তর দেবার মত উপযুক্ত অস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হাতে ছিল না। সেই অগ্নিবর্ষণের ফলে তারা পতঙ্গের মত পুড়ে ছাই হতে লাগল। এরপর তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আর উপায় রইল না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল।

... ২৮শে মার্চের যুদ্ধের পর মুক্তিবাহিনী যোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাই বলে তারা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়নি। শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ করবার জন্য তারা বাগেরহাটে গিয়ে মিলিত হলো। বাগেরহাটে সামরিক অফিসার মেজর জলিল ইপিআর ও পুলিশের লোকদের নিয়ে এক মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। খুলনা থেকে যাঁরা বাগেরহাট গিয়েছিল তারা মেজর জলিলের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল। ফলে এদের সংখ্যা দাঁড়াল সাত শ'। মেজর জলির কোন্ দিকে নতুন করে আক্রমণ করা যায় সেই পরিকল্পনা রচনা করে চলেছেন।"

তৎকালীন ক্যাপ্টেন এম,এস,এ ভূঁইয়া চট্টগ্রামের কুমিরার লড়াইয়ের বর্ণনায় বলেছেন, "ইচ্ছা ছিল সন্ধ্যার আগেই ক্যান্টনমেন্ট দখল করব; কিন্তু শত্রুর শক্তি বৃদ্ধির জন্যে কুমিল্লা থেকে যে ২৪নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এগিয়ে আসছে, তাকে বাধা দেওয়াই প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো। ...

(২৬শে মার্চ) আমি আমার ক্ষুদ্র দলের ১০২ জন যোদ্ধাকে ৪টি ট্রাকে উঠালাম এবং বাকি ট্রাকটিতে কয়েকটি গুলির বাক্স উঠিয়ে দিলাম। আমি নিজে একটি মোটর সাইকেলে চড়ে সবার আগে চললাম। ... সন্ধ্যা তখন ৬টা আমরা কুমিরায় পৌছে গেলাম। শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য স্থানটি খুবই উপযুক্ত বিবেচিত হল। পথের ডাইনে পাহাড় এবং বামদিকে আধ মাইল দূরে সমুদ্র। শত্রুর ডানে এবং বামে প্রতিবন্ধকতা আছে এবং শত্রুকে এগুতে হলে পাকা রাস্তা দিয়েই আসতে হবে। তাই সেখানেই পজিশন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

... কুমিরা পৌছেই মোটর সাইকেলযোগে একটি লোককে আমরা পাঠিয়েছিলাম শত্রুর অগ্রগতি সম্পর্কে খবর নিতে। এরই মধ্যে সে খবর নিয়ে এসেছে যে শত্রু আমাদের অবস্থানের আর বেশী দূরে নেই, মাত্র চার-পাঁচ মাইল দূরে। তবে তারা ধীরে ধীরে গাড়ী চালিয়ে আসছে।

Scanned by CamScanner

... আমাদের অবস্থানের ৭০/৮০ গজ দূরে বড় একটি গাছ ছিল। জনসাধারণের সাহায্যে গাছের মোটা ডালটা কেটে রাস্তার ঠিক মাঝখানে ফেলা হলো। গাছের ডাল দিয়ে আমাদের সুন্দর একটা ব্যারিকেড সৃষ্টি হয়ে গেল। জনসাধারণ রাস্তার আশপাশ থেকে কিছু ইট এনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখল। এত অল্প সময়ে জনসাধারণ কিভাবে গাছের ঐ মোটা ডালটা কেটে ফেলল এবং ইট সংগ্রহ করে ব্যারিকেড সৃস্টি করলো আজ তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। সৈন্যদের জানিয়ে দেওয়া হলো যে শত্রুসৈন্য যখন ব্যারিকেড সাফ করার জন্য গাড়ী থেকে নামবে এবং সাফ করার জন্য একত্র জমা হবে তখন সকলে একযোগে শত্রুর উপর গুলি ছোঁড়া শুরু করবে। বিশেষ করে ভারী মেশিনগান দ্বারা অবিরাম গুলি ছুঁড়বে।

... সন্ধ্যা তখন সোয়া সাতটা। শত্রুরা যখন ব্যারিকেড সাফ করতে ব্যস্ত এমনি সময়ে আমাদের ডানদিকের ভারী মেশিনগানটি গর্জে উঠল। শুরু হল শত্রু নিধন পালা। চারদিক থেকে কেবল গুলির আওয়াজই শোনা যেতে লাগল। ভারী মেশিনগানটি থেকে তখন মাঝে মাঝে ট্রেসার রাউন্ড বের হচ্ছে। উহ্! সে কি দৃশ্য! শত্রুকে এত কাছাকাছি অতর্কিত অবস্থায় পেয়ে আমার মন খুশিতে নেচে উঠল। ... আমাদের আকস্মিক আক্রমণে তারা তখন হতচকিত। তাদের সামনের সৈন্যগুলির অনেকেই আমাদের গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ... যারা দিশে হারা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছিল তাদের অনেকেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুদের পিছনের সৈন্যরা এ অবস্থা সামলে নিয়ে মেশিনগান, মর্টার এবং অর্টিলারী থেকে অবিশ্রাম গুলিবর্ষণ শুরু করল। এবার উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই লেগে গেল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও শত্রুরা আমাদের ব্যূহ ভেদ করতে পারল না। তাদের সৈন্য-বোঝাই তিনটি ট্রাকে আগুন ধরে গেল। ... প্রায় দু'ঘন্টা প্রাণপণ লড়ে তারা শেষ পর্যন্ত দুই ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র ফেলে রণে ভঙ্গ দিল। ... প্রথম দিনের লড়াইয়ে অর্থাৎ ২৬ তারিখের রাতেই শত্রুবাহিনীর ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল। শত্রুবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল ও একজন লেফটেন্যান্ট সহ বিভিন্ন পক্ষের ১৫২ জন সাধারণ সৈনিক প্রাণ হারিয়েছিল। আমরা শত্রুদের দু'ট্রাক এম্যুনিশন কবজা করি; আমাদের পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের চৌদ্দজন বীর সৈনিক সাহাদৎ বরণ করেন।

কুমিরায় লড়াই চলেছিল সর্বমোট তিনদিন। শত্রু এই সময়ের মধ্যে তাদের আর্টিলারি ও মর্টার দিয়ে বারবার আক্রমণ চালিয়েছিল আমাদের বাহিনীর উপর। অবশেষে ২৮ তারিখে তারা ত্রিমুখী আক্রমণ চালায়। পিছন থেকে তারা নৌবাহিনীর সাহায্যে আক্রমণ চালায়। সাগর থেকে গানবোট দিয়ে ফায়ার সাপোর্ট দেয়। রাতের আঁধারে শত্রুরা পাহাড়ের উপরে অবস্থিত টি,বি হাসপাতালের নিকটে মেশিনগান বসায়। ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে আমাদের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। ফলে ২৮ তারিখে কুমিরা পাকিস্তানী সৈন্যের দখলে চলে যায়। কুমিরা পতনের পর হানাদার বাহিনী চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হয়। তারা অগ্রসর হওয়ার সময় রাস্তার দু'পাশে অবস্থিত সমস্ত গ্রাম ও হাটবাজার জ্বালিয়ে দেয় এবং সামনে যাকে দেখে তাকেই গুলি করে হত্যা করে। লোকমুখে শুনেছি কুমিরা পতনের পর রাস্তার দু'পাশে কয়েকদিন ধরে আগুন জ্বলেছিল।

আমার মনে হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কুমিরার যুদ্ধটাই একমাত্র প্রথম যুদ্ধ, যেখানে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও তৎকালীন ই-পি-আর বাহিনী সম্মিলিতভাবে হানাদার বাহিনীর উপর এক প্রচন্ড আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে ২৪নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একটা পুরো কোম্পানী

Scanned by CamScanner

একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। একথা আমি জানতে পেরেছিলাম ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের কাছে। তিনি কুমিরার যুদ্ধে ২৪নং এফ,এফ'এ কর্মরত ছিলেন।"

ক্যাপ্টেন রফিক-উল-ইসলাম-এর ২৫শে মার্চ রাতে বিদ্রোহের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। (তিনি) মেজর (অব.) রফিক-উল-ইসলাম "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে" গ্রন্থে তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার অংশবিশেষ হ'ল ঃ

"২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সাল। বৃহস্পতিবার। অন্যান্য দিনের মতো সকাল ৭টায় আমি আমার অফিসে গেলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি পশ্চিম পাকিস্তানী মেজর ইকবাল বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, "মিঃ রফিক, আপনাকে দারুণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অনেক খাটুনি গেছে আপনার ওপর দিয়ে। কক্সবাজার গিয়ে কয়েকদিন বিশ্রাম নিন না কেন? ইচ্ছা হলে আজই যেতে পারেন। আমি কমান্ডিং অফিসারকে বলে দেব।"

এটা ঠিক, গত কয়েক বছরের মধ্যে আমি কোন ছুটি নেইনি। বিশ্রামের আমার খুবই প্রয়োজন ছিল। তবু মেজর ইকবালের সেদিনের অস্বাভাবিক পীড়াপীড়ি আমার ভালো লাগলো না, বরং আমার সন্দেহকে আরও ঘনীভূত করলো।

... সেদিন বেলা ২টায় আমি ই-পি-আর সদর দফতর ত্যাগ না করা পর্যন্ত মেজর ইকবাল সারাক্ষণ আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করলেন।

ইয়াহিয়ার সাথে মীমাংসায় পৌছা গেছে বলে এ সময়ে একটা গুজব ছঁড়িয়ে পড়ে। তবে নির্ভরযোগ্য কোন মহল থেকে এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলো না। সরকারী বেতারে একটা রাজনৈতিক ফয়সালার আভাস দেয়া হয়। কিন্তু এ খবরের ওপরও নির্ভর করা গেলো না। বাসা থেকে সেই মুহূর্তে আমি আমার সদর দফতরে টেলিফোন করে সকল সৈন্যকে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলাম।

... খাওয়া কেবল শুরু করেছি, এমন সময় একজন আওয়ামী লীগ কর্মীসহ ডাঃ জাফর আবার ফিরে এলেন। রাত তখন ৮টা ৩০ মিনিট। (উল্লেখ যে পরবর্তী বক্তব্যের সঙ্গে উল্লিখিত সময়টি মিলছে না, কারণ এ সময়ের মধ্যে পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকায় ট্যাংক নিয়ে বেরিয়ে পড়েনি—লেখক)।

"মনে হচ্ছে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গোপনে করাচী চলে গেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা ট্যাংক নিয়ে শহরের দিকে বেরিয়ে পড়েছে বলে খবর এসেছে।" তারা দুজনই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় এতো উত্তেজিত ছিলো যে তাদের মুখ দিয়ে যেন কথা সরছিলো না।

... সেনাবাহিনী ট্যাংক নিয়ে শহরের দিকে বেরিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই তারা ভয়ানক কিছু ঘটাবে। সব চাইতে খারাপ কিছুর কথাই এখন আমাদের ভাবা উচিত। ৩রা মার্চ থেকেই ওরা নির্বিচারে বাঙ্গালীদের হত্যা করছে। শুধু ২৪শে মার্চ চট্টগ্রাম পোর্টে ২০ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়েছে। আরো খবর পেয়েছিলাম বাংলাদেশের সর্বত্রই ওদের হত্যা চলছে—ঢাকা, খুলনা, যশোর, রংপুর, সৈয়দপুর, রাজশাহীসহ আরো অনেক জায়গায় গুলি চলেছে। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায়ও এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রাম ই-পি-আর-এর দুটি অয়্যারলেস সেটই ঢাকার পিলখানার সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলো না। এমন কোন দিন ঘটেনি। সন্দেহ আগে থেকেই গভীরতর হয়ে উঠেছিল।

Scanned by CamScanner

... এ সময় নিজের ভেতর থেকেই আমি যেন এক অলৌকিক সাহস অনুভব করলাম। ... ডাঃ জাফরকে বললাম ঃ "আমাদের জনগণকে মুক্ত করার জন্য পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে আমি আমার ই-পি-আর সেনাদের নিয়ে যুদ্ধ করবো। আপনারা ষোলশহরে এবং ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে বাঙ্গালী সৈন্যদেরকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলুন। তারপর রেলওয়ে হিলে আমার সদর-দফতরে দেখা করবেন।"

... রাত তখন ৮টা ৪৫ মিনিট। আমি শেষবারের মতো আমার সারসন রোডস্থ বাসভবন ত্যাগ করলাম। আমাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল অয়্যারলেস কলোনীর দিকে আমাদের গাড়ী ছুটে চললো। আমার পাশে ড্রাইভার কালাম এবং পেছনের সিটে দু'জন রক্ষী। ... আমার রেকর্ড অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন হায়াত এবং সুবেদার হাসমত এই প্লাটুনের কমান্ডে ছিলেন। বাকী সেনারা সবাই ছিলো বাঙ্গালী। আমাদের জানামতে এখানে আরো তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ছিলো।

... আমি খুব আস্তে দরজায় নক করলাম এবং বন্ধুসূলভ গলায় বললাম, "হ্যালো হায়াত ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি?" "এই কেবল শুয়েছি স্যার।" আমার গলার স্বর চিনতে পেরে সে আলো জ্বালালো। ... "সব ঠিকঠাক হ্যায়", জবাব দিয়েই সে দরজা খুললো। "প্লিজ, ভেতরে আসুন স্যার, এবং—" তার কথা শেষ না হতেই আমি স্টেনগান তার বুকের ওপর ধরে বললাম, "আমি দুঃখিত হায়াত, তোমাকে গ্রেফতার করতে হচ্ছে।" ... সুবেদার হাসমত চোখ মুছতে মুছতে উঠে এসে স্যালুট দিয়ে দাঁড়াতেই কালাম এবং অন্য প্রহরীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাসমতকে আটক করে তার হাত ও মুখ বেঁধে ফেলা হলো।

হায়াতের রুমের সামনে দাঁড়ানো সান্ত্রীটি এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে এইসব অদ্ভূত ঘটনা দেখছিলো। হঠাৎ কি মনে করে সে একটি টিলার দিকে দৌড় দিলো। কালাম ফিস-ফিস কণ্ঠে বললে, "ও পশ্চিম পাকিস্তানী" এবং পর মুহূর্তেই একটি বুলেট সাঁ করে চলে গেলো। আমরা নীচু হয়ে বসে পড়লাম। ... অন্য তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করলো। যে সান্ত্রী গুলি ছুঁড়েছিলো সে অস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেল।

... রাত সাড়ে ন'টায় আমরা হালিশহরে পৌছলাম। ... হালিশহরের কাজটি ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ছিলো প্রায় ৩০০ পশ্চিম পাকিস্তানী ই-পি-আর সৈন্য। ... অস্ত্রাগার আমাদের কব্জায় থাকায় আমরা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলাম। ... আমরা প্রথমে সমগ্র এলাকা ঘেরাও করে ফেললাম যাতে কোন পশ্চিম পাকিস্তানী পালাতে না পারে।

... সুবেদার-মেজর হঠাৎ চোখ কচলে দেখলেন পাশের বিশ্রাম কক্ষ থেকে চারজন সৈন্য বেরিয়ে এসে রাইফেলের বেয়োনেট তাঁর বুকের ওপর ধরেছে। আমি তখন দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, "সুবেদার-মেজর সাহেব, আপনাকে গ্রেফতার করা হলো। চিৎকারের বা পালাবার চেষ্টা করলেই প্রাণ হারাবেন।" তাঁর হাত বেঁধে বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। ... এর কিছু পরেই ই-পি-আর সিগন্যাল কোম্পানীর দায়িত্বে নিয়োজিত অবাঙ্গালী জেসিও সুবেদার মোবিনকে আমার কক্ষে ডাকলাম।

... এর মধ্যে চারজন সিপাই সুবেদার মোবিনকে বেঁধে ফেললো। বাইরের কেউ জানতেও পারলো না আমার রুমে কি ঘটছে।

... রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে সিনিয়র বাঙ্গালী জেসিও সুবেদার জয়নাল খবর দিলেন যে, কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে আমরা চট্টগ্রাম শহরে ই-পি-আর'এর সকল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য

Scanned by CamScanner

আটক করতে সক্ষম হলাম। সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতেও আমার সাংকেতিক বার্তা দু'টি পৌঁছে গেছে বলে খবর পেলাম। বার্তা দুটি পেয়েই রাত ৮টা ৪০ মিনিট থেকে ৯টা ৩০ মিনিটের মধ্যে তারা সব ফাঁড়ির পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাভূত করেছে। পরে জানা গিয়েছিলো যে, কয়েকটি ই-পি-আর ফাঁড়িতে আগেই অর্থাৎ ২৪শে মার্চ দিবাগত রাতেই পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাভূত করা হয়।

... ২৫শে মার্চ রাতে দ্বিতীয় বার্তায় চূড়ান্ত নির্দেশ লাভের পর অনেক সেনাদলই চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয়ে পড়ে। এদিকে চট্টগ্রাম শহরের বিচ্ছিন্ন প্লাটুনগুলো খবর পেয়ে লড়াইকেন্দ্রগুলোর দিকে এগোচ্ছিলো। শুধু বিমানবন্দরের প্লাটুনটির সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলো না। ... কিন্তু ২৫শে মার্চ সন্ধ্যার পরই নৌ-বাহিনীর সদর দফতরের সৈন্যরা গোপনে বিমানবন্দরে গিয়ে পুরো প্লাটুনের সবাইকে গ্রেফতার করে ফেলে।

... আমি ভেবেছিলাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার এবং খোলশহরে মোতায়েন ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট দখল করতে সক্ষম হবে। রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ডে ছিলেন লেঃ কর্নেল চৌধুরী এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গলে ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। এ দুজায়গার বাঙ্গালী সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ২০০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ছিলো আনুমানিক ৪০০।

রাত তখন ১১-৩০ মিনিট। হঠাৎ ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের বাঙ্গালী সৈন্যদের ওপর হামলা চালালো।

... এই হত্যালীলা থেকে যেসব বাঙ্গালী সৈন্য জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলো তারা চারদিকে পৌঁড়াতে শুরু করে। কেউ কেউ আমার দফতরে এসে সেই লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ দেয়। অন্যরা খোলশহরস্থ ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দিকে ছুটে যায়। এই রেজিমেন্টের অধিকাংশ অফিসার এবং সকল সৈন্য ছিলো বাঙ্গালী।

... বলা প্রয়োজন যে, ঐ রাতে প্রায় ২ ঘন্টা সময়ের মধ্যে হালিশহর এবং চট্টগ্রাম নগরীর অন্যান্য এলাকার ৫০০ অবাঙ্গালী সৈনিক, জেসিও এবং কয়েকজন ই-পি-আর অফিসারকে আমরা নিরস্ত্র করতে পেরেছিলাম।

... ২৬শে মার্চ ...বেলা ৯টা নাগাদ অনেক উঁচু দিয়ে শহরে হেলিকপ্টার ঘোরাঘুরি শুরু করলো। ... বিরাটাকার সি-১৩০ বিমানগুলো ঢাকা থেকে সৈন্য আনতে থাকলো। অসহায় ভাবে তবু আমরা সেই অবস্থান আঁকড়ে রইলাম। ... কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের অধিকাংশ সৈন্য নিহত হওয়ার এবং ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্ট শহর ত্যাগ করায় ওদিক দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের বেরোনো সহজতর হয়ে উঠেছিলো। ঘটলোও তাই। ট্যাংকের ছত্রছায়ায় ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়লো।

... ইতিমধ্যে আমার ইপিআর কোম্পানীর গোলাবারুদ প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। ... অন্য কোনোভাবে আমাদের অবস্থান দখল করতে না পেরে শত্রুরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। রেলওয়ে হিলে আমাদের অবস্থান শত্রু দ্বারা ঘেরাও আসন্ন হয়ে উঠলো। অথচ কোনো ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র আমাদের ছিলো না।

... এই অবস্থায় রেলওয়ে হিলের অবস্থান ত্যাগ করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলো। তখন চারদিকেই শত্রুসেনা। ক্রমাগত ৮ ঘন্টারও বেশী সময় ধরে পাকিস্তান নৌবাহিনীর কামানগুলো আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে আমাদেরকে ব্যস্ত রাখে। এই সঙ্কটময় অবস্থায় আমি আমার

Scanned by CamScanner

সৈন্যদের কোতয়ালী থানা এলাকার দিকে সরে যেতে নির্দেশ দিই এবং সেখান থেকে ক্যান্টনমেন্টের পেছনে সকলকে একত্র হতে বলি।

... ২৮শে মার্চ ভোর নাগাদ শত্রুপক্ষ ক্যান্টনমেন্ট এবং নৌ-বাহিনীর ঘাঁটির মধ্যবর্তী প্রধান সড়কের টাইগার পাস এলাকা দখল করে নেয় এবং নগরীর কেন্দ্র স্থলে সার্কিট হাউসে তাদের সদর দফতর স্থাপন করে। কুমিরায় আমরা যে শত্রুদলটিকে প্রতিহত করেছিলাম তারাও এসে ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। আমাদের সেখানকার সৈন্যরা সরে এসে হালিশহরের প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহে অবস্থান নেয়।"

এরপর ২৯শে মার্চ, মেজর (অব.) রফিক-উল-ইসলামের বক্তব্য অনুযায়ী, শত্রুসেনরা আগ্রাবাদ রোড অতিক্রম করে, একটি দল নিউ মার্কেটে পৌছে যায়, একটি দল ডি সি হিলের দিকে এগোতে থাকে, একটি এ্যাম্বুলেন্সযোগে শত্রুসৈন্য মেডিকেল কলেজে ঢুকে পড়ে।

তিনি লিখেছেন, "আমি যে কয়জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিলাম তার সঙ্গে একজনও নতুন সৈনিক কিংবা একটিমাত্র বুলেটও যোগ করতে পারিনি। ক্রমাগত শত্রু সৈন্যের মোকাবেলা করে আমাদের সৈন্যরা ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। অনেকেই ২৫ তারিখের রাত থেকে এ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ বন্ধ করতে পারেনি।

৩০ শে মার্চ। শহরে তখন কারফিউ চলছে। ... একই দিন হালিশহরেও সকাল ৮টা থেকে সংঘর্ষ চলতে থাকে। পাকিস্তানীরা মরীয়া হয়ে কামান দেগে চলছিলো। নৌ-বাহিনীর সবগুলো কামানই তখন সক্রিয় ছিলো। ক্রমাগত দীর্ঘ ৬ ঘন্টা যাবত তারা হালিশহরের ওপর গোলাবর্ষণ করে। ... আধ ঘন্টার মধ্যে দু'টি বিমান চলে আসে এবং বেলা সাড়ে বারোটা থেকে আমাদের অবস্থানের ওপর ক্রমাগত বিমান হামলা চলতে থাকে। আমাদের কোনো বিমান বিধ্বংসী হাতিয়ার ছিলোনা। ...পরিষ্কার রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে শত্রুর বিমানগুলো একটার পর একটা ট্রেঞ্চ দেখে দেখে স্ট্র্যাফিং করে চলছিলো। আমাদের বীর সেনানীরাও প্রাণপণে ঘাঁটি আঁকড়ে লড়াই করতে থাকলো। লড়াই করতে করতে অনেকেই ট্রেঞ্চের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করলো। আহতও হলো অনেক। কিন্তু অবিরাম বোমা বর্ষণের ফলে তাদের অপসারণ করাও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যুদ্ধরত বাকী সৈন্যরাও বুঝতে পারলো তাদের আর বেশীক্ষণ হালিশহর রক্ষা করা সম্ভব হবে না। গোলাগুলির মজুতও নিঃশেষ প্রায়। তারা রাইফেলের ওপর বেয়োনেট লাগিয়ে নীচের শত্রুদের সাথে হাতাহাতি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো।

বিকালের মধ্যে শত্রুরা হালিশহর দখল করে নিলো। হাতাহাতি যুদ্ধ চলেছিলো আধঘন্টার মতো। শত্রুসৈন্য সংখ্যাধিক্যের ফলে চূড়ান্ত ফলাফল কি হবে তা বোঝা গিয়েছিলো। আমাদের সৈন্যরা পেছনে এসে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের একস্থানে অবস্থান গ্রহণ করলো। সহযোগীদের লাশও ফেলে আসতে হলো।

হালিশহর পতনের পর শত্রুদের পুরো দৃষ্টি পড়লো কোর্ট হিলের ওপর। এটাই ছিলো শহরে আমাদের সর্বশেষ ঘাঁটি, সর্বশেষ আশা। বিভিন্ন দিক থেকে অবস্থানটির ওপর কয়েকবারই হামলা হলো। কিন্তু প্রতিবারই আমাদের সৈন্যরা তা প্রতিহত করে। এরপর এলো ট্যাংক বহর। ...আমাদের সৈনিকদের তখন গোলাবারুদ নিঃশেষ প্রায় এবং বাইরের সাথে সকল প্রকার সংযোগও প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলো। ... ২রা এপ্রিল ভোরে শত্রুরা আবার হামলা শুরু করলো। হামলা ছিলো সুপরিকল্পিত। মাত্র ৩০ জন সৈনিকের বিরুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো পাকিস্তানীদের পুরো একটি ব্যাটালিয়ন। ... এদিকে আমাদের প্রতিরোধকারী সৈন্যদের গোলাগুলি নিঃশেষ হয়ে যায়। একমাত্র

Scanned by CamScanner

ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্রটিও অকেজো হয়ে পড়ে। পদাতিক বাহিনীর আগে আগে এ সময় দুটি ট্যাংক উপরে উঠে আসে। বলতে গেলে অলৌকিকভাবে সেদিন আমাদের সৈনিকদের প্রায় সবাই সে অবস্থান ত্যাগ করে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলো।"

কুষ্টিয়ায় সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্ণনায় তৎকালীন মেজর এম.এ.ওসমান চৌধুরী বলেছেন, ২৭শে মার্চ মাসলিয়া বিওপি কোম্পানী হেডকোয়ার্টার থেকে কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার আব্দুল মজিদ মোল্লা অয়ারলেস মারফত সকাল ৭-১০ মিনিটের সময় জানাল যে, "ক্যাপ্টেন সানের আদেশ পালনা না করার অপরাধে একজন বাঙ্গালী সিপাই-এর উপর পিস্তলের গুলি করে যশোর অভিমুখে জীপে করে পালিয়ে যায়। অবশ্য, এরপর আমার নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী বিওপিতে খবর দিয়ে গুলির বিনিময়ে তাদের গতি রোধ করা হয়। গোলাগুলিতে ক্যাপ্টেন সানের ও তার সঙ্গীরা মারা যায়। কিছুক্ষণ পর সুবেদার মজিদ মোল্লা অত্যন্ত ভীতস্বরে অয়ারলেসে আমাকে এ খবর জানায়। আমি তাকে অভয় দিয়ে মৃতদেহগুলি পুঁতে ফেলার আদেশ দিই। ... এইখানেই বুঝতে পারলাম—I am in a point of no return. Either I have to kill the enemy or get killed.

কুষ্টিয়া পুনর্দখলের পরিকল্পনা ... এখানে কুষ্টিয়ার শত্রুর সৈন্য সংখ্যা ও তাদের শক্তির উপর কিছুটা আলোকপাত করা দরকার। যশোর ব্রিগেড থেকে ২৭ বেলুচ রেজিমেন্ট তথা রিকনাইসেন্স ও সাপোর্ট ব্যাটালিয়নের এক কোম্পানী—অর্থাৎ প্রায় ২০০ সৈন্য কুষ্টিয়া অধিকার করে ২৫/২৬শে মার্চ রাত দেড়টায়। তাদের সাথে ছিল পর্যাপ্তসংখ্যক ১০৬ এম-এম আর-আর (জীপে সংস্থাপিত) চীনা এইচ-এম-জি, এলএমজি, এসএমজি ও অটোমেটিক রাইফেলসমূহ। তার সাথে প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ, গাড়ী ও বেতারযন্ত্র ছিল।

... আমার মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০ জন ইপিআর সৈনিক। তাদের অস্ত্র বলতে ছিল ৩০৩ রাইফেল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ৩০৩ এলএমজি, এমজি ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মর্টার পড়া ৪টা ৩.৫ রকেট লাঞ্চার। গোলাবারুদের সংখ্যা একেবারেই ছিল অপর্যাপ্ত। তদুপরি ছিল আধুনিক যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকজন।

... তবুও পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি কিছু সংখ্যক আনসার ও মুজাহিদকে একদিনের ট্রেনিং-এর পর আমার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করি। স্থানীয় পুলিশ ও আনসারদের ৩০৩ রাইফেলগুলো দ্বারা এই বাহিনীকে সজ্জিত করি।

আমার কাছে কোন রকম ফিল্ড অয়ারলেস বা ফিল্ড টেলিফোন কম্যুনিকেশনের ব্যবস্থা ছিল না। তাই টেলিফোন বিভাগের সাহায্যে পোড়াদহের খোলা প্রান্তরে ফিল্ড এক্সচেঞ্জ লাগিয়ে দেওয়া হয়।

... ২৮শে মার্চ দুপুর ১২টা পর্যন্ত সীমান্তের সমস্ত কোম্পানী আদেশক্রমে চুয়াডাঙ্গায় সমবেত হয়। ... আক্রমণের সময় ও তারিখ ছিল ২৯শে মার্চ ভোর ৪টায়। ... আক্রমণের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, চলাচল ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য ও একটা গাড়ী দুর্ঘটনার কবলে পতিত হওয়ার দরুন সুবেদার মুজাফফরের কোম্পানী নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে পৌছতে পারেনি। ... আক্রমণের নতুন দিন ও সময় স্থির করি ৩০শে মার্চ ভোর ৪টায়।

... ৩০শে মার্চ সকাল ৪টায় তিন দিক থেকে অতর্কিত ভাবে কুষ্টিয়া আক্রমণ করি। আক্রমণের সাথে সাথে অনুসরণকারী জনগণের গগনবিদারী জয়ধ্বনিতে বোধহয় শত্রুপক্ষের মনোবল ভেঙ্গে যায়। প্রায় ঘন্টাখানেক তুমুল যুদ্ধের পর আমাদের সৈন্যরা পুলিশ লাইন ও অয়ারলেস কেন্দ্রের ভিতর ঢুকে পড়ে শত্রু হনন করতে থাকে। উপায়ান্তর না দেখে সামান্য সংখ্যক শত্রুসৈন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে দ্রুতগতিতে তাদেরই সদর দপ্তরের দিকে পালিয়ে যায়। পালাবার প্রচেষ্টায়ও অনেকে নিহত হয়। পুরোদিনের যুদ্ধে একমাত্র তাদের সদর দপ্তর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ব্যতীত সমস্ত শহরই আমাদের হস্তগত হয়।

Scanned by CamScanner

... পরদিন ৩১শে মার্চ ভোরবেলা আমাদের আক্রমণ পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। তুমুল গোলাগুলির সাহায্যে শত্রুপক্ষ আমাদের মাথা নিচু করে রাখতে বাধ্য করে। সারাদিনের যুদ্ধের পর আনুমানিক জীবিত শত্রুর সংখ্যা ছিল ৪০/৪৫ জন। তারমধ্যে অফিসাররা সকলেই জীবিত ছিল। গত্যন্তর না দেখে রাতের অন্ধকারে তারা দুইটি জীপ ও একটি ডজ গাড়ীতে আরোহন করে আমাদের ব্যূহ ভেদ করে তীব্র গতিতে ঝিনাইদহের দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। আমার সৈন্যরা সাথে সাথেই তাদের অনুসরণ করে। শত্রুদের ভাগ্য মন্দ। শৈলকুপার পুলের গোড়ায় আমরা গর্ত খনন করে তারপোলিন দিয়ে সেই গর্তকে ঢেকে রেখেছিলাম। সেটা তারা জানত না। তাদের প্রথম দুইটি জীপ উপর্যুপরি গর্তে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে দুর্ঘটনায় পড়ে। মেজর শোয়েব ও কয়েকজন শত্রুসেনার সেখানে ভবলীলা সাঙ্গ হয়। বাকীরা আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু সজাগ মুক্তিযোদ্ধা, স্বেচ্ছাসেবক ও জনগণের হাত থেকে একটি শত্রুসৈন্যও বাঁচতে পারেনি। আমার নির্দেশে উৎসাহিত হয়ে তারা এক একজনকে হত্যা করে তাদের হাতিয়ার এনে আমার সদর দপ্তরে জমা দেয়। ... সেই রাতেই লেঃ আতাউল্লাহ শাহ ধরা পড়ে। ...১লা এপ্রিল কুষ্টিয়া সম্পূর্ণরূপে আমাদের হাতে মুক্ত হয়।"

তৎকালীন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত বলেছেন, "৩০শে মার্চ খবর পেলাম পাকিস্তানীরা শ্রীমঙ্গলে এসে অত্যাচার আরম্ভ করেছে। ৩০/৩১ শে মার্চ রাতে শ্রীমঙ্গলের প্রায় দুই মাইল দূরে প্রতিরোধ গড়ে তুললাম এই উদ্দেশ্যে যে ৩১শে মার্চ সকালে আমি শ্রীমঙ্গল আক্রমণ করব।

৩১শে মার্চ সকালে আমি আমার চার প্লাটুনকে নিয়ে চারিদিকে শ্রীমঙ্গল আক্রমণ করলাম। ভোর আটটায় শ্রীমঙ্গল পৌছলাম। খবর পেলাম পাকিস্তানীরা শ্রীমঙ্গল ছেড়ে মৌলভীবাজারের দিকে চলে গেছে। সময় নষ্ট না করে মৌলভীবাজার দখল করা শ্রেয় মনে করলাম। চারধারে সৈন্য ছড়িয়ে পড়েছিল। ওদেরকে আবার একত্রিত করে মৌলভীবাজারের দিকে রওনা হলাম। ... সৈন্যদের নিয়ে যখন মৌলভীবাজারের দিকে যাচ্ছিলাম জানতে পারলাম নয়নপুর চা-বাগানে পাকিস্তানীরা আছে। পেছনের দুটো প্লাটুনকে বললাম সোজা মৌলভীবাজার রাস্তায় না এসে নয়নপুর চা-বাগান শত্রুমুক্ত করে মৌলভীবাজার আসতে। ... নয়নপুরের কাছে আসতেই গোলাগুলির আওয়াজ শুনলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম আমার সৈন্যরা নয়নপুরের দিকে এগুচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দুদিকের গোলাগুলির আওয়াজ শুনলাম। বেলা প্রায় আড়াইটা হবে। "জয় বাংলা" আওয়াজে পুরো নয়নপুর যেন মুখরিত হয়ে উঠল। বুঝলাম নয়নপুর আমাদের দখলে এসেছে। ... বিকেল হয়ে গেছে। পৌছলাম মৌলভীবাজারে। মনে হচ্ছিল মৌলভীবাজার যেন শ্মশান হয়ে গেছে। লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। সার্কিট হাউসে এসে উঠলাম।

... মৌলভীবাজারকে শক্ত ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য জেনারেল রব এবং মানিক চৌধুরীকে বললাম যে আমার আরো অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যের প্রয়োজন।"

চট্টগ্রাম। পাকিস্তানী দখলদাররা ঢাকা শহরে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে রাজধানীর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপনের পর, দখলদারদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো চট্টগ্রাম। ২৭শে মার্চ সকালেই বিমান বোঝাই হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে গেল পুরো দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়ন। চট্টগ্রামে যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরীর জন্য জেনারেল মিঠা খানকে হেলিকপ্টারে পাঠানো হয় চট্টগ্রামে। বাঙ্গালী সৈন্যরা গুলি করে সে হেলিকপ্টারটি ফুটো করে দেয়। একই সঙ্গে নৌ-বাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বাবরকে নিয়ে আসা হয় বন্দরে। এতে ছিল দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য। ডেস্ট্রয়ার, এক স্কোয়াড্রন ট্যাংকও লাগানো হয় এই যুদ্ধে। জাহাজের গান থেকেও গোলা নিক্ষেপ হতে থাকে শহরের দিকে।

২৯শে মার্চ আসকের দীঘি অপারেশনে প্রায় ১১ ঘন্টা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে বাঙ্গালী সেনাদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়।

জনাব এম,আর, সিদ্দিকীর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে মেজর জিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে ভারত থেকে গোলাবারুদ আনার বন্দোবস্ত করার জন্য তাঁকে বলেন। মেজর জিয়া বলেন যে,

Scanned by CamScanner

গোলাবারুদ না পাওয়া গেলে যুদ্ধ চালানো সম্ভব হবে না। তিনি (এম,আর, সিদ্দিকী) তাঁর হিন্দু বন্ধুদের সাহায্যে জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে ৩০ মার্চ বর্ডার পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। এবং গোলাবারুদ পাওয়ার লক্ষ্যে দিল্লী চলে যান।

৩০ মার্চ দুটি পাকিস্তানী বিমান থেকে গোলাবর্ষণ করে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। বেতার কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যাবার পর ৩রা এপ্রিল রাত সাড়ে ন'টায় পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন একটি গোপন এলাকা থেকে চালু করা হয় আর একটি বেতার কেন্দ্র।

১১ই এপ্রিল পর্যন্ত কালুরঘাট থেকে চট্টগ্রামের প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। চট্টগ্রামের যুদ্ধে দখলদার বাহিনীর ২০তম বালুচ রেজিমেন্ট, কুমিল্লা থেকে নিয়ে যাওয়া ৫৩-ব্রিগেডের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। শহরে অবস্থিত কমান্ডো এবং ই,পি,আর-এর পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১১ই এপ্রিল কালুরঘাট এলাকা থেকে অবস্থান সরিয়ে নেয়ার পর যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের বিস্তির্ণ এলাকায়। এ যুদ্ধ চলে রামগড়, রাঙ্গামাটি এলাকায়। যুদ্ধ চলে কক্সবাজারের পথে, শুভপুরে।

এভাবে পাকিস্তানী দখলদারদের বিরুদ্ধে সকল জেলা-মহকুমা-থানা শহর থেকে শুরু করে গ্রাম-গ্রামান্তরে শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই দলে দলে জনগণ বিশেষ করে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকরা এসে যোগ দেন সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনীতে। তাঁরা অস্ত্র ধরেছেন, ট্রেনিং নিয়েছেন, বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন।

সঙ্গত কারণেই এখানে মেজর এম,এস,এ, ভূঁইয়ার একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। "মুক্তিযুদ্ধে নয়মাস" গ্রন্থে তিনি লিখেছেনঃ

দুনিয়ার ইতিহাসে যে সব সশস্ত্র বিপ্লব হয়েছে তাতে লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রথমে অর্গানাইজ করা হয়েছে এবং পরে ঘোষিত হয়েছে বিদ্রোহ, হয়েছে বিপ্লব। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ব্যাপারটি ঘটেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। এক্ষেত্রে প্রথমে ঘোষিত হয়েছে বিদ্রোহ, পরে হয়েছে সংগঠন—আমরা প্রথমে বিদ্রোহ করেছি, পরে শুরু করেছি বিদ্রোহীদের সংগঠন। ২৬শে মার্চ ভোরে যে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে তা আমরা অনেকেই ২৫শে মার্চের মধ্যরাতেও জানতাম না।

১৯৭১ খ্রীঃ ২৫শে মার্চ রাত্র ১০-৩০ মিনিটের পর থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (শেখ মুজিবের প্রস্তাবিত বাংলাদেশ প্রদেশ) পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী দখলদার বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং সশস্ত্রবাহিনী ও ই,পি,আর-এর বাঙ্গালী এবং পুলিশ, ছাত্রসহ পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ জনগণের উপর অতর্কিতে বর্বরোচিত হামলা চালায় যার প্রেক্ষিতে দখলদার বাহিনী, তাদের সঙ্গী ও স্থানীয় দালালদের বিরুদ্ধে শুরু হয় জনগণের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন—যা আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

---

* সকল আন্ডারলাইন করা আমাদের।

Scanned by CamScanner

যে সকল মূল গ্রন্থ, পুস্তক-পুস্তিকা, সংবাদপত্র থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ

(১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ দ্বিতীয়, তৃতীয়, নবম এবং ১৫শ খন্ড সম্পাদক ঃ হাসান হাফিজুর রহমান ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়।

(২) দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা ঃ মুহাম্মদ নূরুল কাদির।

(৩) ভূট্টো শেখ মুজিব বাংলাদেশ ঃ রাও ফরমান আলী।

(৪) নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল ঃ সিদ্দিক সালিক।

(৫) স্বাধীনতার ঘোষণা মিথ ও দলিল ঃ মাসুদুল হক।

(৬) একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর ঃ কর্নেল সাফায়াত জামিল, (অব.)।

(৭) Liberation And Beyond Indo-Bangladesh Relations : J.N. Dixit.

(৮) জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫ ঃ অলি আহাদ।

(৯) স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী ঃ বদরুদ্দিন আহমদ।

(১০) আমি বিজয় দেখেছি ঃ এম আর আক্তার মুকুল।

(১১) বাংলা নামে দেশ ঃ সম্পাদক ঃ অভীক সরকার ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯।

(১২) স্বাধীনতা '৭১ ঃ কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম।

(১৩) বাঙালি হত্যা এবং পাকিস্তানের ভাঙন ঃ মাসুদুল হক।

(১৪) বিভিন্ন সংবাদপত্র ও মাধ্যম যেমন, দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পূর্বদেশ, দ্য ড্যন্, এ,পি,পি, দ্য পিপল্, মর্নিং নিউজ, সাপ্তাহিক 'মাতৃভূমি', হাতিয়ার, পাকিস্তান টাইমস্, পাকিস্তান অবজারভার, সাপ্তাহিক 'স্বরাজ', দৈনিক সংগ্রাম, ডেইলি টেলিগ্রাফ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক আজাদ, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক দিনকাল, নয়া দিগন্ত, আজকের কাগজ ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন-প্রক্রিয়া'র

এম. আর. চৌধুরী রচিত অন্যান্য প্রকাশনা সমূহ ঃ

- ✪ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে ঃ
- 🕮 মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্রের নয়—সংশোধনবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের পতন
- 🕮 ঐতিহাসিক মে দিবস ও কিছু কথা
- ✪ ভারতবর্ষ, পাকিস্তান পর্বে ও আজকের বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে ঐতিহাসিক মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে এবং পার্টি সংগঠন ও তার গঠন-প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে ঃ
- 🕮 ভারতবর্ষ-পাকিস্তান পর্বে ছিল না—বাংলাদেশেও কমিউনিস্ট পার্টি নাই
- 🕮 একটি কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন প্রসঙ্গে
- 🕮 একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠন-প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে কিছু কথা
- 🕮 শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি ও 'বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি' এবং 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি'
- ✪ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ও তার প্রেক্ষিতে কেমন কর্মসূচী হওয়া উচিত এবং তার ব্যাখ্যায় ঃ
- 🕮 বাংলাদেশ নয়া উপনিবেশিক অনুন্নত পুঁজিবাদী
  (বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপে পুঁজিবাদের প্রাধান্য)
- 🕮 বাংলাদেশের কৃষি ও তার আর্থ-সামাজিক অবস্থা আধা-সামন্ততান্ত্রিক নয়, বরং তা হল অনুন্নত পুঁজিবাদী
- 🕮 বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য ও করণীয়
- 🕮 বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য ও করণীয় বিষয়ের বক্তব্যের "কৃষি" ও "শিল্প" বিষয়ক করণীয় প্রসঙ্গে
- ✪ বিপ্লব বলতে কি বুঝায়, রুশ ও চীন বিপ্লব কীভাবে হয়েছিল, বাংলাদেশে বিপ্লবের নামে কি হচ্ছে এবং কি করা উচিত তারই ব্যাখ্যায় ঃ
- 🕮 বিপ্লব বনাম বিপ্লব-বিপ্লব খেলা

হেলাল উদ্দীন রচিত প্রকাশনা সমূহ ঃ

- 🕮 বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের ক্ষমতায় যাওয়ার পথ ও পদ্ধতি
- 🕮 "কমিউনিস্ট পার্টি নাই" প্রসঙ্গে

Scanned by CamScanner